

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের

জীবনবৃত্তান্ত ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীশ্রীচরণাশ্রিত
সেবক রামচন্দ্র প্রণীত ।

যোগোক্তান, কাঁকড়াগাছী হইতে
সেবকমণ্ডলী কর্তৃক প্রকাশিত ।

তৃতীয় সংস্করণ ।

কলিকাতা
১৭ নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন,
“কালিকা বস্ত্রে”
শ্রীশরচ্ছন্দ চক্রবর্তীর দ্বারা মুদ্রিত ।

সন ১৩১৪ সাল ।

মূল্য ১ টাকা, ডাকমাণ্ডল ৮০ আনা ।

অবতরণিকা ।

পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত লিখিব বলিয়া বর্হাদিন হইতে বাসনা ছিল । অহুমান ছয় বৎসর অতীত হইল, একখানি ক্রুদ্রাকারে জীবনী লিখিতও হইয়াছিল ; কিন্তু ছাপা হয় নাই । সেই জীবনীখানি, কাশীর প্রসিদ্ধ পরি-ব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় দেখিয়া কাশী হইতে ছাপাইবার মানসে গ্রন্থকারের নিকট হইতে গ্রহণ করেন, কিন্তু বলিতে পারি না কি কারণে তাহা ছাপা হয় নাই । দুই বৎসর পরে সেই পাণ্ডুলিপিগুলি পুনরায় ফিরাইয়া লওয়া হয় ; এতাবৎ কাল তাহা তদবস্থাতেই ছিল । সম্প্রতি বরিশহাটী নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু অশুপ্ৰচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের উৎসাহে আমরা এই গুরুতর কার্যো পুনরায় প্ররম্ভ হইয়াছি । ক্লহকার্য্য হওয়া না হওয়া ভগবানের ইচ্ছা ।

জীবনবৃত্তান্ত লেখা কঠিন হইলেও অসাধ্য নহে । কারণ ঘটনাবলীর যথাযথ বিস্তার করাই জীবনীর উদ্দেশ্য । কিন্তু পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত সেরূপ নহে, সাধুই হউন আর অসাধুই হউন, প্রত্যেক ব্যক্তি কোন প্রকার নিয়মে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া থাকেন । কেহ সত্যবাদী, কেহ না হয় মিথ্যাবাদী, কেহ কপটী, কেহ সরল, অথবা কাহার জীবনে কোনকোন ভাব মিশ্রিত আছে । পরমহংসদেবের জীবনে সে প্রকার কোন বিষয় ধরিতে পাওয়া যায় না, তাঁহার কার্য্যকলাপ অতিশয় বিচিত্র প্রকার, সহজে কিম্বা অতিশয় চেষ্টা করিলেও তাহার অক্লান্ত ভাব জ্ঞাত হওয়া যায় না । তাঁহার জীবনের যে দিক দেখা যায়, সেই দিকেই আশ্চর্য্য হইতে হয় । তাঁহাতে কোন বিষয়ের অভাব ছিল না । যে ভাবে যে কেহ তাঁহার নিকট পরামর্শ চাহিয়াছেন, সেই রূপেই তাঁহার দ্বারা সহায়তা লাভ করিয়া গিয়াছেন । তিনি কখন গভীর জ্ঞানসম্পন্ন গুরুরূপে, কখন বরদাতা ইষ্টদেবরূপে, কখন বৈজ্ঞানিক সাধুরূপে, কখন ধীসম্পন্ন মঙ্গলাকাজী বন্ধুরূপে, কখন স্নেহময়ী মাতারূপে, কখন শ্রায়বান পিতারূপে প্রকাশ পাইয়াছেন ।

তাঁহার এই ভাব-বৈচিত্র্য দেখিয়া, নিতান্ত সন্দ্বিগ্নচিত্ত হইয়া বিশেষ চেষ্টা করিয়াও আমরা কোন কারণ বা ভাবান্তর বাহির করিতে পারি নাই । করিব

কি ? মন প্রাণ যে হরণ করিয়া লইতেন। কোন কার্য্য করিবার আর অধিকার থাকিত না।

• আমরা পাছে প্রতারণিত হই, এ ভাবনা বিলক্ষণ ছিল। মনুষ্যের কর্তব্য কি, তাহাও এক প্রকার পাঁচজনের মত স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম। বিজ্ঞান, দর্শনাদি দ্বারা বিগত ভাববিশিষ্ট হইলে যে প্রকারে ধর্ম্ম হইবার সম্ভাবনা, তাহাও জানিয়া রাখিয়াছিলাম, কি করিতে আছে এবং কি করিতে নাই তাহাও জানা ছিল ; কিন্তু কি করিব ! ঈশ্বর নাই বলিয়াই বিশ্বাস ছিল এবং স্বভাব ব্যতীত আর কিছু স্বীকার করা না করা একই কথা বলিয়া ধারণা ছিল ; তিনি সে সকল বিস্মৃত করিয়া দিলেন। আমাদের বিজ্ঞা বুদ্ধি আর তাঁহার নিকট স্থান পাইল না, পূর্বে যে সকল সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক বলিয়া ধারণা হইয়া গেল। তাঁহাকে যাহা বলিবার নয়, আমরা তাহাও বলিয়া ফেলিলাম।

এই প্রকার জীবনী লিখাও কঠিন এবং পাঠ করাও কঠিন। পাঠক পাঠকাগণ ! আপনারা যে প্রকার সাধারণ জীবনচরিত পাঠ করিয়া থাকেন, ইহা সে প্রকার নহে। আমরা যেমন প্রথমে পরমহংসদেবকে মনে করিয়াছিলাম, তাহার পর সে সংস্কার পরিবর্তন হইয়া যায়, আপনাদের দশাও সেইরূপ হইবে। বর্তমানকালে পরমহংসদেবের জীবনীর জায় জীবনী কেহ কখন কালে আশাও করেন নাই এবং পাইলেও বিশ্বাস হইবে না। আজ কাল যেমন বাজার, গ্রন্থকারেরা প্রায় সেইরূপে পরিচালিত হইয়া থাকেন। সে স্থলে তাহাদের সম্বন্ধে করিতে পারিলেই গ্রন্থকার আপনার শ্রম সফল জ্ঞান করিয়া থাকেন এবং পুস্তকের সংস্করণের উপর সংস্করণ হইয়া যায়। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্যও তাহা নহে এবং আমাদের পাঠক পাঠিকারাও তাহা আশা করিতে পারেন না।

• জীবনী লিখিতে হইলে কাহারও মুখাপেক্ষা করা যায় না। যাহা ঘটনা, তাহার অপলাপ করিলে বিষম দোষ ঘটিয়া থাকে। এই নিমিত্ত অনেক গুহ্য কথাও আমরা ব্যক্ত করিয়া ফেলিয়াছি।

পরমহংসদেবের সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিত হইল, তাহার কিয়দংশ আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং কিয়দংশ তাঁহার প্রমুখ্যৎ শ্রবণ করিয়াছি। তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে পরমহংসদেবের আত্মীয় শ্রীদয়ানন্দ মুখোপাধ্যায় যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, আমরা সেইরূপ লিখিতে বাধ্য হইয়াছি। এই

বিষয়টী সত্য কি না, অবগত হইবার নিমিত্ত শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন মিত্র মহাশয় পরমহংসদেবের স্বদেশে গমন পূর্বক, তথাকার লোকের নিকট সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া হৃদয়ের কথাই পোষকতা করিয়াছেন।

পরমহংসদেবের কার্য্য কলাপের ধারাবাহিক বিবরণ লিখিবার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাহা পারিলাম না। তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা তিনি ভিন্ন অপরে কেহ জানেন না। এমন কি হৃদয় তাঁহার সহিত একত্রে থাকিয়াও, বিশেষ কিছুই অবগত নহেন। দক্ষিণেশ্বরের প্রাচীন ব্যক্তিদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছি, তাঁহারা কিছুই বলিতে পারেন নাই। পরমহংসদেব দিন তারিখ মাস সন কাহাকে বলে জানিতেন না। কোন্ সাধনের পর কি করিয়াছেন, তিনি আমাদের যাহা বলিয়াছেন, আমরা তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম।

তিনি আমাদের অনেক কথাই কহিয়াছেন, কিন্তু তৎসমুদয় এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সন্নিবেশিত করা অসম্ভব এবং সাধারণের সমক্ষে সে সকল গভীরতম কথা বলায় কোন ফল নাই। কার্য্যক্ষেত্র দেখিয়া ভবিষ্যতে একখানা কেন, বোধ হয়, ভূরি ভূরি গ্রন্থ প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

পাঠক পাঠিকাগণ! আপনাদের প্রতি আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। এই রামকৃষ্ণচরিত পাঠ করিতে যত্নপি আপনাদের কোন স্থানে সন্দেহ কিম্বা জিজ্ঞাস্য থাকে, তাহা হইলে সেই বিষয় লিখিয়া পাঠাইলে আমরা অতি আনন্দের সহিত সে সম্বন্ধে বলিবার যে টুকু শক্তি থাকিবে, তাহার ক্রটি হইবে না।

কলিকাতা।

১১ নং মধুরায়ের লেন।
রথযাত্রা, সন ১২৯৭ সাল।

ভক্তাঙ্কুশীত

শ্রীরামচন্দ্র দত্ত দাসগু।

সূচীপত্র ।

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
জন্মসূক্তান্ত	১
উপনয়ন	৪
কলিকাতায় আগমন	৫
দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালী ও রাধাকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠা	৫
পূজায় ব্রতী	৫
বিবাহ	৬
মাতার নিকট সরোদনে প্রার্থনা	৭
সচ্চিদানন্দময়ীর জ্যোতিষন মূর্তি দর্শন ও বিবাহবস্থা	৮
সাধন কার্য আরম্ভ	৯
অহং-নাশের প্রার্থনা	৯
কামিনী-কাঞ্চন বিচার	১১
দানের পাত্রাপাত্র বিচার ও কশাইয়ের আখ্যায়িকা	১২
টাকা ও মাটি লইয়া বিচার	১২
চন্দন ও বিষ্ঠা লইয়া বিচার	১৫
পঞ্চবটীতে সাধন ও সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন	১৭
পঞ্চবটীর বেড়া সংস্কার	২০
ব্রাহ্মণীর সহিত মিলন	২২
বৈষ্ণবচরণের বন্দনা	২৩
তত্ত্বোক্ত সাধন ও অজ্ঞাত্ত পিবিধ সাধন	২৪
মথুর বাবু ও রাসমণি কর্তৃক পরীক্ষা	২৮
হুমানের ভাব সাধন	৩২
সখীভাবের সাধন	৩৪
মথুর বাবু প্রদত্ত দেড়হাজার টাকার শাল পরিত্যাগ	৩৭
মুসলমান ধর্ম্যে দীক্ষা	৪৩
যীশুর ভাব সাধন	৪৪
ষোড়শী পূজা	৪৬
মথুরকে ঐশ্বর্য্য ও শক্তি প্রদর্শন	৪৯
তীর্থ পর্য্যটন	৫১
গঙ্গামাতার সহিত সাক্ষাৎ	৫৩
কলুটোলার চৈতন্য অঙ্গনে উপবেশন	৫৭
কালিনায় গমন ও ভগবান্ন দাস বাবাজীর সহিত সাক্ষাৎ	৫৮
গ্রামবাজারে সংকীর্ণন	৫৯
পাণিহাটীর মহোৎসবে গমন	৬০
পণ্ডিত দীনবন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ	৬২

* ত্রমবশতঃ দেড়শত টাকার বলিয়া ছাপা হইয়াছে ।

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
লক্ষ্মীনারায়ণের দশ সহস্র টাকা দিতে অস্বীকার	৬৪
কেশব বাবুর সহিত ব্রহ্মশক্তি বিচার	৬৭
ভগবান্, ভাগবত ও ভক্ত এক	৭৩
কেশব বাবুর মাতৃ ভাবে উপাসনা শিক্ষা	৭৮
কেশব বাবুর নববিধান	৮৩
কৃষ্ণদাস পালের সহিত কথোপকথন	৮৭
বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের রক্তাস্ত	৮৮
হৃদয় কড়ক ভৎসনা	৯৩
হৃদয়ের শক্তি হরণ	৯৫
গ্রন্থকারের ইতিবৃত্ত	৯৮
গ্রন্থকারের স্বপ্নে মদ্র প্রাপ্তি	১০৩
"এক কোপীনকো আন্তে"র উপাখ্যান	১০৬
স্বরেন্দ্রনাথ মিত্রের পরিবর্তন	১১৪
গিরিশচন্দ্র ঘোষের ইতিবৃত্ত	১১৯
মনোমোহন মিত্রের জননীর রক্তাস্ত	১২৫
গৌরীমা'র প্রেমাবেশ	১২৬
গোপালের মা'র বাৎসল্য-ভাণ	১২৮
জন্মোৎসব আরম্ভ	১৩০
কথকের ভাঙ্গা হাড়িতে রন্ধন	১৩৪
অভয়বাণী প্রকাশ	১৩৬
গলদেশে বেদনা ও ব্যাদি আরম্ভ	১৩৭
ব্যাধির জ্ঞান কলিকাতায় গ্রামপুকুরে আগমন	১৩৮
ডাক্তার সরকারের সহিত গিরিশ ও জনৈক ভক্তের বিচার	১৪০
কালীভাবে পূজা গ্রহণ	১৪২
কাশীপুরে আসন পরিবর্তন	১৪৪
কল্পভরু রূপ প্রদর্শন	১৪৫
শশীর সেবা ও দাস্তা ভক্তি	১৪৭
মহাসমাধি	১৫০
কাশীপুরে দেহের অগ্নি-সংস্কার	১৫৩
কুড়গাছীর যোগোদ্যানে সমাধি	১৫৪

পরিশিষ্ট ।

জনৈক ডাক্তারের অনুতাপ ও চৈতন্যোদয়	১৫৭
কামরস্তির উদ্দীপন	১৫৮
অধর বাবুকে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা কথন	১৫৯

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
দয়া ও ভালবাসা	... ১৬০
ফাওয়া খেলা	... ১৬৪
অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়	... ১৬৬
পরমহংসদেবের ধর্মভাব সম্বন্ধে শিবনাথ শাস্ত্রীর মত	... ১৬৯
অবতারের প্রয়োজন	... ১৭১
অবতার ও সিদ্ধপুরুষে প্রভেদ	... ১৭২
অবতারের লক্ষণ	... ১৭৭
দুইটি নূতন ভাব প্রদর্শন	... ১৭৯



শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ।

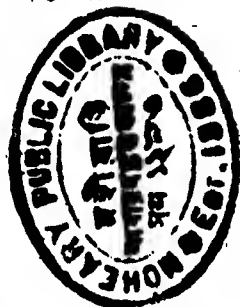


শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রিয় শিষ্য মহাত্মা রামচন্দ্র

শ্রী শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের

জীবনবৃত্তান্ত !

প্রথম পরিচ্ছেদ ।



চগলী জেলার অন্তঃপাতী শ্রীপুর কামারপুকুর গ্রামে শ্রীকুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের নিবাস ছিল। প্রবাদ আছে যে, এই চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অতিশয় ধর্মনিষ্ঠ ও প্রকৃত জাপক ছিলেন। তিনি এমন ভক্তি সহকারে তাঁহার ইষ্টমূর্তি রঘুবীরের পূজার্কনাদি করিতেন যে, বাহিরের লোকেরা তাঁকুর যেন প্রত্যক্ষ হইয়া পূজা গ্রহণ করিতেছেন, এরূপ অহ্মান করিত। আরও প্রবাদ আছে যে, তিনি একটি সরোবরে প্রতাহ স্নান করিতেন। যে পর্যান্ত তাঁহার স্নান সমাপন না হইত, সে পর্য্যন্ত সেই পুরুর্ণোত্তে অগ্নি কোন ব্যক্তি পান্ননির্মুক্ত করিতে সাহস করিত না। তাঁহার তপঃপ্রভাবে তদ্পল্লিষ্ট সকলেই বীড়িত ছিল এবং সহসা কেহই তাঁহার সমীপে অগ্রসর হইতে পারিত না। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্ত্রীলা ও সদগুণসম্পন্না এক সহধর্মিণী ছিলেন। তাঁহার এমনই দয়ালু হৃদয় ছিল যে, কাহাকে ক্ষুধাতুর দেখিলে, গৃহে যে কোন দ্রব্য থাকিত, তাহা তৎক্ষণাৎ তাহাকে ভোজন না করাইয়া, তিনি কোন মতে স্থির হইতে পারিতেন না। তাঁহার গর্ভে তিন পুত্রসন্তান জন্মে। জ্যেষ্ঠ রামকুমার, মধ্যম রামেশ্বর এবং পরমহংসদেব সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন।

১৭৫৬ শকাব্দার ১০ই ফাল্গুন, গুরুপক্ষ দ্বিতীয়া তিথি, বুধবারে পরমহংসদেব ভূমিষ্ঠ হন।

পরমহংসদেব বাল্যকালে কিঞ্চিৎ কুশকাঁয় ছিলেন। তিনি দেখিতে উচ্চল গৌরবর্ণ, সকলের প্রিয় এবং মিষ্টভাবী ছিলেন। তাঁহাকে সকলে গদাই বলিয়া

* রামকৃষ্ণের জন্ম এবং বাল্যকালের অবস্থা সম্বন্ধে আশ্চর্য্য কিম্বদন্তি আছে। “কুদিরাম চট্টোপাধ্যায় গয়াধামে গমন করিয়া একদিন রজনীযোগে স্বপনে দেখিলেন যে, একটা চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, “দেখ, আমি তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিব।” চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহস্র ১০ প্রাভাত হইয়া গেল এবং মনে মনে আনন্দি

ডাকিত ; কিন্তু প্রকৃত নাম রামকৃষ্ণ ছিল। এই গ্রামে ধর্মদাস লাহা নামক এক ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার পুত্র গঙ্গাবিষ্ণু লাহা। ক্ষুদিরাম ইহার সহিত রামকৃষ্ণের সঙ্গাৎ (পল্লিগ্রামের লোকেরা যাহার সহিত বন্ধুতা করেন, তাহাকে কখন কখন সঙ্গাৎ কহিয়া থাকেন) পাতাইয়া দেন। রামকৃষ্ণ সেই জন্ত লাহাদের বাটীতে সর্বদা গমনাগমন করিতেন। গঙ্গাবিষ্ণুর মাতা রামকৃষ্ণকে গদাধর তর্কবিশর্ক হইতে লাগিল। যৎকালে তিনি গয়াধামে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাঁহার স্ত্রী একদিন নিজগ্রামের বাটীর সন্নিকটে অপর ছুটীটা প্রতিবাসিনীর সহিত দণ্ডায়মান ছিলেন। ঐ বাটীর সন্নিক্ষেণে একটী শিবের মন্দির আছে। সেই শিবালয়ের দিক্ হইতে ঘনীভূত বায়ু তাঁহার উদর মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি ভৎক্ষণাৎ ঐ কথা নন্দিনীদয়কে কহিলেন। ইহা-দেব মধ্যে একজনের নাম ধনি ছিল। পরে ক্রমে ক্রমে তাঁহার গর্ভের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় বাটীতে আসিয়া এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, নাক্ত্রীর প্রতি সন্দেহ করিলেন, না তাঁহার স্বপ্নপ্রসূত কন্যাকেও খুলিয়া বলিলেন। গর্ভকালে রামকৃষ্ণের জননীর রূপলাবণ্যের ইয়ত্তা ছিল না। পাড়ার মেয়েরা বলিত, “মাগীর শেববয়সে এমন রূপ হইল কেন ? বোধ হয় এইবার মরিবে।” তিনি সকলের কাছে বলিতেন যে, “আমি কত রকমের ঠাকুর দেবতা দেখিতে পাই। এত সম্ভানাদি হইয়াছে, কিন্তু কখনও এমন দেখি নাই।” লোকেরা মাগী পাগল হইয়াছে বলিয়া উপহাস করিত। দশমাস দশদিন পূর্ব হইলে রামকৃষ্ণ ভূমিষ্ঠ হন। তাঁহার পিতা তাঁহার নাম গদাধর রাখিলেন, লোকে সেই জন্য গদাই বলিয়া ডাকিত। ইতিপূর্বে ক্ষুদিরামের অবস্থা অত্যন্ত হীন ছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রামকুমার তখন উপযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি দশকর্ম্মশ্রিত ও সুদক্ষ ছিলেন। তাঁহার উদার প্রকৃতির জন্য অনেকে তাঁহাকেও পাগল বলিত। রামকৃষ্ণের জন্মকাল হইতে রামকুমারের উপার্জনাদি অধিক পরিমাণে হইতে লাগিল। বাটীতে দ্রব্যাদির আর অভাব রহিল না। তিনি এইরূপ সহসা অবস্থা পরিবর্তন হইতে দেখিয়া সর্বদাই কহিতেন যে, আমার বোধ হয় আমাদের বাটীতে কোন দেবতা আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা না হইলে এ প্রকার সংসারে সুখ-সচ্ছন্দতা কিরূপে হইল ? একদিন ক্ষুদিরাম এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিয়াছিলেন যে, “তোমরা একটা বিপদ না ঘটাইয়া ছাড়িবে না। যাহা হয় হইয়াছে, ও কথা কাহার নিকট বলিতে নাই।”

রামকৃষ্ণ যখন চতুর্থ কিসা পঞ্চম মাসে উপনীত হইয়াছেন, একদিন তাঁহার মাতা গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার শিশু সম্ভান নাই, একটি আট দশ বৎসরের বালক শয়ন করিয়া রহিয়াছে। তিনি অতি বাস্তব চীৎকার করিয়া বাহিরে আসিলেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই চীৎকার শুনিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করায়, তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা ব্যক্ত করিলে পর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কহিলেন, এ সকল হইবে তাহা আমি জানি, তুমি গোলমাল করিও না। মাতার প্রাণ কি তাহাতে শান্তিলাভ করিতে পারে ? তিনি পুনরায় কহিলেন যে, “তুমি রোজা আনাইয়া একটা উপায় কর, বালককে ছুতে পাইয়াছে।” রঘুবীর আছেন, তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে, এই বলিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্বাশান্তরে চলিয়া গেলেন।

বলিয়া ডাকিতেন। যখন তিনি যে দ্রব্য প্রস্তুত করিতেন, অগ্রে গদাধরকে খাওয়াইতেন এবং সর্বদা বলিতেন, “হাঁরে গদাধর ! তোকে কেন এত ভাল-বাসি বল দেখি। তোকে না দেখলে প্রাণ চঞ্চল হয়ে উঠে। কখন কখন তোকে ঠাকুর বলে জ্ঞান হয়।” রামকৃষ্ণ একটু হাসিয়া চলিয়া যাইতেন।

এই লাহাবাবুদের অতিথিশালা ছিল (শুনিয়াছি অষ্টাপিও আছে)। স্মৃতরাং নানা ভাবের নানাবিধ অতিথি তথায় আসিতেন। রামকৃষ্ণ অতিথিদিগের সহিত বসিয়া থাকিতেন। তাঁহারা তাঁহাকে তিলকাদি পরাইয়া দিতেন এবং যে সকল ভোজ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিতেন, তাহা তাঁহাকে খাওয়াইতেন। মধ্যে মধ্যে অতিথিরা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া রামকৃষ্ণের পিতামাতাকে দেখিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাদের বাটীতে যাইতেন। একদিন রামকৃষ্ণ একখানি নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া অতিথিদিগের নিকট গিয়াছিলেন। তিনি তথায় যাইয়া সেই বস্ত্রখানিকে খণ্ড খণ্ড পূর্বক আপনি কোপিন পরিধান করেন এবং অপর খণ্ড হস্তে লইয়া গৃহে প্রতাগমন পূর্বক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও জননীর নিকট কহিলেন, “তোমরা দেখ, কেমন আমি সাধু সেজেছি। আজ সাধুরা আমায় সাজিয়ে দিয়েছে, রুটি খাওয়াইয়াছে, আমি ঘরে কিছুই খাব না।”

রামকৃষ্ণকে এইরূপে যে আদর করিয়া লইয়া যাইত, জাতি বিচার না করিয়া। তাহারই প্রদত্ত অন্ন ভোজন করিতেন। লেখা পড়া সম্বন্ধে একেবারে তাঁহার কিছুই আগ্রহ ছিল না (তাঁহার হস্তলিখিত একখানি রামায়ণ আছে, তাহাতেই তিনি যে লেখা পড়া কিরূপ জানিতেন, স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে)। একজ্ঞ বাঙ্গালাভাষাও ভাল করিয়া শিক্ষা করেন নাই। যখন তাঁহাকে পাঠশালায় প্রেরণ করা হয়, তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে, “লেখা পড়া শিখিয়া কি করিব ? তাহার ফল ত কেবল চাল কলা; এমন বিজ্ঞা আমি শিখিব না।” তাঁহার মেধাশক্তি এত প্রবল ছিল যে, যখন যে কোন বিষয় শ্রবণ করিতেন, তৎক্ষণাৎ তাহা তাঁহার অভ্যাস হইয়া যাইত। এইরূপে যাত্রা, কীর্তন, চণ্ডীর গীত ও নানাবিধ সঙ্গীতাদি তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়াছিল। প্রতিবেশীরা তাঁহার নিকট সময়ে সময়ে সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া সুখী হইতেন। তাঁহার কণ্ঠ অতি স্নমদূর ছিল। বাঁহারা তাঁহার বয়োরদ্ধকালে সঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহার বালককালের অবস্থা কিয়ৎ পরিমাণে অনুমান করিতে পারিবেন।

রামকৃষ্ণের ভূমিষ্ঠকাল হইতে কিশোরকাল পর্য্যন্ত ধনি নাম্নি এক কন্ম-কারের কণ্ঠা তাঁহাকে লালন পালন এবং পুত্রাধিক রেহ করিত। ধনি দেহবশে

রামকৃষ্ণ যে ব্রাহ্মণকুমার তাহাও বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল। ধনি যখন যাহা ভক্ষণ করিত, তাহা রামকৃষ্ণকে না দিয়া নিশ্চিত হইতে পারিত না। রামকৃষ্ণের জ্ঞান হইলে পর, ধনি বলিয়াছিল যে, “বাবা ! তোমার পৈতের সময় আমি তেঁমাকে শিক্ষা দিব।” রামকৃষ্ণ তাহা প্রাকার করিয়াছিলেন। পরে যখন উপনয়নের দিন উপস্থিত হইল, রামকৃষ্ণ ধনির নিকট অগ্রে শিক্ষা চাহিলেন। ধনি শূদ্র জাতি, ব্রহ্মচারীকে কি বলিয়া শিক্ষা দিবে, এই হেতু রামকুমার আপত্তি উত্থাপন করিলেন, কিন্তু পরিশেষে রামকৃষ্ণের ইচ্ছাই ফলবতী হইয়াছিল। ধনি তদবধি রামকৃষ্ণের শিক্ষামাতা হইলেন।

কৃষ্ণলীলা বিষয়ক প্রায় সমুদয় ঘটনাবলী তাঁহার কর্ণস্থ ছিল। সময়ে সময়ে রাখাল বালক ও অন্নাগ্ন বয়স্কদিগের সমভিব্যাহারে মাঠে গমন করিতেন। তিনি নিজে কৃষ্ণ সাজিতেন এবং অন্নাগ্ন বালকদিগকে শ্রীদাম সুবল ইত্যাদি নাম প্রদান করিয়া বন্দাবনের ভাব ক্রীড়া করিতেন, গাঁহার দূর হইতে সেই সকল অবলোকন করিতেন, গাঁহার চমৎকৃত ও আনন্দে বিমোহিত হইয়া যাইতেন। ঠাকুর দেবতার প্রতি রামকৃষ্ণের ভক্তি ছিল এবং স্বহস্তে মৃত্তিকার ঠাকুর গড়িয়া পূজা করিতেন ও সময়ে সময়ে তিনি তদ্বাবে অচেতন হইয়া পড়িতেন। এইরূপে প্রায় দশ বারো বৎসর অতিবাহিত হইয়া যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

—০—

রামকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কলিকাতার অন্তঃপাতী বামাপুত্র নামক স্থানে একটা চতুষ্পাঠী ছিল। তিনি লেখা পড়ার উদ্দেশ্যে তথায় আসিয়া অবস্থিতি করেন। কিন্তু এ স্থানে আসিয়াও পাঠ সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগী হন নাই। পাড়ার ভদ্রমহিলারা তাঁহাকে বিশেষ ভালবাসিতেন এবং তাঁহার নিকট গীত শ্রবণ করিয়া পীতলাভ করিতেন। একে ব্রাহ্মণ, তাহাতে বালক, দেখিতে রূপবান্, মিষ্টভাষী এবং মধুর গীত গান করিতে পারিতেন ; সুতরাং, পাড়ার প্রত্যেক হিন্দু মহিলার নিকট সমাদৃত হইতেন।

সন ১২৫৯ সালের আষাঢ় মাসে কলিকাতার দক্ষিণ বিভাগের অন্তঃপাতী জানবাজারনিবাসিনী মাড়-কুল-গৌরবা বিখ্যাতনামা রাসমণি দাসী দক্ষিণেশ্বর নামক স্থানে প্রচুর অর্থব্যয়ে কালী ও রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তিষয় তাঁহার গুরুর নামে স্থাপন

করিয়া, পরমহংসদেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে স্নদক্ষ এবং সুপণ্ডিত জানিয়া, পূজা-কার্য্যে বরণপূর্ব্বক দক্ষিণেশ্বরে প্রেরণ করেন । পরমহংসদেবও অগত্যা জ্যেষ্ঠের সমাভিব্যাহারে গমন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ।

যে দিবস উক্ত দেবদেবী প্রতিষ্ঠিত হন, সেই দিবস তথায় জনাকীর্ণ হইয়াছিল । ধুমধামের ইয়ত্তা ছিল না । ভোজ্য পদার্থ অপরিমিত পরিমাণে প্রস্তুত হইয়াছিল ; কিন্তু পরমহংসদেব তাহা কিছুই স্পর্শ করেন নাই । তিনি সমস্ত দিবস অনাহারে থাকিয়া রাত্রিকালে নিকটস্থ এক মুন্সীর দোকান হইতে এক পয়সার মুড়কী ক্রয় করিয়া ভক্ষণ করিয়াছিলেন । তিনি কি জ্ঞাত যে মন্দিরের সামগ্রী স্পর্শ করেন নাই, আমরা তাহার কোন কারণ প্রদর্শন করিতে পারিলাম না ।

দক্ষিণেশ্বর কলিকাতার উত্তর-অনুমান তিন ক্রোশ দূর হইবে । ঠাকুরবাটীর উত্তান গঙ্গার পূর্ব্বতীরে অবস্থিত । প্রবাহিনী স্বভাবতঃই প্রীতিপ্রদ ; বিশেষতঃ, হিন্দুগণ যখন জাহ্নবীর তীরে দণ্ডায়মান হইয়া, তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তখন তাঁহাদের হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় ভক্তিভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে । সেই সঙ্গে দেবমন্দির । যাহার প্রকাণ্ড আকার, শিল্পকার্য্যপ্রসূত মনোহর দৃশ্য ও গম্ভীর ভাব প্রত্যক্ষ করিলে, এমন কি ভিন্ন শ্রেণীর দর্শকমণ্ডলীরও চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া যায় । এই দেব উদ্যানের উত্তরাংশে জাহ্নবী-কূলে দীর্ঘকাল-ব্যাপী অতি বিস্তীর্ণ একটি বটবৃক্ষ আছে । ইহার কাণ্ড প্রকাণ্ড, শাখা প্রশাখা দ্বারা অনুমান এক বিঘা জমি সমাচ্ছাদিত হইয়া আছে । মধ্যে মধ্যে তাহার শাখাদিগের অবলম্বন স্বরূপ এক একটা পুষ্টি লম্বমান হইয়া শুঁড়ীবিশেষ হইয়া গিয়াছে । ইহার দক্ষিণ ভাগে একখানি কুটার ছিল । এক্ষণে সে স্থানে ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ হইয়াছে । এই বটবৃক্ষের উত্তর পূর্বাংশে একটি বেলগাছ আছে । পরমহংসদেবের জীবনচরিত্র সম্বন্ধে এই বৃক্ষদ্বয়ের বিশেষ সম্বন্ধ আছে, সেই জন্ত উহারা উল্লিখিত হইল ।

রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে গমন করিয়া, প্রথমে বৈশ্যকারী, পরে রাধাকৃষ্ণ পূজায় ব্রতী হইয়াছিলেন । অনন্তর তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার লোকান্তর গমনে রাসমণি দাসী তাঁহাকে কালীপূজায় নিযুক্ত করেন ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

রামকৃষ্ণ যখন পঞ্চদশ কিম্বা ষোড়শ বর্ষে উপনীত হন, সেই সময়ে তাঁহার অভিভাবকেরা বিবাহের জ্ঞাত্ত্ব অনুষ্ঠান করেন । রামকৃষ্ণ বিবাহের কথা শুনিয়া কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নাই ; বরং তিনি তাহাতে আনন্দিত হইয়াছিলেন । বিবাহ কি, কেন বিবাহের প্রয়োজন, তাহা তিনি কিছুই জানিতেন না । বিশেষতঃ ঈশ্বরানুরাগী ১৫।১৬ বৎসরের বালকের পক্ষে কখনই সম্ভবনীয় নহে ।

রামকৃষ্ণের স্বদেশের নিকটস্থ জয়রামবাটী নামক গ্রামে রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যাকে তাঁহার পাত্রী স্থিরীকৃত করা হয় । পাত্রীর নাম শ্রীমতী সারদা মণি দেবী । সারদামণির বয়ঃক্রম তখন আট বৎসর মাত্র ।

বিবাহের দিন স্থির হইলে, রামকৃষ্ণ আনন্দচিত্তে দেশে গুভযাত্রা করেন এবং গুভলয়ে বিবাহাদি সমাধা করিয়া, পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন পূর্বক শ্রুকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন ।

বিবাহের পর সময়ে সময়ে তাঁহার জীবন কথা মনে পড়িত । কখন কখন শ্মশুরালয়ে গমন করিবার জ্ঞাত্ত্বও মনে বাসনা হইত ; কিন্তু মনের সাধ মনে উঠিয়া, মনেই ক্রীড়া করিত এবং উহা মনেই বিলয় প্রাপ্ত হইয়া যাইত ।

রামকৃষ্ণ পূর্ব হইতেই জানিতেন যে, মনুষ্যদিগের বিবিধ সংস্কার আছে । যথা, কণ্ঠবেধ, চূড়াকরণ, দীক্ষা, যজ্ঞোপবীত, বিবাহ ইত্যাদি । বিবাহকালীন তাঁহার মনে মনে ঐ ভাব বলবতী ছিল । এই জ্ঞাত্ত্বই বোধ হয়, পরিণয়কালে তিনি কোন প্রকার মতামত প্রকাশ করেন নাই । বিবাহের পর যে শ্মশুরালয়ে গমনের অভিলাষ হইত, তাহার কারণ কিছুই তিনি জানিতেন না । বোধ হয়, ঠাকুরবাটীর অগ্ন্যাগ্ন ব্যক্তির। যখন ঐ সম্বন্ধে কথোপকথন করিত, তখনই তাঁহারও মনে শ্মশুরালয়ের উদ্দীপন হইয়া যাইত ; কিন্তু তাঁহার আশা আর ফলবতী হয় নাই ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রামকৃষ্ণ পূজায় রতী হইয়া, অতি বিচিত্র ভাবে তাহা সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। তিনি নিত্যন্ত আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তিসহকারে দেবীর পূজা করিতেন। কখন তাঁহাকে সুবাসিত পুষ্প মালাদির দ্বারা মনের সাধে সুসজ্জিত করিতেন, কখন বা দেবীর চরণকমলে কমল-কুসুম অথবা বিষ্ণু জবা স্থাপন পূর্বক অপূর্ণ চরণ-শোভা সন্দর্শন করিয়া আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইতেন। কখন বা রাম-প্রসাদ, কমলাকান্ত ও সময়ান্তরে নরেন্দ্র প্রভৃতি শক্তি-সাধকগণবিরচিত শক্তি-বিষয়ক গীতগুলি গান করিতেন। কখন বা কৃতান্তলিঙ্গ হইয়া সরো-দনে বলিতেন, “মা ! আমায় দয়া কর্ মা, তুই মা রামপ্রসাদকে দয়া কর্‌লি, তবে আমায় কেন দয়া কর্‌বি না মা ! মা ! আমি শাস্ত্র জানি না, মা ! আমি পণ্ডিত নই মা, মা ! আমি কিছুই জানি না, আমি কিছুই জানিতে চাই না, তুই আমায় দয়া কর্‌বি কি না বন্ ? মা ! আমার প্রাণ যায় মা, আমায় দেখা দাও ; আমি অষ্টসিদ্ধাই চাই না মা, আমি লোকের নিকট মান চাই না মা, লোক আমায় জানুক, মানুক, গল্পুক, এমন সাধ নাই মা, তুই আমায় দেখা দে !” রামকৃষ্ণ এইরূপে প্রত্যহ সন্ধ্যার পর আরতি সমাপন করিয়া একাকী দেবীর সম্মুখে উপবেশনপূর্বক রোদন করিতেন এবং দর্শনের জন্ত কতই প্রার্থনা করিতেন। যখন ভক্তেরা দেবদেবীর মন্দিরে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহাদের হৃদয়ে যে কি অপূর্ণ ভক্তির উদ্বেক হয়, তাহা ভক্তমাত্রেই অনুভব করিয়া থাকেন। উহা বাক্য অথবা শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা কখনই সাধাসম্ভব নহে। এমন দেবী-মন্দিরে দেবীর সম্মুখে, তাহাতে নির্জন স্থান, আবার তদসহ বালকের সরল ও অকপট বিশ্বাস এবং অনুরাগ। যে যে অবস্থা অনুকূল হইলে ঈশ্বর দর্শন হয়, অর্থাৎ অনুরাগ এবং অকপট বিশ্বাস, রামকৃষ্ণের তাহাই হইয়াছিল। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং তাঁহার চরণে মনোপূজা করা, প্রত্যেক ধর্মের মূল কথা, রামকৃষ্ণও তাহাই করিয়াছিলেন। তিনি দিব্যরজনী মা কালীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। ক্রমে প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। যখন প্রাণ কাঁদিল, যখন ব্রহ্মময়ী দর্শনের জন্ত প্রাণ ছুটিল, যখন জগতের সমুদয় বস্তু হইতে প্রাণ বিদায় গ্রহণ করিল, যখন প্রাণ মাতার দর্শনভাবে ওষ্ঠাগত হইল, তখন অন্তর্যামিনীও তাহা জানিলেন। একদিন রামকৃষ্ণ দেবীর সম্মুখে উপবেশন

করিয়া “মা ! আমায় দেখা দে মা” বলিয়া রোদন করিতেছিলেন, এমন সময়ে তিনি সহসা উন্নতের ঠায় হইয়া পড়িলেন । মুখমণ্ডল ও চক্ষুদ্বয় আর-
 ত্ত্বিত হইল, চক্ষের দৃষ্টি বহির্জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল ; অবিরাম নয়ন-
 ধারায় বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যে স্থানে উপবিষ্ট ছিলেন, সেই স্থান যেন প্লাবিত হইতে
 লাগিল । অত্যাশ্রয় লোকেরা তাঁহাকে স্থানান্তরে লইয়া গেল । পরদিন দিবা-
 ভাগে নয়নোন্মীলন করিতে পারিলেন না । মুখে আহার তুলিয়া দিলে তবে
 ভোজন করিলেন । শৌচ প্রস্রাব অজ্ঞাতসারে হইয়া যাইত, কিন্তু কেবল মা
 বলিতে পারিতেন এবং মা মা করিয়া রোদন করিতেন । রামকৃষ্ণের এই
 অবস্থা ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতে লাগিল । তখন তাঁহার এই অবস্থাটী যেন মাতৃস্তন-
 পায়ী বালকের ঠায় হইয়াছিল । শিশু যেমন তাহার জননীকে না দেখিতে
 পাইলে, মা মা বলিয়া চিৎকার করিয়া থাকে, রামকৃষ্ণকে দেখিলে অবিকল
 তাহাই মনে হইত । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার সেই সময়ে কি অবস্থা লাভ
 হইয়াছিল ও মনের ভাব কিরূপ ছিল, তাহা আমরা কি জানিব এবং কিরূপেই
 বা বর্ণনা করিব ? তবে বাহিরের লক্ষণ দেখিয়া, শাস্ত্রের সাহায্যে, সাধুদিগের
 বাক্যক্রমে এবং গুরুপ্রসাদে এইমাত্র বলিতে পারা যায় যে, তিনি বিরহাবস্থায়
 পুতিত হইয়াছিলেন । কারণ একবার সেই সচ্চিদানন্দময়ীর জ্যোতিষ্মনমূর্তি
 দর্শন করিয়া, তাঁহার সুন্দর ছবি, অলৌকিক রূপলাবণ্য, অনির্কলচরিত্র ভাব-
 কাস্তি, জগদানন্দের ঘনীভূত রূপ দেখিয়া তাহাতে বঞ্চিত হইবামাত্র বিরহ
 আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল । এই বিরহাবস্থার বিশেষ তাৎপর্য আছে ।
 ঈশ্বরকে দর্শন না করিয়া, তাঁহার অস্তিত্ব উপলব্ধি না করিয়া, তাঁহার স্বরূপ-
 জ্ঞান না পাইয়া, কেবল নাম শ্রবণ পূর্বক যখন মনুষ্যগণের প্রবল অহুরাগের
 লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে, তখন তাঁহাকে একবার দেখিলে, অথবা তাঁহার
 শক্তির বিশেষ কোন প্রকার প্রকাশ দেখিতে পাইলে, অহুরাগ যে পরিরক্তি
 প্রাপ্ত হইবে, তাহার কিছুই বিচিত্র নাই । রামকৃষ্ণ ইতিপূর্বে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ
 লাভ না পাইয়াই যখন অহুরাগের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন, তখন
 দর্শনের পর কি কেবল চক্ষের দেখাতে তাঁহার প্রাণে তৃপ্তি লাভ হইতে পারে ?
 আমরা যद्यপি কোন মহাত্মার সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হই, তাগ হইলে তাঁহার অন্ততঃ
 দুটো কথা না শুনিয়া কখনই স্থানান্তরে গমন করিতে আমাদের ইচ্ছা হইবে
 না । মহান্ হইতে মহান্ যিনি, শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতম যিনি, আনন্দ হইতে
 পরমানন্দ যিনি, সং হইতেও সং যিনি, মঙ্গল হইতে পরমমঙ্গল যিনি, তাঁহার

স্বরূপ দর্শন করিয়া রামকৃষ্ণ যে প্রেমাকাজক্ষী না হইবেন, তাহা চিন্তা করিয়া সাব্যস্ত করিতে হইবে না । যে রূপ বিচারের অতীত, বিজ্ঞানশাস্ত্র সমাক্ষিপে ঘাহার বৃত্তান্ত দিতে পারেনা ; ঘাহার মহিমা অপার, অনন্ত এবং অতুল ; ঘাহার সম্বন্ধে অগণন শাস্ত্র, অগণন মত, অগণন ভাব বিভিন্ন অর্থে পরিচয় দিতেছে ; বেদে ঘাহাকে অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অনাদি বলিয়া নিরস্ত হইয়াছে ; ঘাহার দর্শন বড়দর্শনে একপ্রকার অদর্শন করিয়া দিয়াছে ; পুরাণে ঘাহার কত রূপের বর্ণনা করিয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবতে ঘাহার প্রেমের কাহিনীর শ্রোত চালাইয়াছে, সেই জগৎপতি জগদীশ্বরকে দর্শন করিয়া মনোমধ্যে যে কি প্রকার আনন্দ ও উৎসাহ সমুৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা, তাহা সাধারণ মনের সম্পূর্ণ বহির্ভূত কথা ।

রামকৃষ্ণ এই উন্নতাবস্থায় ক্রমাগত ছয় মাস ছিলেন । শায়ে বিরহের যে সকল লক্ষণ উল্লিখিত আছে, তৎসমুদয়ই তাঁহাতে প্রকাশ পাইয়াছিল । তদনন্তর ক্রমে ক্রমে তাঁহার এই অবস্থা কিয়ৎ পরিমাণে সামান্য হইয়া আসিতে লাগিল ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

রামকৃষ্ণ উন্নতাবস্থা অতিক্রম করিয়া যখন সহজ ভাব প্রাপ্ত হইলেন, তখন তাঁহার সাধন কার্য আরম্ভ হইল । তিনি সর্বদা বলিতেন যে, "ফল না হইলে ফল হয় না, কিন্তু অলারু ও কুমড়াদির অগ্রে ফল বহির্গত হয়, তদনন্তর ফল দুটিয়া থাকে ।" রামকৃষ্ণের অগ্রে ঈশ্বর-দর্শন, তদনন্তর সাধন-কার্য আরম্ভ হইয়াছিল ।

ঈশ্বর-সাধনে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে মনকে যেভাবে প্রস্তুত করিতে হয়, রামকৃষ্ণ তাহাই করিয়াছিলেন । তাঁহার মনে উদয় হইল যে, অভিমান বা অহঙ্কার ঈশ্বর-পথের কণ্টক এবং আবরণ-স্বরূপ ; কারণ মনে যত্বপি অহংজ্ঞান নিয়ত পরিপূর্ণ থাকে, তাহা হইলে সে স্থানে ঈশ্বরভাব কখনই প্রবেশ করিতে পারিবে না । তিনি তন্নিমিত্ত প্রত্যহ সরোদনে মাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেন, "মা ! আমার অহং নাশ করিয়া দাও । আমার আমি বিলুপ্ত করিয়া তথায় তুমিই বর্তমান থাক । আমি হীনের হীন, দীনের দীন, এই বোধ যেন আমার সর্বক্ষণ থাকে । বাক্ষ্য হউক কিম্বা ক্ষত্রিয় হউক, বৈশ্য হউক কিম্বা শূদ্র হউক, অথবা সমাজ-গণিত নীচ ব্যক্তি, ঘাহারা হাড়ি মুচি বলিয়া উল্লিখিত, তাহারাই হউক ; কিম্বা পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদিই হউক ; সকলেই মা আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই

জ্ঞান, এই বোধ, এই ধারণা হইয়া থাকে।” কখন বা একরূপ কার্য্য করিতেন, যাহাতে অন্যান্য লোকেরা বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিত। তাহাতে তাঁহার মনে কোন প্রকার ভাবান্তর বা অভিমান আসিত না। তিনি কখন কখন মার্জ্জনী দ্বারা পায়খানা পরিষ্কার করিতেন, কিন্তু তাহাতেও তাঁহার মনে অভিমান হইত না। ইহা দেখিয়া লোকে কত কি বলিত। তিনি উপদেবতা কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন বলিয়া কেহ অস্বীকার করিত এবং কেহ বা তাঁহার উন্মাদ রোগ হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিল। এই সকল অকার্য্য দ্বারা রামকৃষ্ণ লোকের নিকট বিলক্ষণ তিরস্কারভাজন হইতেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার গ্রাহ্য হইত না। তাঁহার মনের প্রবল বেগের নিকট বন্ধুর উপদেশ, শরীর উপহাস, মন্দিরের কর্তৃপক্ষীয়দিগের তাড়না, কিছুই স্থান পাইত না। তিনি যখন যে কার্য্য করিবেন মনে করিতেন, তাহা যে পর্য্যন্ত সমাপ্ত না হইত, সে পর্য্যন্ত তাঁহার মনোযোগের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হইত না।

রামকৃষ্ণ “মা” শব্দ এখনও পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি যাহা করিতে যাইতেন, তাহাই মাকে জানাইতেন এবং মা মা বলিয়া মধো মধো কতই রোদন করিতেন। তিনি কখন কখন গঙ্গার তীরে পতিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে “মা! মা!” বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহার সেই “মা” বলা অতি অপূৰ্ণ ছিল। যিনি তাঁহার সে অবস্থা দেখিয়াছেন, তিনিই বিমুগ্ধ হইয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিয়াছেন, “বালক একেবারে উন্মত্ত হইয়া গিয়াছে, তবু ত উহার কোন প্রকার পীড়ায় অতিশয় যত্নগ্রা হইতেছে, সেই জন্য মা মা বলিয়া চীৎকার করিতেছে।” যখন তিনি মাকে ডাকিতেন, তখন কাহারও কোন কথাই প্রত্যুত্তর দিতে পারিতেন না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

লোকের যে পর্য্যন্ত ‘আমি’ জ্ঞান থাকে, সে পর্য্যন্ত তাহার কোন কার্য্য করিবার অধিকার হয় না। রামকৃষ্ণ সে অভিমান অচিরে দূর করিয়া লজ্জা, স্নেহ এবং ভয় প্রভৃতি বিবিধ বন্ধন হইতে বিমুক্তি লাভ করিয়া মনঃসংযম-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি মনে মনে বৃষ্টিতে পারিলেন যে, জড় জগতে যে সকল পদার্থ আছে, তাহাদের বিপ্লিষ্ট করিয়া দেখিলে কামিনী এবং কাকন,

এই দ্বিবিধ আদি ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। কামিনীকাঞ্চন হইতেই সকল পদার্থের সম্বন্ধ আসিয়া থাকে। কামিনী দ্বারা আপনার উৎপত্তি এবং কামিনী হইতে সমস্তানাদি জন্মিয়া বিবিধ সম্বন্ধের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

যেমন, স্ত্রী দ্বারা পুল কলার জন্ম হয়। তাহাদের পরিণয়াদি হইলে কুটুম্বাদি বিস্তৃত এবং কালে তাহারা সমস্তানাদি প্রসবপূর্বক বংশের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে অতি বিস্তারিত সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া যায়। এই অবস্থায় পতিত হইলে মনুষ্যদিগের মনের আর সমতা রক্ষা হইতে পারে না। এ প্রকার ব্যক্তিদিগের মন খণ্ড খণ্ড হইয়া কোথায় চলিয়া যায়, তাহা পরে অহুসন্ধান করিয়াও প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

কাঞ্চন সম্বন্ধেও তদ্রূপ। অর্থের জ্ঞান বিদ্যালান্ত করিতে হয়, অর্থের জ্ঞান পরপাত্ৰকা বহন করিতেও অপমান বোধ হয় না, অর্থের জ্ঞান কার্যাবিশেষে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকিতে হয় এবং অর্থের জ্ঞান সত্যত সশঙ্কিত ও চিন্তিত থাকিতে হয়; সুতরাং মনের আর বিরাম কাল থাকিল না।

যে ব্যক্তি অনন্ত ঈশ্বরকে লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহার পার্থক্য আসক্তি অর্থাৎ কামিনীকাঞ্চনভাব বিবক্ষিত হওয়া সর্বতোভাবে কর্তব্য। একথা রাম-কৃষ্ণের হৃদয়ে আপনি উৎপাদিত হইয়া উঠিয়াছিল। তখন তাঁহার দিব্যজ্ঞান হইল যে, সেই সঙ্গসারাসার ঈশ্বরই ইহ জগতের একমাত্র অবলম্বনীয় বস্তু এবং কামিনীকাঞ্চন অসার ও তাজনীয় পদার্থ। তিনি তদনন্তর এক হস্তে রোপা মুদ্রা ও অপর হস্তে এক খণ্ড মৃত্তিকা লইয়া মনকে সম্বোধন পূর্বক বলিতেন, “মন! ইহাকে বলে টাকা ও ইহাকে বলে মৃত্তিকা। মন! এক্ষণে ইহাদের বিচার করিয়া দেখ। টাকা রূপায় চাক্তি বা গোলাকার, ইহাতে বিবিধ মুখ অঙ্কিত আছে। ইহা জড় পদার্থ। টাকায় চাউল, বস্ত্র, বাড়ী, হাতী, ঘোড়া ইত্যাদি হয়, দশজনকে ডাল ভাত খাওয়ান যায় এবং তীর্থযাত্রা, দেবতা ও সাবু সেবাও হইয়া থাকে, কিন্তু সচ্চিদানন্দ লাভ হইবার উপায় নাই। কারণ অর্থের দ্বারা মনে অহঙ্কার উপস্থিত হয়। ইহার দ্বারা অহংভাব একেবারে বিনষ্ট হইতে পারে না। অর্থে কখনই আসক্তিবিশীন মন হয় না। সুতরাং দেবতা বা সাবুর উদ্দেশ্যে কার্য হইলেও তাহাতে রজঃ তমোভাবের প্রাধান্য হইয়া উঠে; রজঃ কিস্থা তমোতে সচ্চিদানন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

সচ্চিদানন্দের প্রতি বাহার মন ধাবিত হইবে, যে কেহ পূর্ণব্রহ্মের প্রেমামান দর্শনের জ্ঞান ব্যাকুল হইবে, তাহার মনে কোন গুণের আধিক্যতা থাকিবে না।

এমন ব্যক্তির গুণত্রয় অতিক্রম করিয়া শুদ্ধসদে গমন করা আবশ্যক । শুদ্ধসদে উপনীত হইলে তবে ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে । রামকৃষ্ণ তাহা জানিয়াছিলেন । তিনি ইহাও নিশ্চয় বুঝিয়াছিলেন যে, টাকায় কিঞ্চিৎ মঙ্গলজনক কার্য্য হয় বটে কিন্তু ইহাতে যে পরিমাণ অহঙ্কার আসিয়া থাকে, তদ্বারা সঞ্চিত পুণ্য অপেক্ষা কোটি কোটি গুণ পাপের প্রাচুর্য্যই হইয়া যায় । অতএব কিঞ্চিৎ পুণ্যের অল্পরোধে পাপরাশি যে পদার্থ দ্বারা উপার্জন করা যায়, এমন দ্রব্যো আসক্ত হওয়া দূরে থাকুক, তাহার সংস্পর্শ পর্য্যন্ত না রাখাই কর্তব্য । তিনি একদা বলিয়াছিলেন যে, “কোন ব্যক্তির অতিথিশালা ছিল । যে কোন ব্যক্তি তথায় আসিত, সকলেই আশ্রয় পাইত। একদা একজন কশাই একটা গাভী লইয়া যাইতেছিল, পথিমধ্যে গাভী লইয়া কশাই বিবত হইয়া পড়ে । কশাই যতই গাভীকে প্রহার ও তাড়না করিতে লাগিল, সে কিছুতেই আর একপদও অগ্রসর হইল না । কশাই ক্ষুধা তৃষ্ণায় অতিশয় বিপর্য্যয় পতিত হইয়া, তৎক্ষণাৎ ঐ গাভীটাকে একটা রন্ধে বন্ধনপূর্ব্বক সেই দাতার বাটীতে যাইয়া অতিথি হইল । অব্যবহিত দ্বার, কশাই যাইবামাত্র অমনি উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিল । আহারান্তে বিলক্ষণ বল পাইয়া গাভীকে অনায়াসে আপন বাটীতে লইয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিল । গাভী সংহার করিবার যে পাপ হইল, তাহার অধিকাংশ সেই দাতাকে অবলম্বন করিল । কারণ, তাহার সহায়তা না পাইলে কশাই গাভীকে কোন মতে লইয়া যাইতে পারিত না ।”

মৃত্তিকা লইয়া তিনি বলিতেন যে, “ইহাও জড় পদার্থ । মৃত্তিকাতে শব্দ জন্মিয়া থাকে, তদ্বারা জড়-জীবন রক্ষা হয় বটে । মৃত্তিকায় গৃহাদি প্রস্তুত হয় এবং দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি গঠিত হইয়া থাকে । অর্থের দ্বারা যাহা হয়, মৃত্তিকার দ্বারাও তাহাই হয় । হুই, এক জাতীয় জড় পদার্থ এবং উভয়েরই পরিণাম এক প্রকার ।” তিনি মনকে পুনরায় বলিতেন, “মন ! ইহাদের লইয়া থাকিবে, অথবা সচ্চিদানন্দের চেষ্টা করিবে?” তাহার মন অর্থ লইল না, অর্থকে অতি সংসামান্য জড়পদার্থ বলিয়া জ্ঞান হইল । তিনি নয়ন মুদ্রিত করিয়া “টাকা মাটি, মাটি টাকা, টাকা মাটি, মাটি টাকা” ইত্যাকার বার বার জপ করিতে লাগিলেন । কিয়ৎকাল বিলম্বে তিনি, টাকা ও মাটি গঙ্গায় নিক্ষেপ করিয়া দিলেন । তদবধি তিনি কখনও টাকা স্পর্শ করিতে পারিতেন না । এমন কি কোনপ্রকার মূল্যবান ধাতু স্পর্শ করিলে তিনি অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ করিতেন । যত্বেপি কখন তাহার সমাপে

কেহ অর্থের কথা বলিত, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা নিবারণ করিতেন । অর্থ লইয়া তাঁহাকে অনেকে অনেক প্রকার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাতে তাঁহার মানসিক এবং শারীরিক অনাসক্তি পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইয়াছে ।

অতঃপর রামকৃষ্ণ কামিনী লইয়া বিচার করিয়াছিলেন । মনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মন ! কামিনী সন্তোষ করিবে ? কামিনী কাহাকে বলে অগ্রে বুঝিয়া লও । ইহা একটা হাড়ের খাঁচা । মাংস ও তদুপরি চামড়া দ্বারা আবৃত ; মুখকে চন্দ্রের সহিত কবিরা তুলনা করেন, কিন্তু সেই জ্যোতিঃ কাহার ? চামড়া স্বতন্ত্র করিলে কি বহির্গত হইবে ? মাংস, শোণিত এবং বস্ম ইত্যাদি । তাহা লইয়া কি সন্তোষ করিতে পার ? কামিনীদিগের শরীরে যে সকল ছিদ্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য আছে । শারীরিক পুষ্টি সাধনের জন্য কোন ছিদ্র দ্রব্যাসামগ্রী লইয়া যাইবার প্রণালীস্বরূপ এবং কোন ছিদ্রের পুরীষ নির্গমনের জন্য ব্যবস্থা হইয়াছে । এইপ্রকার যে কামিনী, তাহাকে লইয়া লোক উন্মত্ত রহিয়াছে । কামিনী দ্বারা ইহকাল পরকাল একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায় । কারণ, আত্মেল্লিয় স্নেহের জন্য যত্নপি ত্রা গৃহীত হয়, তাহা হইলে মস্তিষ্ক দুর্বল হইয়া বাইবে ; ফলে, মনের শক্তি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া আসিবে । কিম্বা কেবল সন্তানাদির জন্য যথানিয়মে দ্বাসহবাস করিলে তাহাতেও মন বিচ্ছিন্ন হইবার বিশেষ হেতু রহিয়াছে । এইরূপ মন একদিকে স্ত্রীর মোহিনী শক্তিতে বিমোহিত হইয়া রহিল, আর একদিকে বাৎসল্য মোহে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল । মনের যখন এমন অবস্থা হইল, তখন তাহার দ্বারা অনন্ত ঈশ্বরের চিন্তা কখন হইতে পারে না । সুতরাং কামিনী ঈশ্বরলাভের প্রতিবন্ধক জন্মাইয়া দিল । মন ! এক্ষণে চিন্তা করিয়া দেখ, এই জড় পদার্থে তুমি বিক্রীত হইয়া থাকিবে, কিম্বা জড়পদার্থের সৃষ্টিকর্তাকে লাভ করিবার জন্য প্রস্তুত হইবে ?” রামকৃষ্ণের মন কামিনী পরিত্যাগ করিল । তাঁহার মনে হইল যে ঈশ্বরের শক্তিকে মায়া বলে । এই মায়া-শক্তি হইতে জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে । মায়াকে তিনি মৃত্যু বলিতেন এবং মাতারূপে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন । মায়া হইতে মেয়ে, এই নিমিত্ত প্রত্যেক মেয়ের প্রতি তাঁহার তদবধি মাতৃভাব জন্মিয়া গেল ।

রামকৃষ্ণের মনে-বিচার ভাব সর্বদাই থাকিত । তিনি কখন বিনা বিচারে কোন কার্য্যই করিতেন না । কামিনীকালীন বিচার দ্বারা যে ভাব লাভ করিয়াছিলেন, তাহা এত প্রবলরূপে কার্য্য করিয়াছিল যে, কখন কোন উত্তম বস্ত্র কিম্বা অন্ত কোন পদার্থ তাঁহার ব্যবহারের জন্য প্রদান করা হইলে, তিনি তাহার

কারণ বহির্গত করিয়া তদ্বারা সচ্চিদানন্দলাভের সহায়তা জ্ঞান করিলে উহা লইতেন, নতুবা তৎক্ষণাৎ অতি অবজ্ঞাসূচক ভাব দ্বারা পরিত্যাগ করিতেন । তাঁহার বিচারের অতি সুন্দর প্রণালী ছিল । তাঁহার বিচারের মধ্যে বিশ্লেষণ (analysis) এবং সংশ্লেষণ (synthesis) প্রক্রিয়া বিশিষ্টরূপে দেখা যায় । তিনি পদার্থের স্থূলজ্ঞান লাভ করিয়া তাহা হইতে সূক্ষ্মজ্ঞানে গমন করিতেন । সূক্ষ্মভাবে ক্রিয়াকাল অবস্থিতি করিয়া, পরে তাহার কারণ অবলম্বন পূর্বক পরিশেষে মহাকারণে মনোনিবেশ করিতেন । এই মহাকারণে তিনি সচ্চিদানন্দকেই অদ্বিতীয় ভাবে দেখিতে পাইতেন । মহাকারণ হইতে সংশ্লেষণ প্রথামুসারে তিনি কারণ, সূক্ষ্ম এবং স্থূলে প্রত্যাগমন করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িতেন । তিনি তাই বলিতেন, “যেমন খোসা ছাড়াইয়া মাক পাওয়া যায়, পরে মাক হইতে খোসা পর্য্যন্ত আসিয়া স্পষ্ট দেখা যায় যে, যদিও স্থূলদৃষ্টিতে খোসা এবং মাক স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া জ্ঞান হয়, কিন্তু মহাকারণে বিচার করিয়া দেখিলে উহাঙ্কের এক সত্তায় উৎপত্তি বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে।”

রামকৃষ্ণ এইরূপে মন লইয়া সাধন করিতে লাগিলেন । ক্রমে ক্রমে তাঁহার অভিমান দূরীকৃত হইল । তিনি মনে তাহা বুঝিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রাণ পরীক্ষা দিতে চাহিল । তখন তাঁহার এই ভাবোদয় হইল যে, অভিমান যত্বপি গিয়া থাকে, তাহা হইলে উহা অবশ্য কার্যো প্রকাশ পাওয়া উচিত । তিনি নানা প্রকার চিন্তা করিয়া অভিমান দূরীকরণের স্বতন্ত্র ক্রিয়া বাহির করিলেন । তাঁহার জ্ঞান হইল যে, পৃথিবীতে ভাল, মন্দ, সৎ, অসৎ, জায়, অন্যায়, চন্দন, বিষ্ঠা, বিষ, অমৃত ইত্যাদি নানা প্রকার অহঙ্কারের কথা আছে । এই সকল অহঙ্কার হইতে মন যদ্যপি বিগ্নিষ্ট হয়, তাহা হইলে সে মন দ্বারা সচ্চিদানন্দ লাভ হইতে পারিবে । রামকৃষ্ণের এমনই একাগ্রতা ছিল যে, যখন যে ভাব আসিত, কাল বিলম্ব না করিয়া তাহা কার্যো পরিণত করিয়া লইতেন । কিরূপে এই নূতন ভাব হইতে উত্তীর্ণ হইবেন, তিনি এই কথা তাঁহার সচ্চিদানন্দময়ী জননীর নিকট জ্ঞানাইলেন । তিনি কালীর মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া দুই হস্তে সচন্দন পুষ্প গ্রহণ পূর্বক বলিলেন, “মা ! এই নে তোর ভাল, এই নে তোর মন্দ, আমায় শুদ্ধ ভক্তি দে মা,” এই কথা বলিয়া দুই হস্তের দুইটি পুষ্প কালীর চরণে অর্পণ করিলেন ; আবার ঐরূপে পুষ্প লইয়া বলিলেন, “মা ! এই নে তোর সৎ, এই নে তোর অসৎ, এই নে তোর শুচি, এই নে তোর অশুচি, আমায় ভক্তি দে ;

“এই নে তোৰ বিষ, এই নে তোৰ অমৃত, আমায় ভক্তি দে ।” রামকৃষ্ণ কালীর পূজা করিয়া মনের বল পরীক্ষা করিয়াছিলেন । তিনি এক হস্তে বিষ্ঠা ও এক হস্তে চন্দন লইয়া মনকে বলিলেন, “মন ! ইহাকে বলে চন্দন, দেবতার ও লোকের অপের শোভা সম্পাদন করে । ইহার কি সুমধুর সৌরভ ! আঘাণ করিলে শরীর স্নিগ্ধ হইয়া যায় । আর ইহাকে বলে বিষ্ঠা, পৃথিবীর সকল পদার্থ হইতে হয় ।” তিনি চন্দন বিষ্ঠা লইয়া সমভাবে বসিয়া রহিলেন, মনের সমতা কোন মতে বিনষ্ট হইল না ।

রামকৃষ্ণ যখন এই প্রকার সাধন করিলেন, তখন মন্দিরের লোকেরা তাঁহার উন্নততা সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় করিল । যাহাদের মনে উপদেবতার ভাব ছিল, তাহাদের তাহা এক্ষণে বন্ধমূল হইয়া গেল । অধোরী ব্যতীত বিষ্ঠা লইয়া কাহার সাধন নাই, কিন্তু অধোরীর সম্প্রদায়ভুক্ত তিনি ছিলেন না । সুতরাং কেহই তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারে নাই ।

যদিও পুরাকালে জনক প্রভৃতি মহর্ষিগণ সূৰ্য ও চন্দ্র সম্বন্ধে সম্ভাব দেখাইয়া গিয়াছেন, কিন্তু সে কথা রামকৃষ্ণ কেহই প্রয়োগ করে নাই । মন্দিরের অন্যান্য কর্মচারীর কথা কি, তাঁহার আশ্রয় হলাধারী বলশাস্ত্রবিহারদ হইয়াও উপদেবতার কথা বলিতেন । সময়ে সময়ে রামকৃষ্ণকে অন্তরালে লইয়া গিয়া কত উপদেশ দিতেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইত না । মন্দিরের কোন ব্যক্তি বিষ্ঠা চন্দনের কথা শ্রবণ করিয়া রামকৃষ্ণকে বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিল, “ভট্টাচার্য্য মহাশয় ! তুমি নাকি বিষ্ঠা চন্দন এক করিয়াছ, ভাল ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াছ ! কিন্তু গুনিলাম তোমার নিজের মল লইয়াছিলে, তা এ প্রকার ব্রহ্মজ্ঞানী ত সকলকেই বলা যায় । আপনার মল কে না স্পর্শ করে ? যদিও অন্যের বিষ্ঠা স্পর্শ করিতে পার, তাহা হইলে ও কথা গণ্য হইতে পারে ।” রামকৃষ্ণ অতি শাস্তভাবে এইসকল কথা শ্রবণ করিলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, এ ব্যক্তি নিতান্ত অনায়াস কথা বলে নাই । বাস্তবিক আপনার বিষ্ঠা স্পর্শ করায় সাধনা কি হইল ? বরং অভিমানেরই কার্গ হইয়াছে ; এই কথা তিনি মাতাকে জানাইলেন । মহাশক্তির শক্তি অমনি তরুণ সাধকপ্রবর রামকৃষ্ণের শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল । রামকৃষ্ণের মনে এমন প্রচণ্ডভাব আসিল যে, তিনি ভৎসনাৎ গঙ্গাতীরে যে স্থানে সকলে মল মূত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া থাকে, সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া তথা হইতে সদ্যতাজল মল মুক্তিকাবৎ ব্যবহার করিলেন । এমন কি জিহ্বা দ্বারা উহা স্পর্শ করিতেও তাঁহার ঘণার উদ্রেক হয় নাই । তাঁহার

মুখে শুনিয়াছি, যখন তিনি বিষ্ঠার জিহ্বা সংলগ্ন করিয়াছিলেন, তখন কোন প্রকারি দুর্গন্ধ অনুভব করেন নাই ।

রামকৃষ্ণদেবের এই সাধনের দ্বারা অতি গূঢ় তাৎপর্য্য বহির্গত হইতেছে । বিষ্ঠা চন্দন এক করা কেবল বিচারের কথা নহে । যাঁহারা বিচার করিয়া বস্তুর গুণাগুণ স্থির করিয়া থাকেন, তাঁহাদের অবস্থা এবং যাঁহারা বিচারের পর প্রকৃত কার্য্য করেন, তাঁহাদের স্বতন্ত্র অবস্থা হইয়া থাকে । “এক ব্যক্তি একটা বেল কাঁটা লইয়া চক্ষু মুদ্রিত পূর্ব্বক মনে মনে বিচার করিয়া দেখিল যে, ইহা উদ্ভিদপদার্থসমূহ । ইহাতে অগ্নি সংস্পর্শ করিয়া দিলে এখনি ভস্মীভূত হইয়া যাইবে । ফলে, সে ব্যক্তি প্রকৃত পক্ষে কাঁটাটা ভস্মীভূত করিল না । সে যেমন কাঁটাটার উপর হস্তনিষ্ক্রেপ করিল, অমনি উহা বিদ্ধ হইয়া অশেষপ্রকার ক্রেশের কারণ হইয়া উঠিল ।” অথবা “সিদ্ধি সিদ্ধি বলিলে কাহারও নেশা হইতে পারে না । সিদ্ধি আনিয়া বাটিতে হয়, তাহা কেবল স্পর্শ করিলে কিম্বা মুখের ভিতর রাখিয়া দিলেও সিদ্ধির ফল লাভ করা যায় না ; তাহা উদর মধ্যে যাওয়া চাই । তথায় কিয়ৎকাল থাকিয়া শরীরে শোষিত হইলে তবে সিদ্ধির আনন্দ উপলব্ধি করা যায় ।” অতএব কার্য্য বাতীত কোন বিষয়ের ফললাভ হইতে পারে না । রামকৃষ্ণদেব বিষ্ঠার গন্ধ পর্য্যন্ত কি জ্ঞনা প্রাপ্ত হন নাই, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, যে ব্যক্তির মন ঈশ্বরে পূর্ণরূপে অর্পিত হয়, বাহ্যিক কার্য্যে কিম্বা পদার্থবিশেষে কখনই সে ব্যক্তির মন সংলগ্ন হইতে পারে না ; এই জ্ঞনা সে সকল পদার্থের ভাবও উপলব্ধি হইতে পারে না ।

সংক্ষিপ্ত পরিচ্ছেদ ।

—:—

পূর্ব্বকথিত নানাপ্রকার সাধন দ্বারা সংযত-মন হইলে, রামকৃষ্ণদেবের কণ্ঠের ভাব আসিল । তিনি গোকল ব্রত হইতে বেদ, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি পূর্ব্বপ্রচলিত কৰ্ম্মকাণ্ডের প্রক্রিয়া একে একে সাধন করিয়াছিলেন । এই সকল সাধনের ভাব আপনি তাঁহার মনে উদয় হইত, কাহাকে জিজ্ঞাসা কিম্বা কোন শাস্ত্র পাঠ করিয়া তিনি অবগত হইতেন না । তাঁহার সাধনের ধারা-বাহিক ইতিহাস কোনমতে প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই । কারণ তিনি কখন কি করিতেন, তাহা তিনিই বিস্মৃত হইয়া যাইতেন । উপদেশ কালে যাহা তাঁহার মনে আসিত এবং প্রকাশ করা প্রয়োজন বোধ করিতেন, তাহাই

তিনি বলিতেন। তাঁহার কথার ভাবে আমরা বাহা বুঝিয়াছি, সেইরূপে-
লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি।

সাধারণ ব্রত নিয়মাদি সমাধা করিয়া তিনি যোগের উচ্চতম সাধনে প্রৱৃত্ত হইয়াছিলেন। ইতিপূর্বে যে বটবৃক্ষের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার নিম্ন-দেশে পঞ্চবটী নামক যোগের স্থান প্রস্তুত করিয়াছিলেন। পঞ্চবটী বর্গ-পরিমিত চারি হাত স্থান হইয়া থাকে। ইহার এক কোণে নিম্ব, দ্বিতীয় কোণে বিব, তৃতীয় কোণে অশ্বখ বা বট, চতুর্থ কোণে সেকালিকা এবং মধ্যস্থলে আমলকী রক্ষ আরোপণ করিতে হয়। এই স্থানটির চতুর্দিকে জবা-ফুলের বেড়া এবং তাহাতে অপরাঙ্কিতা কিম্বা মাধবীলতা বেষ্টিত থাকে। পরমহংসদেব এইরূপে পঞ্চবটী প্রস্তুত করিয়া, বৃন্দাবনের পুলা আনাইয়া তন্মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া-ছিলেন। রজনীবোগে যখন চারিদিকে মনুষ্য কোলাহল নিস্তব্ধ হইত, যখন নিশাচরগণ স্ব স্ব বিবর ও বাসস্থান হইতে বহির্গত হইয়া আহারের অবেশে ভ্রমণ করিত, যখন যামিনী ঝিল্লিরবে মনের সাধে পরমপুরুষের গুণানুকীর্ণন করিত, সেই সময়ে পরমহংসদেব নিঃশব্দে ঐ পঞ্চবটী মধ্যে প্রবেশ করিতেন এবং তথায় উপবেশন করিয়া ধ্যানে নিমগ্ন হইতেন। কতক্ষণ সেই অবস্থায় থাকিতেন এবং কি করিতেন, তাহা কেহ অগাধিও জানিতে পারেন নাই। পঞ্চবটীতে সাধনকালে তিনি তোতাপুরীর নিকটে সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করেন। তিনি সন্ন্যাসী হইয়া কুন্তকাদি যোগ দ্বারা নির্বিকল্প-সমাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কথিত আছে যে, এই নির্বিকল্প-সমাধি যোগের চরমাবস্থার কথা। কতকাল হটবোগ করিয়া আসনাদি আয়ত্ত হইলে তাহার পর প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণাদি করিতে পারিলে, তবে সমাধি হইয়া থাকে; কিন্তু পরমহংসদেব তিন দিনে তদবস্থা লাভ করিয়াছিলেন। তোতাপুরী এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া পরমহংস-দেবের নিকটে একাদশ মাস অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তোতাপুরীর এই সাধন করিতে বিষ্ময়িত বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল।

কুন্তকযোগের সময় তাঁহার মুখগহ্বরস্থ উর্দ্ধ-মাটীর সম্মুখ দিকের মধ্যস্থান হইতে ক্রমাগত শোণিত নির্গত হইত। সেই শোণিতেই বর্ণ সিম পাতার বর্ণের স্তায় দেখাইত। ঔষধাদি দ্বারা ঐ শোণিত রুদ্ধ করা যাইতে পারিত না। কিয়ৎকাল শোণিত স্রাবের পর আপনি স্থগিত হইয়া যাইত। এই শোণিত-নির্গমনে পরমহংসদেব এক এক দিন আতশয় কাতর হইতেন এবং মুখ-গহ্বরে বস্ত্র প্রবিষ্ট করিয়া সঞ্চাপন ক্রিয়া দ্বারা শোণিতধারা রুদ্ধ করিবার

বিফল প্রয়াস পাইতেন। কিছুক্ষণ শোণিত স্রাবের পর উহা আপনি স্থগিত হইয়া গিয়াছিল। এই সময়ে তাঁহার শরীর অতিশয় শূল হইয়াছিল এবং রূপ-
 শাবণে দিক্ আলোকিত করিত। তিনি বস্ত্র পরিধান করিতে পারিতেন না,
 তজ্জন্ত একখানি মোটা উত্তরীয় বসন দ্বারা সমস্ত শরীর আবৃত করিতেন।
 এই সময়ে তাঁহাকে সাধুরা পরমহংস বলিয়া সম্বোধন করিতে আরম্ভ করিয়া-
 ছিলেন। পরমহংসদেব যদিও কুস্তকাদি বোণ করিতেছিলেন, তথাপি তাঁহার
 কালীমন্দিরে প্রবেশ করা বন্ধ হয় নাই। তাঁহার ভাবান্তর কাল হইতে
 হৃদয়ানন্দ মুখোপাধ্যায় নামক পরমহংসদেবের জনৈক আত্মীয় কালীর পূজা
 করিতেছিলেন। তিনি পরমহংসদেবের সেবাসুশ্রুতাদিও করিতেন। যখন
 তিনি অজ্ঞানাবস্থায় থাকিতেন, তখন হৃদয় আসিয়া তাঁহাকে আহার করাই-
 তেন এবং গাত্রের কৰ্দমাদি পরিষ্কার করিয়া দিতেন। পরমহংসদেবের পূজা
 করা সেই জন্ত নিয়মের অন্তর্গত ছিল না। যখনই ইচ্ছা হইত, কালাকাল,
 শুচি অশুচি কিম্বা অল্প কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া পূজা করিতে যাই-
 তেন। কোন দিন হয় ত কালীকে কেবল চামর বাজন করিতে করিতে
 সমাধিস্থ হইতেন। তখন হাতের চামর হাতেই থাকিত। কখন বা দেবীর
 চরণ ধরিয়। মনে মনে কত কি কথা বলিতেন এবং কখন বা শিবের সহিত কত
 কি রহস্য করিতেন। কোন কোন দিন প্রাতঃকাল হইতে নানাবিধ পুষ্প চয়ন
 করিয়া দেবীকে পূজা করিতেন এবং কখন বা সুললিত গীত ও অদ্ভুত নৃত্য
 করিয়া আপনভাবে আপনি মাতিয়া উঠিতেন! পরমহংসদেব যে গোপনে
 গোপনে সাধন ভজন করিতেছিলেন, তাহা মন্দিরের কেহই জানিত না।
 সন্ন্যাসী সাধুরা সর্বদাই তথায় আসিতেন এবং তাঁহাদের আবশ্যকীয় ভোজ্য-
 সামগ্রী দিবার জন্ত রাসমণির ব্যবস্থাও ছিল, সুতরাং নূতন নূতন সাধু ফকির
 আসাতে কেহ কিছুই বুঝিতে পারিতেন না। পূর্বেকথিত হলধারী পরমহংস-
 দেবের এক আত্মীয় ঐ মন্দিরে বাস করিতেন। বেদান্তশাস্ত্রে তিনি বিশেষ
 অধিকারী ছিলেন। হলধারী সাকার পূজাদি নিতান্ত ঘৃণা করিতেন। নৃত্য
 গীত বা সঙ্কীর্ণনাদি মন্তকের বিকার এবং মায়ার কার্য বলিয়া উপহাস
 করিতেন। তিনি পরমহংসদেবকে মধ্যে মধ্যে উপদেশ দিতেন এবং বেদান্ত
 শাস্ত্র শ্রবণ করিবার জন্ত বিশেষ যত্ন করিতেন। পরমহংসদেব এইরূপ বার
 বার হলধারীর নিকট আপন দুরবস্থা শ্রবণ করিয়া এক দিন গৃহে প্রবেশ
 করিলেন এবং মা মা বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণদেব যেমন

• মা মা করিয়া ডাকিয়াছেন, অমনি আত্মশক্তি কালীরূপে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । তিনি মাতাকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, “মা ! হৃদয়বীর বলে যে, আমার মাথা খারাপ হইয়াছে, যাহা কিছু দর্শন করি, তাহা আমার চক্ষের দোষ, মায়া মাত্র । মা ! সত্যি করে আশ্বাস বলে দে, আমার কি হলো ।” অভয়া অমনি অভয় দিয়া বলিলেন, “তুমি যেমন আছ, অমনি থাক ।” এই বলিয়া মাতা অদৃশ হইয়া পড়িলেন । রামকৃষ্ণ তদবধি আর কাহারও কথায় কর্ণপাত করিতেন না, কাহারও প্রতি দৃকপাতও করিতেন না ।

কালীর প্রতি পরমহংসদেবের এ প্রকার আত্ম-নিবেদনের ভাব ছিল যে, যখন যে কোন কার্য্য করিতেন, মাতাকে না জানাইয়া কখনই তাহাতে নিযুক্ত হইতেন না । তিনি কিন্তু কখন কোন দ্রব্য প্রার্থনা করেন নাই, তাহার প্রয়োজনও বুঝিতেন না এবং অপ্রয়োজনও অনুমান করিতে পারিতেন না ।

একদিন তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার পঞ্চবটীর বেড়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে । তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, এ কথা কাহাকে বলি এবং কে বা আমার কথা রক্ষা করিবে । ভর্তাভারি বলিয়া এক জন ঐ উদ্যানের মালি ছিল, এই ব্যক্তি পরমহংসদেবকে চিনিয়াছিল । সে একদিন পরমহংসদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, “পৃথিবীতে উচ্ছিষ্ট হয় নাই কি ?” পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন যে, “ব্রহ্ম-বিজ্ঞান এ পর্য্যন্ত উচ্ছিষ্ট হয় নাই এবং কখন হইবারও” নহে ।” ভর্তাভারি তদবধি তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিল । এই উচ্ছিষ্টের কথা আমরা পরেও তাঁহার নিকট শুনিয়াছি । তিনি বলিতেন যে, বেদ, পুরাণ, শাস্ত্রাদি ঋষি মুনির মুখবিগলিত হইয়াছে, স্মৃতিরাং উচ্ছিষ্ট ; কিন্তু ব্রহ্ম-বিজ্ঞান বাক্যাতীত অবস্থার কথা । তাহা হাবার স্বপ্নবৎ বোধ হয় ; লোককে কোনমতে প্রকাশ করিয়া বলা যায় না । যাহার হয়, সেই বুঝিতে পারে ।

পরমহংসদেব ভর্তাভারিকে আপন মনের কথা দুই একটা বলিতেন । পঞ্চবটীর বেড়ার কথা তাহাকেই বলিয়াছিলেন, কিন্তু সে সামান্য ভৃত্য কোথায় কি পাইবে, তজ্জন্ত কিছুই করিতে পারে নাই । পঞ্চবটীর বট-বৃক্ষমূলে রামকৃষ্ণদেব কি হইবে বলিয়া চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে গঙ্গাতে বান আসিল । বানের সঙ্গে এক বোঝা বাকারি এবং আর এক বোঝা এক মাপের কতকগুলি বাঁশের খুঁটী ভাসিয়া পরমহংসদেবের সম্মুখে ভুবিয়া

গেল । রামকৃষ্ণদেব তাহা দেখিতে পাইয়া ভর্তাভারিকে তৎক্ষণাৎ বলিলেন । ভর্তাভারি আনন্দে বিহ্বল হইয়া একেবারে লক্ষ্যপ্রদানপূর্ব্বক জলে পড়িল এবং ডুব দিয়া বাঁকারি এবং খুঁটীগুলিকে উপরে উত্তোলন করিল । ভর্তাভারি আপনি উহা দ্বারা পঞ্চবটীর বেড়া বন্ধন করিয়া দিল । আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বেড়া সংস্কারের জন্ত যে যে দ্রব্যগুলির প্রয়োজন ছিল, তৎসমুদয় তন্মধ্যে পাওয়া গিয়াছিল ।

পরমহংসদেব এই ঘটনাতে বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন । তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, “লোকে আমায় পাগল বলে । কিন্তু আমি মাকে দেখিতে পাই, কথা বলি, তিনিও কত কি বলেন । এসকল কি মিথ্যা, ভ্রম দর্শন করি ? ভাল, অল্প পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক্ ।” এই প্রকার স্থির করিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, কিরূপ পরীক্ষা করা যাইবে । কিন্তু তখন কিছুই মনে আসিল না ।

একদিন তিনি গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছেন, এমন সময়ে রামধন বলিয়া রাসমণির একজন অতি প্রিয় কণ্ঠস্বরী সেই স্থান দিয়া গমন করিতেছিল । রামধন পরমহংসদেবের প্রতি নিতান্ত বিরূপ ছিল, এমন কি কখন কথা কহিত না । পরমহংসদেব রামধনকে দেখিয়া মনে মনে মাকে বলিলেন, “মা ! তুমি যদি সত্য হও, তাহ’লে রামধনকে আমার নিকটে বন্ধুর গায় এখন এনে দাও । তবে জানুে যে, তুমি আমার কথা শুন, আর সকলই সত্য বলে ধারণা হবে ।” এই কথা মনে হইবামাত্র রামধন সহসা রামকৃষ্ণের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার নিকটে নাবিয়া আসিল এবং মুহূর্ত্তেরে বলিল, “ভট্টাচার্য্য মহাশয় ! কালীর সাক্ষাৎ পাইয়া থাক ভাল, তা অত বাড়াবাড়ি করবার আবশ্যক কি ?” এই কথা বলিয়া রামধন চলিয়া গেল ।

রামকৃষ্ণের যদিও এক্ষণে উন্নততার অনেক সাম্য হইয়াছিল, কিন্তু সময়ে সময়ে অধীর হইয়া পড়িতেন । যখন কম্প হইত, তখন পাঁচজনে ধরিয়া রাখিতে পারিত না । এই নিমিত্ত চিকিৎসাদি বন্ধ করা হয় নাই । বৈদ্যেরা বায়ুরোগ সাব্যস্ত করিয়া নানাবিধ তৈল মর্দন করাইতেন । স্নিগ্ধকারক ও বায়ুনাশক ঔষধি সেবন করান হইত এবং কেহ কেহ স্ত্রী সহবাস করিতে পরামর্শ দিত ।

স্ত্রী-সহবাস সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ আপত্তি ছিল । বিবাহের পর কার্য্যানুরোধে তিনি স্ত্রীর মুখাবলোকন করিতে পান নাই । তদনন্তর তাঁহার অবস্থা পরিবর্তন হইয়া গেল । সেই সময়ে তিনি প্রকৃতিকে সকলের উপেক্ষার কারণ জ্ঞানে

মাতৃ সন্মোদন করিয়া ফেলিয়াছিলেন । তাঁহার তদবধি ঋবজ্ঞান হইয়াছিল যে, জ্রীমাত্রৈই শক্তির অংশ, অতএব শক্তিতে গমন করিলে মাতৃহরণ অপরাধ সংঘটিত হইয়া যাইবে । মন্দিরের লোকেরা এ কথা জানিত এবং তাহারাই সেইজন্ত তাঁহাকে পূর্ণ পাগল বলিয়া গণনা করিত ।

জ্রী-সহবাস না করাই যখন তাঁহার উন্নততার কারণ বলিয়া স্থির হইল, তখন হৃদয় মুখোপাধ্যায় গোপনে এ সম্বন্ধে অনেক উপদেশ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন । কিন্তু সে কথায় তাঁহার মন চঞ্চল করিতে পারে নাই । কথায় যখন কোন কার্য্য হইল না, তখন হৃদয় মুখোপাধ্যায় ঠাকুরবাটীর এক প্রৌঢ় পরিচারিকাকে দশ টাকা পুরস্কার স্বীকার করিয়া পরমহংসদেবের পশ্চাৎ নিযুক্ত করিয়া দিল । এই পরিচারিকা কোথা হইতে একটা যুবতী-কামিনী সকলের অজ্ঞাতসারে পরমহংসদেবের শয়ন-গৃহে আনিয়া উপস্থিত করিয়া দিল । পরমহংসদেব সেই জ্রীলোককে দেখিয়া অমনি তথা হইতে স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন এবং হৃদয়কে যথোচিত তিরস্কার করিলেন ।

এইরূপে কিয়দ্দিবস অতীত হইয়া গেল । একদা কলিকাতার প্রসিদ্ধ কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের নিকট পরমহংসদেব হৃদয়ের সমভিব্যাহারে আগমন করেন । তথায় জনৈক পূর্বাঞ্চলের পণ্ডিত কবিরাজ উপস্থিত ছিলেন । গঙ্গাপ্রসাদ বায়ুরোগ নির্ণয় করিয়া পূর্ব হইতেই তৈলাদি ব্যবস্থা করিয়া-ছিলেন । সেই পণ্ডিত পরমহংসদেবকে দেখিয়াই হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, “এই ব্যক্তির কি কোন প্রকার যোগ করার অভ্যাস আছে ? লক্ষণে যেন যোগীর আয় বোধ হইতেছে ।” হৃদয় তাহা স্বীকার করিল । পরমহংসদেবের অবস্থা সম্বন্ধে এই পণ্ডিত সর্ব প্রথমে উল্লেখ করেন । কিন্তু তাঁহার কথায় কোন ফল হইল না । হৃদয়ও সে কথা বুঝিল না এবং কবিরাজ মহাশয়ের তাহা ধারণা হইল না । তিনি তৈল ব্যবহার করাইতে লাগিলেন ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

—০—

মন্দিরের লোকেরা যখন রামকৃষ্ণদেবকে উন্নত বলিয়া স্থির করিল, যখন নিকটস্থ গ্রামের পণ্ডিতপ্রবরেরা তাহাই অনুমোদন করিয়া দিলেন, তখন রাসমণি কর্তব্যজ্ঞানে নানাপ্রকার চিকিৎসাদি করাইতে লাগিলেন । রামকৃষ্ণদেব তখনও আপনার ভাব পরিবর্তন করেন নাই । তাঁহার কার্য্যকলাপ দেখিলে মনে হইত যে, তিনি কাহাকেও গ্রাহ করিতেন না, কাহারও কথায় এক পরমাণু মূল্য জ্ঞান করিতেন না এবং যমুস্বাকে যমুস্বা বলিয়া বিচার করিতেন না । তাঁহার যখনই যে ভাব মনে আসিত, তিনি তাহা তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন না করিয়া কোনমতে স্থির হইতে পারিতেন না । বাস্তবিক যে তিনি সকলকে ব্লগা করিতেন, তাহা নহে । তিনি দাস্তিকতা সহকারে দেবোদ্দেশে যে সকল কার্য্য করিতেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে অসংভাব হইতে হইত না । তাহা অনুরাগের বশবর্তী হইয়া করিতেন । তাঁহার উপদেশে শুনিয়াছি যে, জীবনের নিশ্চয়তা "অতি সন্দেহজনক, যে কোন উপায়ে হউক, যাহাতে ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়, তাহাই সকলের করা কর্তব্য । কারণ, সময় থাকিতে তাহার উপায় না করিয়া লইলে পরিণামে অনুশোচনা করিতে হয় ।

পরমহংসদেব মনে মনে কোন সংকল্প করিতেন না । পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, তিনি সচ্চিদানন্দময়ী মাতার শ্রীচরণে তাঁহার আত্মসমর্পণ করিয়া মাতৃ-স্তনপায়ী শিশুর ন্যায় স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । তাঁহার মনে যখন যে ভাব উদ্দীপিত হইত, সেই ভাবেই তাঁহাকে যত্নবৎ কার্য্য করাইয়া লইত । এই নিমিত্ত তাঁহার ভাবোন্মত্ততাবস্থায় তাঁহাকে আর একপ্রকার দেখাইত ।

একদিন প্রাতঃকালে একটা যুবতী আল্লায়িতকেশা গৈরিকবস্ত্রপরিধানা সন্ন্যাসিনীকে জাহ্নবীর তীরে উপবিষ্ট দেখিয়া পরমহংসদেব তাঁহাকে ডাকিয়া আনিবার জন্ত হৃদয়কে আদেশ করেন । হৃদয় এই কথা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইল । কারণ ইতিপূর্বে যাহার স্ত্রীজাতির সহিত কোন সংস্রব ছিল না, যাহার নিকট স্ত্রীলোকের নাম করিলে মহা বিভ্রাট হইয়া উঠিত, তাঁহার এ প্রকার ভাবান্তর দেখিলে সহজেই দুর্বল চিত্তে সন্দেহ উপস্থিত হইয়া থাকে ।

হৃদয়ের মনে বাহাই হউক, সে তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণীকে পরমহংসদেবের সমীপে আনিয়া উপস্থিত করিল। ব্রাহ্মণীকে দেখিয়া পরমহংসদেব মা বলিয়া, ভাবে নিমগ্ন হইয়া যাইলেন। পরে নানাপ্রকার তৎ-কথা আলাপন দ্বারা উভয়েই আনন্দিত হইয়াছিলেন। এই সন্ন্যাসিনী “ব্রাহ্মণী” বলিয়া উল্লিখিত আছেন। তিনি অসাধারণ গুণসম্পন্ন ছিলেন। হিন্দু, বিশেষতঃ বঙ্গ মহিলার মধ্যে এ প্রকার দ্বিতীয় স্ত্রীলোক অত্যাধিক কেহ দেখিয়াছেন কি না, বলিতে পারি না। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার এমন ব্যুৎপত্তি ছিল যে, তৎকালীন পণ্ডিতাগ্রগণ্য বৈষ্ণবচরণ ও পূর্ণানন্দ প্রভৃতি মহাশয়েরা নির্বাক হইয়াছিলেন। হিন্দুদিগের যে সকল সাম্প্রদায়িক শাস্ত্র আছে, তৎসমুদায় তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল এবং যেন সাধন দ্বারা সকলই আয়ত্তাধীনে রাখিয়াছিলেন। সূত্রাং বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, গীতা, তন্ত্র এবং বৈষ্ণবগ্রন্থাদিতে তাঁহার সম্যকরূপে অধিকার ছিল। কেবল তাহা নহে, আধুনিক বোম্বাড়া, নবরসিক, পঞ্চনামী, বাউল প্রভৃতি ধর্মপ্রণালীও তিনি জানিতেন।

এই ব্রাহ্মণী পরমহংসদেবের অবস্থা ও ভাব শাস্ত্রসম্মত বলিয়া উল্লেখ করেন এবং ঈশ্বরের নামে যে জড়বৎ ভাবপ্রাপ্ত হইতেন, তাহা মৃগী বা হিষ্টিরিয়া জনিত নহে, উহাকে তিনি মহাভাব বলিয়া ব্যক্ত করিলেন।

ব্রাহ্মণীপ্রমুখাং মহাভাবের কথা শ্রবণ করিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া রহিল। ভাব কাহাকে বলে, তাহাই বৈষ্ণব ব্যতীত কেহ জানে না, সে স্থলে মহাভাবের অর্থ কে বুঝিবে? মহাপ্রভু শ্রীগৌরানন্দের এই মহাভাব হইত, তাহা বৈষ্ণব গ্রন্থে উল্লিখিত আছে, কিন্তু এক্ষণে বৈষ্ণবদিগের দূরবস্থা সংঘটিত হওয়ায় সে ভাবের ভাববোধ হওয়া দূরে থাকুক, অতি অল্প ব্যক্তিরই অর্থবোধ হইবার সম্ভাবনা। ব্রাহ্মণীর প্রমুখাং মহাভাবের কথা প্রকাশ পাইলে সকলে ভাব বলিয়া একটা কথা শিক্ষা করিল, কিন্তু ইহা দ্বারা পরমহংসদেবের প্রতি কাহার শ্রদ্ধাভক্তি হইল না। কিছুদিন পরে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে কোন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত দেবালয়ে উপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় আসিয়া কলিকাতার পণ্ডিতদিগের সহিত বিচার করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করায়, রাসমণির জামাতা মধুরানাথ বিশ্বাস তৎকালিক মহাপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতবর বৈষ্ণবচরণকে লইয়া যান। যে সময়ে তাঁহারা উপস্থিত হন, পরমহংসদেব এবং পণ্ডিতমহাশয় তখন দেবী-মন্দিরের সম্মুখভাগে উপবিষ্ট ছিলেন। পরমহংসদেব বৈষ্ণবচরণকে দেখিবামাত্র অমনি ভাবে বিহ্বল হইয়া দ্রুতপদে গমন-

পূর্বক তাঁহার স্বকোপরি আরোহণ করিলেন। বৈষ্ণবচরণ পরমহংসদেবের অপূর্ণ ভাবাবেশ দেখিয়া তাহা বুঝিতে পারিলেন এবং “চৈতন্ত” জ্ঞান করিয়া নিজ রচিত শ্লোকাদি দ্বারা বন্দনাদি করিতে লাগিলেন। এই শ্লোক সকল তাঁহার পূর্বের রচনা নহে, তাহা সেই সময়ের মনের উচ্ছ্বাসে নির্গত হইয়াছিল। বৈষ্ণবচরণের এই অসাধারণ শক্তি দেখিয়া দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতমহাশয় আপনি পরাজয় স্বীকার করিলেন এবং পরমহংসদেবের সন্নিধানে কিছুদিন বাস করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

বৈষ্ণবচরণ পরমহংসদেবকে পাইয়া আনন্দে উৎসাহিত হইয়া পড়িলেন। ব্রাহ্মণীও বৈষ্ণবচরণকে অতিশয় স্নেহিত করিতে লাগিলেন।

পরমহংসদেব সম্বন্ধে ব্রাহ্মণী যে মহাভাবের কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন, বৈষ্ণবচরণও তাহা সমর্থন করিতে লাগিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে শাস্ত্রাদি আনিয়া পরমহংসদেবের পূর্ব সাধনের অবশিষ্টাংশ মিলাইয়া লইয়া দেখিলেন যে, কিছুই অশাস্ত্রীয় হয় নাই। পরমহংসদেব লৌকিক শাস্ত্রানভিজ্ঞ হইয়া কিরূপে এই দুর্লভ সাধনের প্রক্রিয়ায় আপনার নিজ যত্নে সিদ্ধ হইয়াছিলেন, ইহা ভাবিয়া বৈষ্ণবচরণ আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। যদিও তিনি গুরু পাইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের দ্বারা বিশেষ কোন কার্য্যের সহায়তা প্রাপ্ত হন নাই।

যখন বৈষ্ণবচরণ ব্রাহ্মণীর কথা প্রমাণ করিয়া দিলেন, তখন পরমহংসদেব সম্বন্ধে মথুর বাবু ও অত্যাচ্য ব্যক্তির কিঞ্চিৎ বিশ্বাস জন্মিল। ব্রাহ্মণী পরমহংসদেবের নিকট ক্রমান্বয়ে দ্বাদশ বৎসর অবস্থিত করিয়াছিলেন। পরমহংসদেব সেই সময়ে তত্ত্বোক্ত সাধনে নিযুক্ত হন এবং ব্রাহ্মণীর নিকট বিশেষ সহায়তা লাভ করেন। ইতিপূর্বে যে বিষ্ণুরক্ষের কথা কথিত হইয়াছে, তাহার নিয়মদেই তিনি পঞ্চমুণ্ডী প্রভৃতি লইয়া তত্ত্বোক্ত যাবতীয় প্রক্রিয়া সমাধা করেন। * কথিত

তত্ত্ব সাধকদিগের মধ্যে দুইটী প্রধান শ্রেণী সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, দক্ষিণাচারী ও বামচাৰী। দক্ষিণাচারীরা সাধ্বিকভাবে ভগবতীর পূজাদি সমাপন করিয়া একান্ত মনে মন্ত্র জপ করিয়া সিদ্ধাবস্থা লাভ করিয়া থাকেন।

বামচাৰীদিগের কার্য্যকলাপ সম্পূর্ণ তামসভাবে পরিপূর্ণ। ইহাতে কুলস্ত্রীর পূজা করিতে হয়। কুলস্ত্রী অর্থে যে স্ত্রী কুলভ্রষ্টা বা পরপুরুষগামিনী, তাহাকেই বুঝাইয়া থাকে। নটস্ট্রী কাপালী, বেত্মা, রজস্ট্রী, নাপিত্তর ভাৰ্গ্যা, ব্রাহ্মণী, শূদ্রানী, গোপকন্যা, মালাকার কন্যা প্রভৃতি নয় প্রকার স্ত্রীকে কুলকাবিনী কহে। পঞ্চভঙ্গ বা পঞ্চ বকার, যথা বদা, বাৎস, বৎস, মুজা,

আছে যে, একদা পরমহংসদেব নরশির লইয়া সাধন করিতে তাঁহার মনে কিঞ্চিৎ বিরক্তভাব উপস্থিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণী তাহা অবলোকন করিয়া বলিয়াছিলেন, “ওকি বাবা ! এই দেখ না আমি উহা কামড়াইতেছি,” এই বলিয়া তিনি আপনি দেখাইয়া দিয়াছিলেন। তত্ত্বের সাধন স্বভাবতঃ অতি ভয়ানক। পঞ্চমকার ব্যতীত সাধনের কার্য্য হইতে পারে না। যদিও অনেকে তাহার ভাবার্থ প্রকাশ করিয়া শকার্ধ্য বিপর্য্যয় করেন, কিন্তু তাহা গ্রন্থের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে।

তত্ত্ব-সাধনের সময় বহুল তান্ত্রিকের সমাগম হইত। পরমহংসদেব তাঁহাদের জন্ত কারণ অর্থাৎ মন্ত্ৰ, চাউল এবং ছোলাভাজা সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। কালীঘাটের অচলানন্দ স্বামীও সর্বদা গমনাগমন করিতেন। পরমহংসদেব নিজে কখন কারণ জিহ্বায় স্পর্শ করেন নাই। তিনি অঙ্গুলির অগ্রভাগে লইয়া কালী কালী বলিয়া কপালে ফোঁটা করিতেন। তত্ত্ব মধ্যে উর্দ্ধমুখতত্ত্ব নামক যে গ্রন্থ আছে, তাহার সাধন অতীব ভয়ঙ্কর এবং সাধারণের নিকট তাহা পরিচয় দেওয়া যায় না। তাহার প্রক্রিয়াগুলি অশ্রীলতায় পরিপূর্ণ, কিন্তু সাধকের তাহাতে কোন সংশ্রব নাই। এই সাধন দ্বারা মনের শক্তি বিলক্ষণরূপে পরীক্ষিত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণীর দ্বারা পরমহংসদেব এই সাধন সম্পন্ন করিতেও বিশেষ সুবিধা পাইয়াছিলেন।

তত্ত্বোক্ত সাধনের পর তিনি কর্ত্তাভজা, নবরসিক ও বাউল প্রভৃতি নানা প্রকার সাধন করেন। ব্রাহ্মণী এই সকল ধর্ম্মপ্রণালী অতি সুন্দররূপে জানিতেন। কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের চন্দ্রনাথ নামক পূর্বদেলীয় এক ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণী আনাইয়াছিলেন। আমরা শুনিয়াছি, পরমহংসদেবের যখন মহাভাব হইত, তখন তিনি বাহুজ্ঞান পরিশূন্যাবস্থা প্রাপ্ত হইতেন। চন্দ্র অমনি তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া বলিতেন, “ও রামকৃষ্ণ ! ওকি !” কিন্তু সে কথায় পরমহংসদেবের অবস্থা পরিবর্তন করিতে পারিতেন না। কর্ত্তাভজাদিগের মতে সহজ-

মৈথুন এবং প-পুষ্প অর্থাৎ রজঃস্বলা স্ত্রীলোকের রক্তঃও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বামাচারীদিগের লতাসাধন প্রভৃতি যে সকল কার্য্য নির্দিষ্ট আছে, তাহা অশ্রীলতায় পরিপূর্ণ। এই কার্য্য দ্বারা ধর্ম্মভাবের যে কি উত্তেজনা হয়, তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন। এই মতের শব-সাধনটি অতি গুরুতর কার্য্য, তাহার সন্দেহ নাই। কৃষ্ণপক্ষের মঙ্গলবারে অথবা অষ্টমী কিংবা চতুর্দশী তিথিতে, শ্রাদ্ধানন্দ, নদীতীরে, বিষমূলে কিংবা অরণ্যে, অশ্রাব্যবিকল্পে মৃত ব্যক্তির দেহ আনিয়া তাহার পূজা করিতে হইবে। পূজাস্তে বৎসাদি উপচার লইয়া উহার বক্ষোগণ্ডে উপবেশন পূর্বক মন্ত্রজপ করিতে হয়।

জানই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া ধারণা আছে। তাঁহারা বলেন যে, বহিজ্ঞানের সহিত, অন্তর্জ্ঞান থাকিবে। ইহা অতি নিম্ন শ্রেণীর কথা। বৈদাস্তিক নির্বিকল্প-সমাধির ভাব তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই। যে ভাব যোগীরা যোগ সাধন করিয়া লাভ করেন, যাহা মহাপ্রভুর প্রতি মুহূর্তেই হইত, সেই নির্বিকল্প-সমাধি পরমহংসদেব কুন্তকযোগ করিয়া প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যোগের দ্বারা যে সমাধির অবস্থা উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা অতিরিক্ত কষ্টসাধ্য; কিন্তু পরমহংসদেব সেইভাব লাভ করিবার অতি সহজ প্রণালী দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি মহাপ্রভুর ণায় কথায় কথায় বহির্চৈতন্য হারাওয়া ফেলিতেন। এমন কি, একদা এই অবস্থায় তাঁহার গাত্রের উপরে গুলের অগ্নি পতিত হইয়া তৎকালকার মাংসপেশী ভেদ করিয়া গিয়াছিল, তথাপি তাঁহার সংজ্ঞা হয় নাই। পরমহংসদেবের উদরের বাম-ভাগে যে একটা ক্ষত চিহ্ন ছিল, তাহা এইরূপে উৎপন্ন হয়। চন্দ্র অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই কিছু করিতে না পারিয়া পরিশেষে স্বস্থানে প্রস্থান করেন।

কর্তাভজার সাধনের সময়ে তিনি বালী নিবাসী তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্যের নিকট মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করিতেন। এই নিমিত্ত অনেকে অত্ৰাপি তাঁহাকে কর্তাভজা বলিয়া জানেন।

পরমহংসদেবের ভাবের ণায় ব্রাহ্মণীও ভাব হইত। ব্রাহ্মণী পরমহংসদেবের সহিত বাৎসল্য-ভাবের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি সময়ে সময়ে নানাবিধ বেশভূষায় ভূষিত হইয়া, তন্নিকটস্থ পল্লীর মহিলাদের সমভিব্যাহারে বাম হস্তে রোপ্যপাত্রে ক্ষীর নবনী প্রভৃতি ভোজ্য সামগ্রী লইয়া, যেরূপে যশোদা গোপালের অদর্শনে দক্ষ হৃদয়ে কাতর প্রাণে বৎসহারা গাভীর ণায় দ্বারকায় গমন করিয়াছিলেন, সেইরূপে পরমহংসদেবের আবাস গৃহাভিমুখে ধাবিত হইতেন এবং তাঁহার বিরচিত গোপাল-বিষয়ক গীত গান করিতে করিতে যেমন গৃহদ্বারে উপস্থিত হইতেন, অমনি মুচ্ছিত হইয়া ষাইতেন। পরে অনবরত গোপাল নাম তাঁহার কর্ণ-বিবরে শ্রবণ করাইলে চৈতন্য সম্পাদন হইত। এই ব্রাহ্মণী সম্বন্ধে নানাপ্রকার ঘটনা শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু সাধারণের নিকট তৎসমুদয় প্রকাশ করিতে এ ক্ষেত্রে কুণ্ঠিত হইলাম।

পরমহংসদেব অত্ৰাণ্ড প্রকার সাধন করিতেন বটে, কিন্তু কালীর মন্দিরে গমন করিতে কখন বিস্মৃত হইতেন না। ব্রাহ্মণীও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতেন। একদা কোন বিশেষ কারণে কালীর পূজায় ছাগ বলিদান হইয়াছিল। তাহার রুধিরের সরা যখনই দেবীর সম্মুখে প্রদত্ত হইল, ব্রাহ্মণী

তাহা ভক্ষণ করিতে লাগিলেন । সেই সম্ভ্রান্ত শোণিতাক্ত রক্তা ও সূদ্রেশ এবং তৎসহ শোণিতও অগ্নানবদনে ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন । পরমহংসদেব তাহা দর্শন করিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়াছিলেন ।

নবম পরিচ্ছেদ ।

কথিত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণী এবং বৈষ্ণবচরণের কথায় মথুর বাবু পরমহংসদেবকে সিদ্ধপুরুষ বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন । বোধ হয়, তিনি তন্নিমিত্ত তাঁহার স্বচ্ছন্দতার জন্ত নানাপ্রকার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে পরমহংসদেবের সহিত অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন । রাসমণি দাসীও বুঝিতে পারিলেন যে, পরমহংসদেব প্রকৃত সিদ্ধপুরুষ হইয়াছেন । বাহা হউক, মথুর বাবু এবং রাসমণি প্রভৃতি মন্দিরের কর্তৃপক্ষীয়েরা পরমহংসদেব সম্বন্ধে অতি উচ্চভাব গ্রহণ করিলেন । তাঁহারা ক্রমে বুঝিলেন যে, পরমহংসদেবের সাধন ভজন অতি আশ্চর্য্য এবং অস্বাভাবিক প্রকারে সাধিত হইয়াছে । তাঁহারা জানিলেন যে, পরমহংসদেব সাধারণ পরমহংসদিগের ত্রায় স্বভাববিশিষ্ট নহেন, তাঁহার সাধারণ জৈবতাব বিলুপ্ত হইয়া শিবত্ব সঞ্চারিত হইয়াছে এবং তিনি যে কালীদেবীর বরপুত্রবিশেষ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । এমনও কখন কখন কেহ বলিতেন যে, হয়ত সেই রামপ্রসাদই পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । এই সময়ে পরমহংসদেবের বয়ঃক্রম অল্পমান চব্বিশ পঁচিশ বৎসর হইবে । তাঁহার শরীর অতিশয় বলিষ্ঠ ছিল এবং রূপলাবণ্যে চিত্ত চমকিত হইয়া যাইত । পূর্ণ-যুবক রামকৃষ্ণকে কেহই যুবা বলিয়া জ্ঞান করিত না । তাঁহাকে পঞ্চমবর্ষীয় বালকের ত্রায় সকলে ব্যবহার করিত । স্ত্রীলোকেরা তাঁহার সম্মুখে আসিতে কখন লজ্জা করিতেন না, অথবা তাঁহাদের কোন মতে লজ্জার উদ্বেক হইত না । হৃদয় স্ত্রীলোক লইয়া তাঁহার সহিত যে সকল অত্যাচার করিয়াছিল, রাসমণি এবং মথুর বাবুও তাহা জানিতেন ; কিন্তু এমনই মৃদুভাষী দুর্বল মন, এমনই অবিদ্যাপ্রাপ্ত হৃদয় যে, এই বালকবৎ, উন্মাদবৎ রামকৃষ্ণকে লইয়া ইঙ্গিত পরীক্ষা করা হইয়াছিল ।

কলিকাতার অন্তঃপাতী মেছুয়াবাজারের লছ্মীবাই নাম্নী বারান্দার সহিত পরামর্শ করিয়া পরমহংসদেবকে তথায় লইয়া যাওয়া হইয়াছিল । লছ্মীবাই একটা গৃহ মধ্যে পনের ঘোলাটা পূর্ণ যুবতীদিগকে অকৌলঙ্গাবস্থায় রাখিয়াছিল ।

পরমহংসদেবকে সেই গৃহের মধ্যে লইয়া গিয়া মথুর বাবু অদৃশ্য হইলেন। পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে, এই সময়ে পরমহংসদেব উলঙ্গাবস্থায় থাকিতেন। একখানি উত্তরীয় বস্ত্রের দ্বারা অঙ্গাবরণ থাকিত। উলঙ্গ রামকৃষ্ণদেব দেখিলেন যে, গৃহটা যুবতীমণ্ডলী দ্বারা পরিবৃত্ত। তাহাদের রূপলাবণ্যে, অঙ্গসৌষ্ঠবে ও নয়নভঙ্গী দ্বারা মুনির মন, অকামী ও নপুংসকের চিত্তবিকার উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। স্ত্রীলোকেরা একেই জগন্মোহিনী, তাহাতে আবার সেইদিন হরহৃদ্যবিহারিণী হরমোহিনীর মেহাঞ্চলাচ্ছাদিত রামকৃষ্ণের মনোমোহনের অভিপ্রায়ে মোহিনীজাল বিস্তীর্ণ করিয়া প্রাণপণে স্ব স্ব অভীষ্ট সিদ্ধির মানসে প্রতীক্ষা করিতেছিল। পরমহংসদেব তাহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবামাত্র এমনই সকলকে “মা আনন্দময়ী ! মা আনন্দময়ী !” বলিয়া মন্তকাবনতপূর্বক প্রণিপাত করিলেন এবং তাহাদের মধ্যস্থলে উপবেশন করিয়া “মা ব্রহ্মময়ী ! মা আনন্দময়ী !” বলিতে বলিতে সমাধিস্থ হইয়া যাইলেন। সমাধিকালে তাঁহার দুই নয়নে অনর্গল প্রেক্ষাশ্রু বহির্গত হইতে লাগিল। বারান্দার পরমহংসদেবের ভাব অবলোকন করিয়া ভীতা হইল এবং শশব্যস্ত হইয়া কেহ বায়ু ব্যঞ্জন করিতে লাগিল ও কেহ অপরাধিনী হইয়াছি বলিয়া গলগলীয়ুত-বাসে ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে লাগিল। এই ঘটনায় মথুর বাবু নিতান্ত লজ্জিত হইয়াছিলেন এবং পরমহংসদেবের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি বৃদ্ধি হইয়া গেল। তিনি তদনন্তর তাঁহার পাদপদ্মে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া কৃতদাসের ঞ্চায় আপনাকে বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

মথুর বাবুর পরীক্ষার কথা সকলেই শ্রবণ করিলেন, তাহাতে কেহ আশ্চর্য্য হইল এবং কেহ বা নানাপ্রকার দোষারোপ করিতে লাগিল। এই সময়ে অনেকের মনে এইরূপ ধারণা হইয়াছিল যে, রামকৃষ্ণ সিদ্ধ হইতে পারেন নাই, তবে ইন্দ্রিয় জয় পক্ষের কারণ এই যে, নানাপ্রকার ঝায়বীয় রোগবশতঃ পুরুষার্থহানি হইয়াছে, তন্নিমিত্ত স্ত্রীর নিকট গমন করিতে অসমর্থ হইয়া থাকেন। এইরূপে যাহার যে প্রকার স্বভাব, সে সেই প্রকারে পরমহংসদেবকে দর্শন করিতে লাগিল। রাসমণি দাসীও একথা শ্রবণ করিলেন। তিনি নিজে পরমহংসদেবের সিদ্ধাবস্থা জ্ঞাত হইয়াও (বিষয়ীর মন এমনই দুর্বল যে) পুনরায় তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে অসম্মত দিয়াছিলেন। আমরা পরমহংসদেবের নিকটে শুনিয়াছি যে, “একদিন সন্ধ্যার সময় আমি কুঠীতে শয়ন করিয়া আছি, এমন সময়ে গিগির প্রেরিত দুইজন স্ত্রীলোক আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাহারা দুই চারিটা অল্প কথা কহিয়া অমনি আমার (সৌজাতের অমুরোধে লিখিতে পারিলাম না) ধারণ করিল। আমি “মা ! মা ! মা !” বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলাম। পরে, আর আমার কোন জ্ঞান ছিল না। চৈতন্য লাভ করিয়া দেখি যে, তাহারা আমার পদধারণ করিয়া রোদন করিতেছে।” পরমহংসদেব অমনি চরণ সঙ্কুচিত করিয়া তাহাদের মা আনন্দময়ী বলিয়া নমস্কার করিলেন। স্ত্রীলোকদ্বয় তদনন্তর নানাপ্রকার অহুনয় বিনয় পূর্বক প্রস্থান করিল।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, পরমহংসদেব স্ত্রীজাতিকেই প্রকৃতির অংশ জ্ঞানে মা বলিতেন। তিনি কালীর মন্দিরে যাইয়া প্রার্থনা করিতেন, “মা ! অবিদ্যাও তুই, আর বিদ্যাও তুই। তুই মা গৃহস্থের কুলবধু, আবার তুই মা মেছো-বালায়ের ধানকী। মা ! তুই উভয় রূপেই আমার মা। আমি তোব সন্তান।”

পরমহংসদেব দুইবার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও তথাপি অব্যাহতি পাইলেন না। একদা বৈষ্ণবচরণ পরমহংসদেবকে কলিকাতার নিকটবর্তী কাছিয়াগান নামক স্থানে লইয়া গিয়াছিলেন। সে স্থানে নবরসিক ভাবের লোকের বাসই অধিক। পরমহংসদেব তথায় উপস্থিত হইবামাত্র স্ত্রীলোকেরা আসিতে লাগিল এবং তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া উপবেশন করিল। এই স্ত্রীলোকেরা বারাদনা নহে ; কিন্তু তাহাদের ধর্ম্মের এ প্রকার জঘন্যতাব যে, তাহা সাধারণের নিকটে প্রকাশ করিতে অপারক হইতেছি। এই শ্রেণীর মতে প্রকৃতিসাধনই একমাত্র আনন্দ সম্ভোগের নিদানস্বরূপ ; সুতরাং প্রকৃত আধ্যাত্মিকতায় জলাঞ্জলি দিয়া পরকীয় রসান্বাদনের বিকৃতভাবে সাব্যস্ত করিয়া তাহারা ইন্দ্রিয়-সুখ-চরিতার্থ করাই ধর্ম্মের সার জ্ঞান করিয়া থাকে। এই ধর্ম্মের সহিত বৃন্দাবনের রাসলীলার সাদৃশ্য দেখান হয় ; কিন্তু রাসলীলার প্রকৃত ভাবের অধিকারী কেবল-পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই হইয়াছিলেন এবং মহাপ্রভু ত্রিচৈতন্য সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন পূর্বক সেই শৃঙ্গার রসকাহিনী শ্রবণ করিয়াছিলেন। নবরসিকেরা শৃঙ্গার রসে আপনারা মাতিয়া থাকে। বৈষ্ণবচরণ পরম পণ্ডিত হইয়া তিনি এই মতটী বিশিষ্টরূপে পোষকতা করিতেন। সে যাহা হউক, পরমহংসদেবকে প্রাপ্ত হইয়া নবরসিকদের কোন যুবতী শশব্যস্ত হইয়া তাঁহার পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলী মুখ মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া ফেলিল এবং দ্বিতীয় যুবতী অতি কুৎসিত কার্য্যের ভাব দেখাইল। পরমহংসদেব বৈষ্ণবচরণকে তিরস্কার পূর্বক তথা হইতে গাজোধান করিলেন। নবরসিকেরা তাঁহাকে “অটুটু” বলিয়া জানিতে পারিল।

যখন পরমহংসদেবকে এইরূপে নানাবস্থায় ফেলিয়া পরীক্ষা দ্বারা তাঁহার ইঞ্জিয় বিকার সম্বন্ধে সকলেরই ভ্রম বিদূরিত হইল, তখন অগ্নি কেহ তাঁহাকে ভুক্তি দেখান আর নাই দেখান, মথুর বাবু সৰ্ব্বাপেক্ষা বিমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, পরমহংসদেব ইচ্ছামত কালীর পূজা করিতে যাইতেন। এই পূজা নিত্য পূজার মধ্যে পরিগণিত হইত না। কারণ পরমহংসদেবের উন্নতাবস্থা হইতেই সদয়ানন্দ তাঁহার কার্যে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। একদা তিনি পূজা করিতে গিয়া দেবীর জগ্ন যে সকল পুষ্প মাল্যাদি প্রস্তুত করা ছিল, তাহা আপনার গলদেশে ধারণ পূর্বক ও চন্দনাদি নিজ অঙ্গে প্রলেপন করিয়া সমাধিতে বসিয়াছিলেন। মন্দিরের কর্মচারীরা ইহাতে বিরক্ত হইয়া, যাহাতে তিনি একাকী মন্দিরে প্রবেশ করিতে না পারেন, এমন যুক্তি করিয়াছিল; কিন্তু পরমহংসদেব যখন নিজের ভাবে মন্দিরে গমন করিতেন, তখন তাঁহাকে কোন কথা বলিবার কাহার সাহস হইত না। আর একদিন তিনি পূজা করিতে গিয়া দেবীর পাদপদ্মে পুষ্প বিসদল প্রদান না করিয়া মন্দিরের মধ্যে ভৃত্য এবং অন্যান্য পদার্থ যাহা কিছু উপস্থিত ছিল, তৎসমুদয়ই পূজা করিয়াছিলেন। তিনি মধ্যে কতকগুলি বিড়াল রাখিয়াছিলেন। পূজার সময় চিনি প্রভৃতি দ্রব্য সামগ্রী কালীকে নিবেদন করিয়া না দিয়া কখন কখন তাহা বিড়ালদের খাইতে দিতেন ও আপনিও ভক্ষণ করিতেন। পরমহংসদেবের এই প্রকার স্বেচ্ছাচার ভাব দর্শন করিয়া মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক যারপর নাই বিরক্ত হইয়া তৎসমুদয় মথুর বাবুর কর্ণগোচর করিল। মথুর বাবুর নিকট হইতে কোন প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই পরমহংসদেবের মন্দিরে প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ হইল। এই আদেশ দ্বারবানের প্রতি ভারার্পণ করার পর, একদা পরমহংসদেব মন্দিরে প্রবেশ করায় সে প্রথমে তাঁহাকে নিষেধ করিল; কিন্তু তিনি এমন ভাবে বিহ্বল হইয়া যাইতেছিলেন যে, সে কথা তাঁহার কর্ণ-বিবরে প্রবিষ্ট হইল না। দৌবারিক এতদৃষ্টে বাহু প্রসারণ পূর্বক তাঁহার গতিরোধ করিবার জগ্ন প্রয়াস পাইল। পরমহংসদেব তাহাকে একটী মৃষ্টাশ্বাত করিয়া মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্বক ইচ্ছামত পূজা করিতে

লাগিলেন । দ্বারবান এক মুষ্ঠ্যাঘাতে এত অধীর হইয়াছিল যে, সে তৎক্ষণাৎ সেই স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল । তদ্বাবধায়ক এই সংবাদে ক্রোধে অধীর হইয়া নানাপ্রকার কাল্পনিক ভাবে তাহা মথুর বাবুকে নিবেদন করিয়া পাঠাইল । মথুর বাবু পরমহংসদেবের বিরুদ্ধে কন্মচারীদের বর্ণনাতিশয্য ও দোষারোপ দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কার্য্যের প্রতি কেহ কোন কথা বলিতে পারিবে না । তাঁহার যাহা ইচ্ছা করিবেন । এই কথায় রুত্তিভোগী কন্মচারীরা বাহ্যিক নিরস্ত হইল বটে, কিন্তু অন্তরে অন্তরে ক্রোধে, অপমানে, হতাশায় জর্জরীভূত হইতে থাকিল ।

পরমহংসদেবের প্রতি মথুর বাবুর এতাদৃশ ভক্তি এবং বাধ্যবাধকতা দেখিয়া সকলে মনে মনে স্থির করিল যে, ভট্টাচার্য্য মহাশয় মথুর বাবুকে "গুণ" করিয়াছে । তাহা না হইলে, যে মথুর বাবুর বিক্রমে সকলেই আতঙ্কে জড় সড় হইত, যে মথুর বাবুর নিকটে এক সময়ে পরমহংসদেব অগ্রসর হইতে পারিতেন না, আজ সেই মথুর বাবু পরমহংসদেবের এতাদৃশ বশীভূত হইয়া যাইলেন যে, কালী পূজার উপকরণাদি ভক্ষণ করিয়াও নিস্তার পাইয়া গেলেন । হিন্দুদিগের পক্ষে একাধা নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় । কালী যাহাদের ইষ্টদেবী, ভগবতী, স্বয়ং ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী, তাঁহার দ্রব্য একজন মনুষ্যে ভক্ষণ করিয়া ফেলিল, তাহাতে দ্বিরুক্তি না করা সামান্য কথার কথা নহে । সাধারণ লোকের পক্ষে একথা যারপর নাই অজ্ঞায় এবং অবৈধ বলিয়া অবশ্যই পরিগণিত করিতে হইবে । কিন্তু মথুর বাবু বাতুল হন নাই এবং তাঁহার বাহজ্ঞানও বিলুপ্ত হয় নাই, তবে কেন তিনি পরমহংসদেবের এ প্রকার ব্যবহারে কোন কথা বলেন নাই ; আমরা তাহার কারণ অবগত আছি । সে কথা স্থানান্তরে প্রকাশ করিব ।

মথুর বাবু পরমহংসদেবের এই অজ্ঞায় কার্য্যে পোষকতা করিলে, তাহা রাসমণিরও কর্ণগোচর হইল । রাসমণি মনে মনে নিতান্ত বিরক্ত হইয়াও মথুর বাবুর কথার প্রতি কোন মতামত প্রকাশ করিতে পারিলেন না । পরে একদিন তিনি স্বয়ং মন্দিরে আগমন করিলেন ।

রাসমণি পটুবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক দেবী-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, পরমহংসদেবও তথায় রহিয়াছেন । তিনি ইতিপূর্ব্ব হইতে যখনই মন্দিরে আসিতেন, পরমহংসদেবের নিকট দুই একটী শক্তিবিশয়ক গীত শ্রবণ না করিয়া যাইতেন না । এবারেও তদ্রূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন । পরমহংসদেব গান করিতে লাগিলেন । দূর্ভাগ্যবশতঃ রাসমণির মন গানে সংলগ্ন না হইয়া কোন

মোকদ্দমায় চলিয়া গেল। পরমহংসদেব তাহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার পৃষ্ঠদেশে, করাঘাত করিয়া ষোড়শিত ভৎসনা করিয়াছিলেন। রাসমণি দাসী স্ত্রীলোক, বিশেষতঃ মন্দিরের কত্রী, তাঁহাকে তাঁহার বেতনভোগী পূজক করাঘাত করিল, এ সংবাদে সকলেই ভীত হইল এবং ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের এই বার কি হয় বলিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য কৌশল, রাসমণি এইরূপ অপमानে ক্রুদ্ধা কিস্বা অভিমানিনী না হইয়া বিমর্ষভাবে মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া বাইলেন। রাসমণি, কি জ্ঞাত তাঁহার অভিপ্রায় কিছুই প্রকাশ করিলেন না, তাহা কাহারও অমুমানের গোচর নহে, হয় তাঁহাকে ব্রাহ্মণ জানে, না হয় বাতুল বলিয়া, অথবা নিজের মনের কথা জানিতে পারিয়াছেন সুতরাং সিদ্ধপুরুষ বিবেচনায়, নিম্নরূপ হইয়াছিলেন। যাহা হউক, তখন তিনি কিছু বলিলেন না বটে, কিন্তু সময়ান্তরে পরমহংসদেবকে নিভৃত্তে পাইয়া বলিয়াছিলেন, “ভট্টাচার্য্য মহাশয়! মথুর কি আপনাকে কিছু * বলিয়াছিল?” পরমহংসদেব কোন প্রত্যুত্তর দেন নাই।

একাদশ পরিচ্ছেদ ।

পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, পরমহংসদেবের মনে যখন যে কোন ভাবের উদ্বেগ হইত, তিনি তাহারই অনুষ্ঠান করিতেন এবং সেই কার্য্যের সহায়তা হেতু একজন সাধু আসিয়া উপস্থিত হইতেন। অনন্তর তাঁহার মনে ভগবান রামচন্দ্রের ভাব + আসিয়া অধিকার করিল। তিনি বুঝিলেন যে হনুমানই রামচন্দ্রের প্রকৃত ভক্ত। তাঁহার অনুবর্তী না হইলে রামচন্দ্রের চরণ লাভ করা যায় না। হনুমানের অহৈতুকী ভক্তি ছিল। তিনি পৃথিবীতে যে কোন পদার্থ দেখিতেন, তাহার মধ্যে রামচন্দ্রকে দেখিতে না পাইলে তাহা গ্রহণ করিতেন না। তাঁহার আয় নিষ্ঠা ভক্তি অতি বিরল। তিনি জানিতেন, যে,

রাসমণির মনে হইয়াছিল যে, মথুর বাবু পরমহংসদেবের দ্বারা তাঁহাকে বশীভূত করিবার মানস করিয়াছিলেন।

† কোন কোন ভক্ত বলেন যে, তিনি কালী দর্শন করিবার পূর্বে রামমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সাধন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার মুখ হইতে শোণিত নিঃসৃত হইয়াছিল। একথা সত্য হইলেও তিনি হনুমানের ভাব সাধন যে, পরে করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

সর্বত্রই রামচন্দ্র আছেন, রামচন্দ্র ব্যতীত কোন বস্তু হইতে পারে না, তথাপি রামচন্দ্রের নবদুর্বাদল সদৃশ রূপ ভিন্ন অল্প কোন রূপ দেখিতে চাহিতেন না। এই নৈঋত ভক্তি প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত পরমহংসদেব হনুমানের ভাব সাধন করিয়াছিলেন। যখন তাঁহাতে পবনস্রুতের ভাবাবেশ হইত, তখন তাঁহার নিকট কেহই থাকিতে পারিত না। তাঁহার হাবভাব ও শারীরিক অঙ্গাঙ্গ লক্ষণে মনুষ্যত্বতাবের বিপরীত ভাব প্রকাশ পাইত। তিনি তদবস্থায় রঘুবীর শব্দ এমন উচ্চাস ও গম্ভীর বাক্যে বলিতেন, যেন তিনি তাঁহার সাক্ষাৎকার-লাভ করিয়া সম্বোধন করিতেছেন বলিয়া সকলের জ্ঞান হইত। এই অবস্থায় তাঁহার সম্মুখে পেয়ারা ও অঙ্গাঙ্গ সাময়িক ফল সংস্থাপন না করিলে, তিনি মহা গোলযোগ উপস্থিত করিতেন। ফল পাইলে তাহা আপনি কামড়াইয়া ভক্ষণ করিতেন। কখন তিনি কাপড়ের লাদুল পরিয়া রক্তের উপর বসিয়া থাকিতেন এবং রান রঘুবীর বলিয়া চাৎকার করিতেন। পরমহংসদেব বলিয়া-ছিলেন যে, এই সময়ে তাঁহার ইচ্ছাপ্রমাণ লাদুল জগিয়াছিল, উহা পরে ধসিয়া যায়। এই সময়ে পরমহংসদেব জনৈক রামাং সন্ন্যাসীর নিকট রামমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এই সাধুর একটি পিতলের রামমূর্তি ছিল। এই মূর্তির প্রতি পরমহংসদেবের বাৎসলাভাব হইত। গুনিয়াছি, তিনি যখন বাগানে যে কোন স্থানে যাইতেন, রামলালা (ঐ মূর্তির নাম) তাঁহার সঙ্গে যাইতে চাহিতেন। সময়ে সময়ে পরমহংসদেব তাঁহার সহিত এমন ভাবে বাক্যালাপ করিতেন যে, সে কথা শুনিলে বাস্তবিক ঘটনা বলিয়া নিশ্চয় বুঝা যাইত। একদা রুষ্টির সময়ে পরমহংসদেব বহির্দেশে গমন করিতেছিলেন, পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, “ফের যদি অমন ক’রে বিরক্ত করবি, তা হ’লে তোকেপ্রহার ক’রব। গুনলিনে—আরে পাগল, বাগানে কাদা হয়েছে, পায়ে লাগবে। রুষ্টিতে গা মাথা ভিজে যাবে, শেষ কি জর ক’রে বসবি?” আর একদিন গঙ্গানানের সময় পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন, “দেখ্ অত ক’রে জলে থাকিস্নে অত জলে বাস্নে, ডুবে যাবি। আর তোর গা পরিষ্কার করিয়া দিই।” আমরা তাঁহার মুখে এই সকল কথা শুনিয়াছি। তিনি আরও বলিতেন যে, রামলালা দেখিতে ঠিক তিন চারি বৎসরের বালকের জায়। অমন অঙ্গসৌষ্ঠব ও দেহের কান্তি কেহ কখন দেখে নাই। তাহার কথা শুনিলে আপনাকে আপনি ভুলিয়া যাইতে হয়। রামলালা মূর্তিটা পরমহংসদেবকে পুরোক্ত সাধু দিয়া গিয়া-ছিলেন। উহা অত্যাপি দক্ষিণেশ্বরে আছে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ।

—:—

পরমহংসদেব এইরূপে রাম-বিষয়ক সাধনান্তে নানাবিধ সম্প্রদায়ের সাধুর সহিত মিলিয়া তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট দীক্ষিত এবং সাধন দ্বারা তাহাতে সিদ্ধমনোরথ হইয়া পরিশেষে ত্রীদাম সুবলাদির ভাব অবলম্বন পূর্বক সখ্য প্রেমের সাধন আরম্ভ করেন। তখন তিনি ভাবাবেশে ত্রীকৃষ্ণকে লইয়া মনের সাথে অলকা তিলকা দ্বারা সুসজ্জিত করিতেন। কখন বা, চরণে নুপুর পরাইয়া রুণু বাহু শব্দ শ্রবণ করিয়া আপনিও আনন্দে নৃত্য করিতেন। কখন বা, গহন কাননে কৃষ্ণের অদর্শন বশতঃ বুক চাপড়াইয়া রোদন করিতেন। কখন বা, এই বিরহান্তে কৃষ্ণকে আলিঙ্গনপূর্বক “ভাই কানাই আর তোকে ছেড়ে দেবোনা ভাই! তোর অদর্শনে প্রাণ ব্যাকুল হ’য়ে উঠে, আমরা দশদিক্ শূণ্যময় দেখি। এইনে ভাই! ফল ধা,”—ইত্যাকার কত কথাই বলিতেন! কখন বা, তিনি নন্দ যশোদার বাৎসল্যভাবে গোপাল গোপাল বলিয়া রোদন করিতেন এবং সময়ান্তরে গোপালকে ক্রোড়ে লইয়া অপার আনন্দ সন্তোগ করিতেন।

কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় এইরূপ বিবিধ সাধন করিয়া পরমহংসদেব সখীভাবের সাধন আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি সকল সাধনের পূর্বে ভক্তবিশেষের শরণাগত হইয়াছিলেন, সখীভাবেও তাহাই দৃষ্ট হইয়াছিল। সখীভাবে দুইবার সাধন করেন। প্রথমে, তিনি অষ্ট নায়িকার ভাবাবলম্বন পূর্বক নায়িকাদিগের বেশ-ভূষায় বিভূষিত হইয়া ও দক্ষিণ হস্তে চামর গ্রহণান্তর মহাকালের বক্ষঃস্থল-বিরাজিত মহাকালীর সম্মুখে দাসীর ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিতেন। মধ্যে মধ্যে নৃত্য করিতেন এবং চামরের দ্বারা বায়ু ব্যঞ্জন করিয়া দেবীর শরীরে শৈত্যোৎপাদন করিতেন।

দ্বিতীয় প্রকার সখীভাবে, বন্দাবনেস্থরী শ্রীমতি রাধিকার অষ্টসখীর সেবিকা হইয়াছিলেন। তিনি জীর বেশ ধারণ করিবার নিমিত্ত মস্তকে পরচুলা, নাসিকায় বেসর (পশ্চিমাঞ্চলের নাসান্তরণবিশেষ) চক্ষে অঞ্জন, ললাটে সিদ্ধুর, নাসাপৃষ্ঠে তিলক, অধরে তাণ্ডুল, কর্ণে কর্ণাভরণ, কণ্ঠে হার, বক্ষে কাঁচুলী এবং তদুপরি ওড়না, বাহ্যুগলে নানাবিধ অলঙ্কার, পরিধানে পেশোয়াজ, কটিদেশে চন্দ্রহার এবং চরণদ্বয়ে হুপুর পরিধান করিতেন। এই অলঙ্কার পরিচ্ছদাদি মধুর বাবু প্রদান করিয়াছিলেন। পরমহংসদেব বেশভূষা ধারণ পূর্বক কোন

স্থানে উপবেশন করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে বলিতেন, “কোথায় ললিতা! কোথায় বিশাখা! একবার আমার প্রতি দয়া কর। আমি অতি হীন, অতি দীন, আমার উপায় কি হইবে? আমি শুনিয়াছি যে, শ্রীমতি তোমাদের প্রেমে-
চির-বিক্রীত। তোমাদের দয়া ব্যতীত রাখার সাক্ষাৎ কেহ পাইতে পারে না। আমি পূজা জানিনা, আমি তজ্জন জানিনা, আমি তোমাদের দাসীর দাসী, আমায় দয়া কর। তোমাদের দয়া না হ’লে রাখাকে পাবো না।” এই বলিতে বলিতে তাঁহার হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার হইয়া আসিত, তাঁহার নয়নযুগল হইতে অনর্গল অশ্রু নির্গত হইত এবং বাক্য গদগদ হইয়া আসিত। তিনি তখন সরো-
দনে কীর্তনের সুরে বিরহ-বিষয়ক গান করিতে করিতে সমাধিস্থ হইয়া যাইতেন। তিনি অচিরে শ্রীমতির দর্শন লাভ করিলেন। তিনি একদিন বসিয়া আছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, একটা অপূর্ণ রূপলাবণ্যবিশিষ্টা পূর্ণযুবতী তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। তিনি অলঙ্কারে বিভূষিতা, তাঁহার পরিচ্ছদ জরীর পেশো-
য়াজ্জ, কাঁচুলী এবং ওড়না। মস্তকে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ কৌকড়ান কেশজাল, ইহার কিয়দংশ মুখের উপরে পতিত হইয়া বদনকান্তির অনির্বচনীয় শোভা সম্পাদন করিতেছিল। পরমহংসদেবের প্রতি নিরীক্ষণ পূর্বক ঈষৎ হাসিলেন এবং উভয় হস্তের অনুলির মধ্যে অনুলি স্থাপন পূর্বক সঞ্চাপন করিতে করিতে অদৃশ হইয়া
পড়িলেন। তদবধি তাঁহার সখীতাব চলিয়া গেল। তিনি কখন বলিতেন,
“কোথায় শ্রীমতি! কোথায় রাধে প্রেমময়ী! একবার আমায় দয়া কর। তুমি
অষ্ট সখীর শিরোমণি, তুমি মহাভাবময়ী মহাভাবপ্রসবিনী, তুমি দয়া কর।
তোমার দয়া না হইলে আমি ত কৃষ্ণের দেখা পাবো না। কৃষ্ণচন্দ্র তোমার,
তোমার প্রেমে তিনি বাঁধা আছেন। তুমি ছাড়িয়া দিলে তবে তাঁহার দেখা
পাবো। তাই বলি, আমায় দয়া কর। কৃষ্ণ দর্শনের জন্ত আমার প্রাণ
ব্যাকুলিত হইতেছে। নিবেদন মানে না, বারণ শোনে না, কৃষ্ণ এনে দেখাও।
দেখ সখি! চেয়ে দেখ, আমার প্রাণ কোথায়? প্রাণ ওষ্ঠাগত; প্রাণ বক্ষ-শিঞ্জর
ভেদ করিয়া বুঝি বহির্গত হইয়া যায়। আমায় রক্ষা কর, কৃষ্ণ দিয়ে প্রাণ
বাঁচাও। তোমার কৃষ্ণ আমি লইব না, তোমাকেই ফিরাইয়া দিব। আমি
কেবল একবার চক্ষের দেখা দেখিব।” এইরূপে রোদন করিতে করিতে তিনি
সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িতেন। ক্রমে, তিনি আপনাকেই শ্রীমতি জ্ঞান করিতে
লাগিলেন এবং তাঁহার জায় স্বতাব প্রকাশ করিয়া কৃষ্ণকে স্বামী বলিয়া
সম্বোধন করিতেন। কখন বা, কৃষ্ণের অদর্শনে এই রূপ গীত গান করিতেন।

শ্রামের নাগাল পেলুম'না লো স'ই ।

আমি কি স্তূথে আর ঘরে র'ই ॥

গ্রাম যে মোর নয়নের তারা,

তিলেক আধো না দেখ'লে স'ই হই দিশেহারা ;

আবার শ্রামের লেগে ভেবে ভেবে দিশেহারা হ'য়ে র'ই ॥

গ্রাম যদি মোর হ'তো মাথার চুল,

আমি যতন করে বাতুম বেণী, স'ই দিয়ে বকুল ফুল ;

আমি বনপোড়া হরিণের মত ইতি উতি চেয়ে র'ই ॥

গ্রাম যখন এই বাজায় গো বাণী,

আমি তখন যমুনাতে জল লয়ে আসি ;

আমার কঁকের কলসী কঁকে রৈল, শ্রামের বদন পানে চেয়ে র'ই ॥

গীত সমাপ্তির সহিত তাঁহারও বাক্য সমাপ্ত হইয়া আসিত। তিনি স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতেন, চক্ষুর ললক পতিত হইত না। বদনে হাস্তের ছটা, দক্ষিণ হস্তের তর্জনি অঙ্গুলি দ্বারা কি যেন নির্দেশ করিতেছেন। এই ভাব ক্রমে অবসাদন হইয়া আসিলে, তবে পূর্ব প্রকৃতিস্থ হইতে পারিতেন।

সখীভাব সাধন-কালীন পরমহংসদেবের স্বভাব চরিত্র ও শারীরিক গঠন অবিকল স্ত্রীলোকের তায় হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার নিকটে আমরা শ্রবণ করিয়াছি যে, এই সময়ে তিনি প্রতি মাসে তাঁহার বস্ত্রে শোণিত চিহ্ন দেখিতে পাইতেন।

সখীভাবে অবস্থিতি কালে পরমহংসদেব স্ত্রীলোকদিগের সহিত অধিক সময়

* আধুনিক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা এই কথায় আমাদের বাতুল বলিয়া সাব্যস্ত করিবেন, তাহার ভুল নাই ; কিন্তু তাঁহাদের গোচরার্থ বিলাতের একটা ঘটনা এই স্থানে উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইলাম। যদ্যপি কোন বিষয়ের প্রগাঢ় সংস্কার জন্মিয়া যায়, তাহা হইলে সেইরূপ কার্য প্রকাশ পাইবার কোন প্রকারে কেহই প্রতিবন্ধক জন্মাইতে পারে না। একদা ডাক্তার ওয়াডেন আমাদের নিকট গল্প করিয়াছিলেন যে, এক ব্যক্তির দ্বারা মৃত্যু হইলে তাহার শিশু সন্তান যখন ক্রন্দন করিত, সে ব্যক্তি-তৎক্ষণাত্ই তাকে বক্ষোপরে স্থাপন পূর্বক মাতার ন্যায় সাবনা করিতে প্রয়াস পাইত। শিশুটী যতক্ষণ বক্ষের উপর থাকিত, ততক্ষণ সে আপনাকে বিশ্বস্ত হইয়া বাইত। কিছু দিন এইভাবে দিন যাপন করিয়া ঐ পুরুষটির স্তনে হৃৎকের সঞ্চারণ হইয়াছিল। সংস্কারে (Impression) যা হইবার নহে, তাহাও হইতে পারে। এই মর্মে ইংরাজী পুস্তকে ভূরি ভূরি উপাখ্যান আছে। ইংরাজী পুস্তকের দোহাই না দিলে, আজ কাল কেহ কোন কথা বিশ্বাস করেন না, ভ্রমিমিত্র এ প্রস্তাবের অবতারণা করিতে হইল।

অতিবাহিত করিতেন। কথায় কথায় সহজ জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া তিনি জড়ভাব প্রাপ্ত হইতেন; পূর্বে কথিত হইয়াছে, এই ভাবকে ব্রাহ্মণী মহাভাব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। মহাভাব সেই জ্ঞান পরমহংসদেবের এই সাধন-ফল বলিয়া নির্দেশ করা যায় না, তাহা কুম্ভক যোগের পূর্বে আপনা হইতেই উদয় হইত। এই মহাভাবের রত্নাস্ত চৈতন্য-চরিতানুত গ্রন্থে বিশেষরূপ বিবৃত আছে। মহাভাব সাক্ষাৎ শ্রীমতী-স্বরূপিনী, মহাভাব উপস্থিত হইলে অশ্রু, কম্প, স্বরভঙ্গ পুলক, শ্বেদ, উন্মত্ততা এবং মৃতপ্রায় লক্ষণ সকল পর্যায়ক্রমে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই ভাব মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের জীবনরত্নাস্তেই শুনা গিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার অপ্রকটাবস্থার পর এ পর্য্যন্ত আর কোন ব্যক্তিতে মহাভাবের লক্ষণ দেখা যায় নাই। পরমহংসদেবের শিষ্যদিগের মধ্যে অনেকেরই ভাব হইতে দেখা গিয়াছে এবং চৈতন্য প্রভুর সমকালীন তাঁহার শিষ্যদেরও ভাবাবেশ হইত বলিয়া জনশ্রুতি আছে, কিন্তু মহাভাব শ্রীচৈতন্য এবং পরমহংসদেব ব্যতীত আর তৃতীয় ব্যক্তির দেখা যায় নাই।

পরমহংসদেব একদিকে সখীভাবে মহাভাব লাভ করিয়া কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত বিহার-সুখ সম্ভোগ করিতেন এবং অপরদিকে দিবা রজনী স্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যে বাস করিতেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার মনের কথা কেহ বুঝিতে পারে নাই। মথুর বাবু তখন পরমহংসদেবের নিতান্ত অহুগত ছিলেন। তাঁহাকে না দেখিলে তিনি চতুর্দিক শূন্যময় বোধ করিতেন, সুতরাং সর্বদাই কাছে কাছে থাকিতেন। তাঁহার আহারের জ্ঞান স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। পরিধানের নিমিত্ত বালুচরের অত্যাংকুষ্ঠ চেলী আনাইয়া তিনি আপন হস্তে পরাইয়া দিতেন। শীতকালে বহু মূল্যের বস্ত্রাদি প্রদান করিতেন, কিন্তু পরমহংসদেব উহা একবারের অধিক ব্যবহার করিতে পারিতেন না। মূল্যবান পরিধেয় বস্ত্রগুলি প্রায়ই তিনি ছিঁড়িয়া ফেলিতেন এবং দেড়শত টাকা মূল্যের একখানি শীত বস্ত্র সম্বন্ধে আমরা শুনিয়াছি যে, মথুর বাবু আপনি বারানসী শালজ্ঞানি গায়ে জড়াইয়া দিয়াছিলেন। পরমহংসদেব কিয়ৎকাল পরে ভাবাবেশে কহিতে-ছিলেন, “মন! এর নাম শাল, ভ্যাড়ার-লোম, আঁঙনে দিলে পুড়িয়া যায়। তখন এমন দুর্গন্ধ নির্গত হয় যে, কেহ তাহাতে স্তব্ধ হইতে পারে না। এই শালের দাম দেড়শত টাকা। ইহা গায়ে দিলে মনে রজোগুণ বাড়িয়া যায়। সাধারণ লোক এ শাল গায়ে দিতে পারে না। তাহার কালো মোটা চাদর ব্যবহার করিয়া থাকে। এ শাল গায়ে দিয়া তাহাদের নিকটে বাইলে মন পরম

হইয়া উঠে, সেই লোকদিগকে হীন বলিয়া জ্ঞান হয়। পাছে তাহাদের গায়ে গা, ঠেকে, 'এই অল্প অতি গরীব ভাবে, 'ওরে তুই ছোট লোক সরে যা' এইরূপ অহঙ্কারের কথা বাহির হইয়া থাকে।" এই প্রকার আপনা আপনি বিচার করিতে করিতে সেই শালখানি মৃত্তিকায় নিক্ষেপ করত তদুপরি 'থু থু' করিয়া থুংকার প্রদান করিতেছিলেন, এমন সময় মথুর বাবু আসিয়া তাহা দর্শন করিলেন। তাঁহার চক্ষে জল আসিল এবং মনে করিলেন, এ মহাপুরুষের নিকট আর আমি অর্থের গরিমা প্রকাশ করিব না।

তিনি অতঃপর পরমহংসদেবকে জানবাজারস্থ বসতবাটীর অন্তঃপুরে লইয়া রাখিলেন। ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে যে, মথুর বাবু তাঁহাকে না দেখিলে বড়ই কাতর হইতেন, সে বিষাদ আর তাঁহার থাকিল না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ।

—০*০—

পরমহংসদেব জানবাজারে আশ্রিয়া সর্বদাই অন্তঃপুরে বাস করিতেন। অন্তঃপুরবাসিনীগণ সকলেই তাঁহাকে অতি আদরের ধন বলিয়া জানিতেন। পরমহংসদেবকে পুরুষ বলিয়া কেহ লজ্জা করিত না, কিম্বা সহসা তাঁহার সম্মুখে আসিতে কেহ সঙ্কুচিত হইত না। বাটীর মহিলাগণ কেহ তাঁহাকে সম্ভানের আয় বোধ করিতেন এবং কেহ বা সাধু বলিয়া জ্ঞান করিতেন। মথুর বাবুর কন্ঠারাই প্রায় তাঁহাকে তৈলাদি মর্দন পূর্বক স্নান করাইয়া দিতেন। পরমহংসদেব সময়ে সময়ে ভাবাবেশে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া উলঙ্গ হইয়া পড়িতেন; কিন্তু তাহাতে কাহারও মনে বিকার উপস্থিত হইত না। বরং তাঁহারাই বস্ত্রাদি পরাইয়া দিতেন।

পরমহংসদেবের যখন যে স্থানে যাইবার ইচ্ছা হইত, তিনি স্থানস্থান, কাল-কাল, কিম্বা ব্যক্তিবিশেষ বিচার না করিয়া তথায় চলিয়া যাইতেন। কখন কখন মথুর বাবু সঙ্গীক বিছানায় শয়ন করিয়া থাকিলে, পরমহংসদেব ঘরে ঢুকিয়াই চলিয়া আসিতেন, মথুর বাবু এবং তাঁহার স্ত্রী তাহাতে বিরক্ত হইয়া বলিতেন, "বাবা! তুমি আবার আমাদের দেখে সরে যাও কেন? তোমার কি অল্প কোন রকম ভাব আছে? বালকেরা যাহা বুঝিতে পারে, বাবা! তোমার যে সে বুঝিও নাই।" যে দিবস মথুরের মনে কোন প্রকার ভাবোদয় হইত, সেই দিবস পরমহংসদেবকে আপনার নিকট শয়ন করিতে বলিতেন। পরমহংসদেব তাহাতে কোন প্রকার আপত্তি করিতেন না।

শুন। গিয়াছে যে, পরমহংসদেব তথায় প্রায় স্ত্রীবেশে থাকিতেন। যখন কোন প্রতিমা পূজাদি হইত, দেবীর বিসর্জনকালীন পরমহংসদেব অত্যন্ত স্ত্রীলোকের দ্বারা বরণ করিতে যাইতেন। তখন তাঁহাকে এমন দেখাইত যে,* অবগুণ্ঠনভাবে না থাকিলে, তাঁহাকে ছদ্মবেশী বলিয়া কেহ চিনিতে পারিত না।

একদা জগদ্ধাত্রী প্রতিমূর্ত্তি নিরঞ্জন সময় বরণাদি সমাধা হইবার পর, মথুর বাবু রোদন করিয়া পরমহংসদেবকে বলিয়াছিলেন, “বাবা! আমার মা চলিয়া যাইতেছে, আমি কেমন করিয়া তাহা সহ্য করিব?” পরমহংসদেব মথুর বাবুর বক্ষোপরি হস্তার্পণ করিয়া বলিয়াছিলেন, “ভয় কি, আনন্দময়ী মা তোমার হৃদয়ে আছেন।” মথুর বাবু তখন নিরন্তর হইলেন বটে, কিন্তু কিয়ৎকাল পরে তাঁহার চক্ষুদ্বয় লোহিতবর্ণ হইয়া গেল, বাক্য নিঃসরণ রহিত হইল এবং ক্রমে চেতনাবস্থা অন্তর্হিত হইয়া আসিল। সহসা এই প্রকার অবস্থা পরিবর্তনের নিমিত্ত সকলেই ভীত হইলেন এবং চিকিৎসাদি দ্বারা রোগোপশমের ব্যবস্থা হইতে আরম্ভ হইল; কিন্তু কিছুতেই উপকার হইল না। মধ্যে মধ্যে রোগী “বাবাকে নিকটে আন” এইরূপ প্রলাপ বলিতে লাগিলেন। পরমহংসদেব মথুর বাবুর এই প্রকার কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন এবং মাতার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তিনি অতঃপর মথুরের নিকটে গমন পূর্বক গাত্রে হস্তার্পণ করিয়া তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। তদবধি সময়ে সময়ে মথুর বাবুর ভাবাবেশ হইত।

পরমহংসদেব যে কি কারণে স্ত্রীবেশে স্ত্রী-মণ্ডলীর মধ্যস্থলে বাস করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয়, কেহ কেহ বুঝিতে পারিয়াছেন, কিন্তু সধারণ লোকেরা ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া, নানাবিধ কুভাবে তাহা পর্য্যবসিত করিয়া লইবেন, তাহার সন্দেহ নাই। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, পরমহংসদেব সখীভাবে সাধনের সময়ে জ্ঞানবাজারে যাইয়া বাস করিয়াছিলেন। তিনি যে নিরবচ্ছিন্ন এখানে থাকিতেন, তাহা নহে। কখন দুই দিন, কখন দশ দিন এবং কখন বা মাসাধিকও হইত। তাঁহার যখনই মন যাইত, সময় অসময় বিচার না করিয়া দক্ষিণেশ্বর চলিয়া আসিতেন।

সখীভাবে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এই স্থানে কিছু আভাস দেওয়া কর্তব্য। কর্ম কাণ্ডের মধ্যে নিষ্কাম কর্মই সর্বপ্রশংসনীয় এবং আনন্দপ্রদ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সকাম কর্মে অতীষ্ট সিদ্ধ না হইলে, নিরানন্দের সীমা থাকে না; কিন্তু নিষ্কাম কর্মে কর্মফল আকাঙ্ক্ষা না করিয়া, কেবল কর্ম করিতে হয়।

ইহাতে কলাফলের প্রত্যাশা না থাকায় কর্ম্মীর মনে উৎসাহ কিম্বা নিকৃৎসাহ একেবারেই স্থান পাইতে পারে না। ফলে, এ ক্ষেত্রে সর্বদা আনন্দ বিরাজিত থাকে। সখীভাব নিকাম ধর্মের জায় আকাজ্ঞাবিহীন সাধনাবিশেষ। বৃন্দাবন-ধরী শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের স্তমিলন করাইবার জগুই সখীদিগের নানাবিধ আয়োজন হইত; নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করা তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য ছিল না। এই নিমিত্ত সখীদিগের ভাবকে নিকাম ভাব বলা হয়।

তদপক্ষে, সখীভাবকে মনোরতিদিগের সহিত তুলনা করা যায়। জীবাত্মা বা লিঙ্গশরীর, অর্থাৎ যে চৈতন্যাংশ পাঞ্চভৌতিক দেহ লইয়া স্বতন্ত্র হইয়া রহিয়াছেন, স্বভাবতঃ উহা জড়জগতের বিবিধ প্রকার আবরণে আবৃত থাকিয়া তাহার নিজ কর্তব্য বিষ্মত হইয়া এক কিস্তৃত-কিমাকার ধারণ পূর্বক ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া থাকেন। এই জীবাত্মাকে প্রকৃতি বা রাধাও বলা যাইতে পারে। সখী-স্বরূপা মনোরতিদিগের সাহায্যে জীবাত্মার পূর্বাবস্থা ক্রমে বিদূরিত হইয়া পরমাত্মা বা শ্রীকৃষ্ণ লাভের সুবিধা হয়। মোহাদি বিবিধ মায়াবরণ হইতে জীবাত্মা স্বতন্ত্র হইলে, উহার স্বপ্রকাশ কহা যায়। এই সময়ে যে সকল অবস্থা সময়ে সময়ে উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহাদিগকে সাধারণ কথায় ভাব বলে। পরমাত্মা বা শ্রীকৃষ্ণ মন্তক-গহ্বরে সহস্র দল কমলোপরে বাস করিতেছেন। মনোরতি-সখীদিগের সহিত জীবাত্মা-সতী নিম্নদেশ হইতে বিবিধ ভূমি * অতিক্রম করিয়া যখন সহস্রদলে আগমন পূর্বক পরমাত্মার সহিত স্তমিলন কার্য সমাধা করেন, তখন সখীগণ ঐ যুগলমুর্তির সন্নিধানে শ্রাদ্ধ পালনার্থ অবস্থিতি করে। এই অবস্থাকে মহাভাবের অব্যবহিত পরবর্তী অবস্থা বা সমাধি কহা যায়। জীবাত্মার স্বস্থান পরিত্যাগ কাল হইতে পরমাত্মার সন্নিহিত হওয়া পর্য্যন্ত সময়কে মহাভাব বলে।

যে পর্য্যন্ত জীবাত্মা জৈব সম্বন্ধ সংস্থাপন পূর্বক অবস্থিতি করেন, সে পর্য্যন্ত তিনি জীব নামে অভিহিত। জীবাত্মা স্বস্থান হ্যুত হইলে, ঐ জীবের জীবন নাশ হইয়া মৃত্যুদশা সমাগত হইয়া থাকে, যাহাকে মৃত্যু কহে। যোগ সাধনের দ্বারা যখন মৃত্যুর জায় অবস্থা লাভ হয়, তাহাকেই সমাধি কহা যায়। সমাধিস্থ হইলে, পুনরায় ইচ্ছা করিয়া জৈবভাবে আসা যায়। সাধারণ মৃত্যু হইতে সমাধির এইমাত্র প্রভেদ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে।

* তদ্রূপে ইহাকে চক্র কহে।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

পরমহংসদেব পূর্বোন্নিধিতমতে জ্ঞান ও ভক্তি পন্থার বিবিধ শাখা পরিভ্রমণ পূর্বক প্রাচীন হিন্দুদিগের বিধিবদ্ধ ও রাগানুগা ধর্ম সকল এবং তাঁহার নিজ কল্পিত প্রণালীবিশেষ সাধন করিয়া তাহাদিগের চরমাবস্থায় উপনীত হইয়া দেখিলেন যে, সকল মতের পরিণাম ফল একপ্রকার। বৈদান্তিক মতের পরমহংসদিগের যে অবস্থা, তন্ত্র মতের সিদ্ধাবস্থায় কৌলদিগের * তদ্রূপ ভাব। কঠাভজাদিগের ‘সহজ’ বা ‘আলেখ,’ নবরসিকের ‘অটুট,’ বাউলদিগের ‘সাঁই’ এবং বৈষ্ণবদিগের ‘মহাভাব’ প্রভৃতি নানাবিধ ভাবের সহিত মিলাইয়া লইলেন; কিন্তু সাধনের শেষাবস্থায় কাহার সহিত কাহার পার্থক্য দেখিতে পাইলেন না। তিনি বিবিধ ধর্মের আত্যন্তরিক অবস্থা এই প্রকার প্রত্যক্ষ করিয়া বুঝিলেন যে, সাধারণ পক্ষে ধর্ম জগৎ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া আছে। প্রথম, জ্ঞান বা আত্মতত্ত্ব পক্ষে এবং দ্বিতীয়, ভক্তি বা লীলা পক্ষে। বৈদান্তিক, তান্ত্রিক ও বৈষ্ণব শাস্ত্রাদি প্রথম শ্রেণীর এবং পৌরাণিক মতাদি দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। বৈদান্তিক মতে “সেই আমি বা আমিই সেই” অর্থাৎ বাহ্য কিছু আছে, ছিল বা হইবে, তাহা আমার অন্তর্গত অথবা আমি ছিলাম, আছি এবং হইব। ফলে, আমি ব্যতীত আর কিছুই নাই, ছিল না এবং হইবে না। যেমন পাঞ্চভৌতিক বিষয়ীভূত জগৎ। ইহার সর্বস্থানেই পাঁচের সত্তা উপলব্ধি হইয়া থাকে। যত্বপি কোন একটা পদার্থ লইয়া বিচার করা যায়, তাহা হইলে কারণ ধরিয়া দেখিলে, তাহার অন্তর্গত পদার্থ সর্বত্রই রহিয়াছে, জ্ঞান-দৃষ্টিতে দেখিতে পাওয়া যাইবে। কিন্তু পার্থিব পাঞ্চভৌতিক পদার্থ ব্যতীত মনুষ্যদেহে যে পরম পদার্থ আছে, তাহা অতীত কোন স্থানে সেরূপ ভাবে না থাকায়, মনুষ্য ইচ্ছাক্রমে নানাবিধ পদার্থ সৃষ্টি এবং ধ্বংস করিতে পারে। এই নিমিত্ত মনুষ্যজাতিই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠপদ অধিকার করিয়াছে। জড়জগৎ হইতে চলিয়া গিয়া অর্থাৎ যোগাবলম্বন পূর্বক স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এবং মহাকারণ পর্য্যন্ত গমন করিলে, আপনার অস্তিত্ব হারাইয়া যাইবে, ইহাই বৈদান্তিক সমাধি। ভক্তিমতে মহাভাব লাভ করিয়া যে সমাধি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাও তদ্রূপ। এস্থলে কার্যের তারতম্য থাকিলেও ফলের প্রভেদ হইতেছে

* দক্ষিণাচারীদিগের মতবিশেষকে কুলাচার কহে; কুলাচারে সিদ্ধাবস্থাকে কৌল কহে।

না। তদ্ব্যমতে, ‘পাশবদ্ধ জীব পাশযুক্ত শিব’ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, মায়াবরণ দ্বারা জীবাত্মাকে স্বস্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখে। এই আবরণের নামান্তর পাশ। এই আবরণ বা পাশ বিচ্ছিন্ন হইলে, জীবের জীবত্ব বিলুপ্ত হইয়া জীব শিবত্ব বা মঙ্গলময় কার্য্য করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বৈকল্যমতে এই অবস্থাকে ভাব কহে। শিবত্ব লাভ করা তন্ময়ের শেষ কথা নহে। শিবের শব্দ হইলে, তবে ব্রহ্মময়ীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়; এতলেও মৃত্যুর ভাব বা সমাধি নিরূপিত হইতেছে, কালীমূর্ত্তি তাহার দৃষ্টান্তবিশেষ। বাউল প্রভৃতি অগাধ মতে যখন মহাকারণে পরমাত্মা লইয়া কথা, তখন তাহাদের স্থলভাবের তারতম্য থাকিলেও প্রাচীন মতের সহিত অনৈক্য হইতেছে না।

দ্বিতীয় মতে, নিত্য লীলা বা সেব্য সেবক ভাবের কার্য্য হইয়া থাকে। এ ভাবে জীবাত্মা এবং পরমাত্মার একীকরণ করিতে ভক্তের ইচ্ছা হয় না। ভাববিশেষের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক ঈশ্বর ও জীব এই অবস্থায় থাকিয়া লীলা-রসামৃত পান করিয়া থাকে। জীব এবং ঈশ্বর, এই ভাবে যদিও দ্বৈতজ্ঞানের কার্য্য হয়, কিন্তু প্রত্যক্ষ দর্শনের সময়ে, সাধকের আর নিজের অস্তিত্ব বোধ থাকিতে পারে না। তাহার মন প্রাণ সেই মূর্ত্তিতে এককালে সংলগ্ন হইয়া যায়। এই অবস্থাটির সহিত পূর্ব্বোল্লিখিত অবস্থার সাদৃশ্য আছে।

পরমহংসদেব এই প্রকার বিবিধ ধর্ম্মের আদি কারণ বহির্গত করিয়াও নিশ্চিন্ত হইলেন না। তাঁহার প্রাণ যারপরনাই উৎসাহিত হইলে তিনি শিখধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। তদনন্তর তিনি অগাধ কৃদ্র ও বিবিধ সম্প্রদায়-ভুক্ত হইয়াছিলেন, তৎসমুদয় আমরা বিশেষ অবগত নহি। হিন্দুমত সামঞ্জস্য করিয়া তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, হিন্দু মুসলমানের প্রভেদ কি? ক্রমে ভাবময়ের এই নব ভাবতরঙ্গ উথলিয়া উঠিল। তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে অমনি তিনি মাতার নিকট মনোভাব নিবেদন করিলেন। ‘করুণাময়ীর অপার করুণা! অকপট ভক্তের মনোরথ কিরূপে পূর্ণ করিতে হয়, দয়াময়ী মা বিনা আর কে জানিবেন? ভক্তের বাসনা যা আপনি প্রেরণ করেন এবং আপনি তাহা পূর্ণ করিবার ব্যবস্থাও করিয়া দেন। পরমহংসদেবের জীবন তাহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত।

পরমহংসদেবের বালকবৎ প্রার্থনা যেমন মাতার শ্রবণবিবরে প্রবিষ্ট হইল, অমনি তিনি সে প্রার্থনা অচিয়াৎ পরিপূর্ণ করিয়া দিলেন।

গোবিন্দ দাস নামক এক ব্যক্তি, জাতিতে কৈবর্ত, দমদমার সন্নিকটে গুপ্ত-ভাবে মহম্মদীয় ধর্মমতে সাধন ভজন করিতেছিলেন। তিনি এই সময়ে পরমহংসদেবের নিকটে আগমন পূর্বক মুসলমানধর্মে দীক্ষা দিয়া তিন দিন যথানিয়মে তাঁহাকে কার্য্য করাইলেন। তিন দিনের পর তাঁহার সে ভাব অপনোত হইয়া গেল। এই দিনত্রয় তিনি কালীর মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই, কালীর প্রসাদ ভক্ষণ করেন নাই এবং তাঁহার ভিতরের হিন্দুভাব পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছিল।

মুসলমানধর্ম সাধন করিয়া তিনি হিন্দুদিগের জ্ঞান এবং ভক্তিমতের সহিত তাহা মিলাইয়া পাইয়াছিলেন। হিন্দুদিগের যে প্রকার সাধনপ্রণালীর অভি-প্রায়, মহম্মদীয়ধর্মে তিনি তদ্রূপ দেখিয়াছিলেন। মহম্মদ বলিয়াছিলেন যে, যে কেহ কাফেরদিগকে সংহার করিতে পারিবে, সে পরকালে কঙ্কলনয়না অপ্সরার সহিত সুখে বাস করিবে। কাফের অর্থে তিনি রিপুদিগকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কারণ, শরীরের মধ্যে রিপুগণই কাফের বা বিজাতীয় ধর্মাবলম্বী, তাহাদের বিনাশ করিলে বা রিপুগণ প্রদমিত হইলে, বিজ্ঞাশক্তির প্রকাশ পায়। বিজ্ঞার সহবাস ব্যতীত মনুষ্যের সুখসুচ্ছন্দতা লাভের দ্বিতীয় উপায় কোথায় ?

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ।

ধর্মবীর পরমহংসদেব যদিও মুসলমানদিগের ধর্মের মধ্য অবগত হইলেন, তথাপি তাঁহার হৃদয় নিশ্চিন্ত হইল না। তাঁহার হৃদয়ে এখনও ক্ষুধা নিহিত ছিল। তিনি একদিন দেবমন্দিরের সন্নিকটে যদুলাল মল্লিকের উদ্যানস্থিত বাটার কোন গৃহে দণ্ডায়মান ছিলেন। সেই স্থানে মেরীর ক্রোড়ে শায়িত বালক যীশুর চিত্রপট ছিল। পরমহংসদেব তাহা জানিতেন না। কিয়ৎকাল পরে তাঁহার মন হইতে পূর্বের ভাব এককালে বহির্গত হইয়া বাইল। তিনি

তদৃষ্টে চিন্তাযুক্ত হইলেন এবং “মা! মা!” বলিয়া ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। পরে যীশুর প্রতিকল্পের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিলেন যে, যীশুর চিত্রপট হইতে জ্যোতিঃ আসিয়া তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিতেছে। তিনি তদনন্তর স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। অক্লান্ত সাধনের জায় যীশুর ভাব তাঁহার তিন দিবস ছিল। তিনি গৃহে বসিয়া বড় বড় গির্জা দেখিতে ও পাদরীদিগের উপদেশ শুনিতে পাইতেন। এ কয়েক দিন তাঁহার মুখে কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম কিছুই নির্গত হয় নাই, অথবা তাঁহাদের কথা মনেও উদ্ভিত হয় নাই। অতঃপর তিনি একখানি যীশুর চিত্রপট আনিয়া গৃহে রাখিয়াছিলেন। উক্ত ছবিখানি অদ্যাপি দক্ষিণেশ্বরে আছে। এই ছবিখানিতে যীশু এই ভাবে চিত্রিত আছেন। কোন সমুদ্রতীরে তিনি ভ্রমণ করিতে-ছিলেন। এমন সময়ে একটি বৃদ্ধ আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “প্রভু! ঈশ্বরকে পাইব কিরূপে?” যীশু এই কথার কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া তাহার হস্ত ধারণ পূর্বক সমুদ্রসলিলে কিয়ৎকাল প্রবেশ করিলেন। বৃদ্ধ অবাক হইয়া পরিণাম চিন্তা করিতে লাগিল। ইত্যবসরে যীশু বৃদ্ধের গ্রীবা ধারণ পূর্বক জলে নিমজ্জিত করিয়া কিয়ৎকাল পরে ছাড়িয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার প্রাণের এখন অবস্থা কিরূপ?” বৃদ্ধ আশ্চর্য্যাবিত হইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে সভয়ে কহিল, “প্রাণ যায়!” যীশু কহিলেন, “ঈশ্বরের বিরহে যখন এইরূপ প্রাণের অবস্থা হইবে, তখনই তাঁহাকে লাভ করিবে।” পরমহংস-দেব একথা প্রথমই প্রাণে প্রাণে নিজে জানিয়াছিলেন এবং সেইরূপ সাধনাও করিয়াছিলেন। প্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনেও অবিকল ঐ প্রকার ভাব লক্ষিত হইয়াছে। তিনি বিরহে কেশোৎপাটন ও মুখমর্ষণ করিতেন। তাঁহার সমাধিকালীন প্রাণের এইরূপ অবস্থার কথা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে। এই সকল কারণে যীশুর মতও মহাকারণে এক বলিয়া মিলাইয়া লইলেন।

পরমহংসদেব বহু আড়ম্বর ভালবাসিতেন না। এক কথায় তাঁহার কার্য্য মিটাইয়া লইতেন। তিনি বলিতেন, “আপনাকে মারিতে হইলে একটি আল-পিন্ কিম্বা একটি বেলকাঁটা হইলেই যথেষ্ট হইবে; কিন্তু অপরকে সংহার করিতে হইলে বড় অস্ত্রের প্রয়োজন। সেইরূপ তত্ত্বকথা নিজের জানিতে ইচ্ছা হইলে এক কথায় জানা যায়। অধিক আড়ম্বর নিম্প্রয়োজন; কিন্তু অপরকে বুঝাইতে হইলে বহু শাস্ত্রীয় যুক্তির আবশ্যক।” তিনি সেইজন্য আরও বলিতেন, “একজ্ঞান জ্ঞান, বহুজ্ঞান অজ্ঞান।” পরমহংসদেবের এবশ্রকার জ্ঞান আপনি

হৃদয়ে সমুদিত হইয়াছিল এবং ইহার পোষকার্য তিনি একটা দৃষ্টান্তও পাইয়াছিলেন। একদা একটা সাধু আসিয়াছিলেন। ঠাকুর কিছা অল্প কোঁচও বস্ত তাঁহার ছিল না। পূজাকালীন তাঁহার কুলির ভিতর হইতে একখানি সুরহা গ্রহ বাহির করিয়া পূজা করিতেন। পরমহংসদেব ঐ গ্রহখানি দেখিয়া নাম দ্বিজ্ঞাসা করায় সাধু উহা রাময়ণ বলিয়া পরিচয় দিলেন। পরমহংসদেবের মনে বিশ্বাস হইল না। তিনি জোর করিয়া গ্রহখানি খুলিয়া দেখিলেন যে, উহার প্রথম পাতে রহং অক্ষরে 'রাম' শব্দটা লেখা আছে। তিনি তৎক্ষণাৎ ভাব বুঝিলেন এবং মহাভাবে নিমগ্ন হইয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন।

যৌগুর সাধনান্তে তাঁহার সকল সাধনই একপ্রকার শেষ হইয়া আসিল। তিনি বৌদ্ধমতে সাধন করিয়াছিলেন কি না, তাহা আমরা শ্রবণ করি নাই, তাঁহার গৃহে প্রস্তরের একটা বুদ্ধ মূর্তি দেখিয়াছি। ইতিপূর্বে পূজা তর্পণাদি সমুদয় বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। তিনি সময়ে সময়ে সমস্ত দিন পুষ্প চরন করিয়া কালীর পূজা করিতেন। একদিন দেখিলেন যে, যৌহার জন্ত পুষ্প সংগ্রহ করা হয়, তাঁহারই শরীর এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। বৃক্ষ সকল ফলফুলে তাঁহার অঙ্গের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। তিনি এই দেখিয়া আপনি হাসিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, “প্রসাদি ফুলে কি ক’রে পূজা করিব।” তদবধি তাঁহার পূজা করা বন্ধ হইয়া গেল।

পরমহংসদেব সাধন কার্য্য হইতে অবসর পাইয়া যখন যেমন অবস্থায় পতিত হইতেন, তখন তিনি সেই ভাবে আনন্দ করিতেন। তিনি কখন সাধুদিগের সহিত সদালাপে সমস্যাতিবাহিত করিতেন এবং কখন বা হরিনামানুত পান করিয়া তাহাতেই বিহ্বল হইতেন এবং হস্তার প্রদানপূর্ব্বক নৃত্য করিতে করিতে মহাভাবে নিমগ্ন হইয়া যাইতেন। কখন বা দেবীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া চামরব্যঞ্জন এবং করতালি দিয়া শক্তিবিশয়ক গান করিতেন। কখন বা রাধাকৃষ্ণের সম্মুখে গমন পূর্ব্বক তাঁহাদের যুগল রসের রসিক হইয়া রসপান করিতেন। কখন বা ‘জয় শিব! জয় শিব!’ বলিয়া সমাধিস্থ হইয়া বসিয়া থাকিতেন। কখন বা ‘কোথায় রাম রঘুবীর!’ বলিয়া আর্জুনাদ করিতেন এবং কখন বা স্বর গ্রামের আরোহণ এবং অবরোহণ হিসাবে ‘রাম রাম রাম’ বলিয়া নাতিয়া উঠিতেন এবং সমস্যাস্তরে হনুমানের দাস্ত্রভাবের আশ্রয় লইয়া ভাবোন্নত হইয়া পড়িতেন। কখন বা বৃন্দাবনের নন্দকিশোর ও রাইকিশোরীর কৈশোরিক ভাবাবলোকন পূর্ব্বক প্রেমানন্দে ভাসিয়া যাইতেন। কখন বা বেদান্ত-স্বত্রের

যত্ন ধরিয়া নিরাকার অদ্বিতীয় ব্রহ্মে মিলিত হইয়া জড় সনাধি প্রাপ্ত হইতেন। কখন বা বোম্বপাড়া, বাউল, নবরসিক ও পঞ্চনামী প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক উপা-লকদিগের সহিত আলেখ, সহজ ও রূপসাগর সম্বন্ধীয় গীত গান করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতেন। কখন বা ‘ব্রহ্মময় জগৎ’ জ্ঞানে বড় ছোট, ভদ্র অভদ্র, ধনী নিধনী, বালক বৃদ্ধ, স্ত্রী পুরুষ সকলকেই প্রণাম করিতেন। কখন বা পিপীলিকাদিগকে চিনি প্রদান করিয়া বেড়াইতেন, কখন বা দুর্বাদলোপরি পাদনিক্ষেপ করিয়া আপনাকে আপনি তিরস্কার করিতেন এবং উহারা পদ-দলিত হইয়া অশেষ ক্রেশ পাইয়াছে, হয় ত কাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চূর্ণ হইয়া গিয়াছে মনে করিয়া রোদন করিতেন এবং অপরাধের নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন। কখন বা উদ্ভিদগণের মধ্যে চৈতন্য বিরাজিত আছেন বলিয়া এত প্রবল ভাবোদয় হইত যে, তিনি একটা পুষ্প কিম্বা পাতা ছিঁড়িতে পারি-তেন না এবং কাহাকেও তাহা কন্ঠিতে দেখিলে, তিনি অতিশয় কাতর হইতেন। তিনি সর্বদা পশুতদিগের সহিত সহবাস করিতেন এবং তাঁহাদের নিকট শাস্ত্রাদি শ্রবণ করিয়া দিন যাপন করিতেন। তিনি কখন বাত্মা, কখন চণ্ডীর গীত এবং কখন বা কীর্ত্তন শ্রবণ করিতেন। এই গীতাদি শ্রবণ করিবার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় হইত, মথুর বাবু সে সকল আনন্দের সহিত বহন করিতেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ ।

ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, পরমহংসদেবের বিবাহের পর আর তাঁহার জীবন সুখাবলোকন করিতে অবসর প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহার স্ত্রী যখন ষোড়শ বর্ষে উপনীত হন, সেই সময় তাঁহার স্বপুত্রালয়ে গমন করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। তাঁহার মনের প্রকৃত ভাব মথুর বাবুকে জানাইয়াছিলেন। তিনি সে সকল কথা শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্য হইরা পড়েন। তদনুসারে নাকি ষোড়শী পূজার বিধি আছে। তিনি তাঁহার স্ত্রীতে সেই কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। মথুর বাবু চেলীর শাড়ী, শঙ্খ এবং অলঙ্কারাদি পূজার ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাকে দেশে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। পরমহংসদেব তাঁহার নিজ বাটীতে না বাইয়া

একেবারে ঋগুরাণ্ডায় গমন করেন । তথায় পৌঁছিয়া তিনি বাটার বহির্ভাগে অবস্থিত না করিয়া অন্তঃপুরের প্রান্তে বাইয়া দণ্ডায়মান হইলেন । তাঁহার স্ত্রী তখন ঐ স্থানে কোন কার্যে নিযুক্ত ছিলেন । সহসা একজন অপরিচিত ব্যক্তি উন্মাদের জায় একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি জননীকে ডাকিয়া বলিলেন, “মা ! দেখ দেখ কে একজন পাগল এসেছে !” তাঁহার জননী গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন । প্রথমে তাঁহার চক্ষু আগন্তুক ব্যক্তিকে চিনিতে পারিল না, কিন্তু প্রাণ ছুঁ করিয়া কাদিয়া উঠিল । যেন বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া পাগলকে ফোড়ে লইতে মন ধাবিত হইল এবং তাঁহাকে সহস্র চুষন করিয়াও যেন প্রাণে তৃপ্তি মানিল না । তাঁহার সহসা চিত্তবিকার ও প্রাণ উচাটন হওয়ায় তিনি ভাবিলেন, এ পাগল কে ? কাহার পাগল ? অমনি তিনি চিনিলেন, অমনি বৎসহারা গাভীর জায় ছুটিয়া আসিয়া “বাবা রে ! এই কি আমার অদৃষ্টে ছিল” বলিয়া, পরমহংসদেবের সম্মুখে আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেলেন । তাঁহার তনয়া অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন । তখন কে যে পাগল, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না ।

পরমহংসদেবের স্ত্রী এতক্ষণে তাঁহার অমূল্য রত্ন চিনিলেন । তখন লজ্জা-দেবী তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া পূর্ণরূপে সেই বদনকান্তি নিরীক্ষণ করিতে দিল না । তিনি অবগুপ্তিতভাবে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন ।

অতঃপর পরমহংসদেব তাঁহার অভিমত পূজাদি ষথানিয়মে সম্পন্ন করিবার সমুদায় আয়োজন করিয়া লইলেন । পূজার সময় তাঁহার স্ত্রীকে আত্মপনা দেওয়া পীড়ার উপরিভাগে দণ্ডায়মান হইতে বলিলেন । তিনি দ্বিরুক্তি করিলেন না । পরমহংসদেব তাঁহার চরণদ্বয়ে নৃত্য বিষপত্রাদি সহ পূজা করিলেন এবং জপ করিবার যে মালা ছিল, তাহাও চিরদিনের মত অঞ্জলি প্রদান করিলেন । তদবধি তাঁহার জপ তপ দুরাইয়া গিয়াছিল ।

পরমহংসদেবের অভিপ্রায় কেহই বুঝিতে পারিল না । তাঁহার ঋগুড়ী ইহাতে ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহাকে কত কি কটুকাটব্য বলিয়াছিলেন । তাঁহার অপরাধ কি ? মায়িক সম্বন্ধ অতি বিভীষিকাপ্রদ, তাহা অস্বাভাবিক হইবার নহে । তিনি না জানাইলে কি প্রকারে জানিবেন যে, সাক্ষাৎ শিব তাঁহার জামাতা ? তাঁহার সৌভাগ্য এত উচ্চ, তাহা কেমন করিয়া তিনি বিশ্বাস করিবেন ? বাহা সমুদায়ের ভাগ্যে ষুগ্ধগুণসত্ত্বেরও কখন কেহ সংশয়িত হইতে দেখে নাই, তাহা তত্ত্বজ্ঞানবিরহিত মায়িক ভাবপ্রধান জীলোকের দ্বন্দ্বের

কেমন করিয়া স্থান পাইবে? বিবাহের পর যদিও তিনি সর্বদা ভুনিতেন যে, তাঁহার রামকৃষ্ণ বাতুলপ্রায় হইয়া কখন কি করেন, কখন কি বলেন, কখন ঠাকুর পূজা করেন এবং কখন আপনি ঠাকুর হইয়া বসেন। যদিও তিনি জানিতেন যে, রামকৃষ্ণের আর পূর্ববৎ জ্ঞান কিছুই নাই, তিনি আপন পর বিচার করিয়া কার্য্য করেন না, স্বদেশের কিস্বা স্ব-সম্পর্কীয় কাহার সহিত সম্বন্ধ রাখেন না এবং কেহ নিকটে যাইলে শিষ্টাচারের অনুরোধ রক্ষাও করেন না। যদিও তিনি বিলক্ষণরূপে অবগত ছিলেন যে, যে বস্তু লইয়া জগৎ সংসার, যাহার ছায়া অবলম্বনপূর্বক ব্যক্তিগণ দেশ বিদেশ গমন করিয়া মস্তকের ঘর্ষ ভূমিতে নিক্ষেপণ দ্বারা অর্ধোপার্জন করে, যাহার ক্রুটিভঙ্গের আতঙ্কে কষ্ট-সঙ্কিত অর্থের সাহায্যে তাহারা তাহার প্রিয়কর দ্রব্য যথাসাধ্য সংগ্রহ করিয়া থাকে, যাহার অন্ততঃ দুটা মৌখিক সুখমাথা কথা শ্রবণ করিয়া শ্রবণবিবর ধন্ত করিবার জন্য তাহারা তরুণযুক্ত প্রস্তুত হইয়া থাকে, যাহার দীর্ঘ প্রবাস জনিত হতাশ হতাশনে তাহাদের হৃদয় ক্ষণে ক্ষণে প্রজ্বলিত হইলে তাহারা আশারূপ ভ্রাম্যচ্ছাদন দ্বারা সদাই সম্তপ্ত করিয়া রাখা, সেই উদ্ভাপ নিবারণের নিমিত্ত তাহারা জলাধিপতির শরণাপন্ন হইয়া অবিরল নেত্রজল বরিষণ করিয়া থাকে ; তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, যদি কখন তিনি দেশে আসেন ও এবন্নিধা জীর মুখাবলোকন করেন, তাহা হইলে তাঁহার আশা মিটিবে। কিন্তু বিধির বিধি বিপরীত হইয়া গেল। জীকে জী বলিয়া ত তিনি স্বীকার করিলেন না! তাঁহাকে মাতৃস্থানে উপবেশন করাইয়া পূজা করিয়া ফেলিলেন! কন্টার এরূপ দুর্দশা দেখিয়া মার প্রাণ কি দিয়া প্রবোধ মানিবে? তিনি তনয়ার সর্বনাশ দেখিয়া দশদিক্ শূন্যময় দেখিলেন। জামাতার সম্মুখে কত্যা উপবিষ্টা রহিয়াছে, জামাতার সহিত কন্টার বাক্যালাপ হইতেছে, তথাপি জামাতা-কন্টায় সম্বন্ধ নাই, একথা কে বুঝিবে এবং কেই বা বুঝাইয়া দিবে? স্মৃতরাং তাঁহার দুঃখ সঙ্গের সঙ্গিনী হইয়া রহিল। পরমহংসদেব বিরুদ্ধিত্তি করিলেন না।

পরমহংসদেবের জীর মনের ভাব বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই। তিনি বোড়শবর্ষে পতিত হইলে কি হইবে, তাঁহার তখনও পর্য্যস্ত কুমারীভাব ছিল। পতি কাহাকে বলে, তাহা তাঁহার সে পর্য্যন্ত জ্ঞান হয় নাই, তন্নিমিত্ত এ ক্ষেত্রে তিনি ভালমন্দ কিছুই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তিনি ত সামান্য স্ত্রী নহেন! বাহার পতি সহস্র সহস্র অনাথ অনাথিনীর পতি, বাহার পতি অশেষ পাতকের পতিতপাবনস্বরূপ, বাহার পতি ব্রহ্মাণ্ডপতির হৃদয়মণি,

তাঁহার পত্নী কি সাধারণ ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র পশুপ্রকৃতিবিশিষ্ট হইতে পারেন ? শাস্ত্রে বলে, পুত্রের জন্ম জ্ঞী পুরুষের প্রয়োজন। মা গো ! তুমি হৈসহস্র সহস্র পুত্র কন্তার জননী ! তোমাকে কি মা কুকুর শৃগালের অবস্থায় পতিভ হইয়া মা হইতে হইবে ? তখন মাতা হয় ত তাহা বুঝিতে না পারিয়া থাকিবেন ; কিন্তু তাঁহার মনে কিছা প্রাণে পতির আভাস জনিত কিছুমাত্র ভাবান্তর হয় নাই। তদনন্তর পরমহংসদেব পুনরায় দক্ষিণেখরে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ।

—*—

সাধন ভজন একপ্রকার সমাপন করিয়া পরমহংসদেব (তাঁহার এ নামটী আর পরিবর্তিত হয় নাই) কিছুদিন মথুর বাবুর সহিত আনন্দে দিন যাপন করিয়াছিলেন। তিনি সৰ্বদাই ঈশ্বরের শক্তি ও তাঁহার অলৌকিক কার্য্য সম্বন্ধে নানাপ্রকার উপদেশ দিতেন। একদিন কথায় কথায় মথুর বাবু কহিলেন যে, “বাবা ! ঈশ্বরের সকলই অলৌকিক, তাঁহার বিরুদ্ধে কে কথা কহিতে পারে ? কিন্তু তিনি যাহা একবার করিয়াছেন, তাহা আর পরিবর্তন করিতে পারেন না। যেমন মনুষ্য সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত সে নিয়মের আর পরিবর্তন হইল না। এই দেখুন জবা ফুল। যে গাছে লাল ফুল হয়, তাহাতে লাল ব্যতীত সাদা ফুল কখনই হইতে পারে না।” পরমহংসদেব বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “তোমাদের এমন স্থূল বুদ্ধি না হইলেই বা এত দুর্দশা ঘটিবে কেন ? যে ঈশ্বরের অপার মহিমা, অনন্ত শক্তি, তাঁহার কার্য্যের গভীরতা স্থির করিতে মনুষ্যবুদ্ধি একেবারে অপারক কইয়া গিয়াছে, তাঁহার শক্তি লইয়া বিচার করিতে যাওয়া যারপরনাই নির্ভোধের কর্ম্ম। বল দেখি, সমুদ্রে কত জল ও তাহার ভিতরে কি আছে এবং কি নাই ?” এই প্রকার বিচারে মথুর বাবুর বিশেষ কোন দোষ হয় নাই। যদিও তখন থেকেই এ প্রদেশে ঊনবিংশ শতাব্দির ঢেউ লাগিতে আরম্ভ হইয়াছিল, যদিও তখন থেকেই পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক শিক্ষার ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছিল, তথাপি তখনও এ প্রদেশে প্রাচীন কুসংস্কার ঈশ্বরে বিশ্বাস করা, একেবারে বিলুপ্ত

হইয়া যায় নাই। যদিও তখন থেকেই লোকেরা জড়বিজ্ঞানের আলোক, পাইল্ল^১ স্কুলের স্কুল-কার্য-কলাপ অবলোকন করিয়া চমৎকৃত হইয়াছিল, তথাপি তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি সমূহরূপে ছিল; সেই জন্ত মথুরাবাবু পরমহংসদেবের কথায় আর প্রত্যুত্তর দিতে পারিলেন না। পরমহংসদেব যে কথা মথুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যুত্তর দেওয়া মথুরের বিজ্ঞা বুদ্ধিতে তখন সংকুলান হয় নাই বটে, কিন্তু ঐ প্রশ্ন যত্বপি অল্প একজন প্রকৃত ইংরাজীবিজ্ঞানবিদ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা যায়, তিনিও মাথা চুলকাইয়া একজন মূর্খের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিবেন, তাহার সন্দেহ নাই।

পরদিন প্রাতঃকালে পরমহংসদেব গঙ্গাতীরে পাদচারণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন যে, একটা লাল জবা ফুলের গাছে এক বোঁটায় একটা লাল আর একটা সাদা ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ মথুরাবাবুকে ডাকাইয়া দেখাইলেন এবং বলিলেন, “ঈশ্বর যাহা মনে করেন, তাহাই করিতে পারেন, এই জন্তই তিনি ঈশ্বর। মনুষ্যেরা আপনার ওজনে ঈশ্বরকে দেখিতে চায়, আপনার শক্তির দৌড় হিসাব করিয়া ঈশ্বরের শক্তির ইতর বিশেষ করিয়া থাকে। তুমি কখন তাঁহার শক্তির প্রতি তিলার্দ্ধ সন্দেহ করিও না, বা কার্য দেখিয়া কারণ নিরূপণ করিতে অগ্রসর হইও না।” মথুরাবাবু অবাক হইয়া রহিলেন। কিন্তু ধন্য পাশ্চাত্য শিক্ষা! ধন্য ইংরাজ বাহাদুর! ধন্য তোমাদের ইংরাজী শিক্ষার ফল! চক্ষে দেখিলে, কর্ণে শুনিলে, হস্তে স্পর্শ করিলে, যে বস্তু তোমরা দেখ নাই, তাহা আমাদের ধর্মসম্বলিত বা সাধু মহাত্মা কর্তৃক প্রদর্শিত হইলে, কোন মতে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে নাই বলিয়া যে গুরুমন্ত্র প্রদান করিয়াছ, তাহার অধিকার অতিক্রম করিয়া যাইবে কে? মথুরাবাবু কিয়ৎকাল চূপ করিয়া রহিলেন। পরে তাঁহার মনে হইল, হয়ত পরমহংসদেব দুইটা ফুল এক বোঁটায় কোন কৌশলে সংলগ্ন করিয়া দিয়া একটা বুজরুকী দেখাইতেছেন। তিনি এই কথা মনে করিয়া তন্ন তন্ন পূর্বক উহা পরীক্ষা করিয়া লইলেন। তাঁহার বিজ্ঞা বুদ্ধি পরাজিত হইল। “তখন কোনদিকে পলাইতে না পারিয়া বলিলেন, “বাবা! ঈশ্বরের মহিমা কি এ তোমারই মহিমা!”*

একদিন জানবাজারের বাটীতে পরমহংসদেব, মথুরাবাবু এবং তাঁহার

* মথুরাবাবুর এ কথা বলিবার বিশেষ ভাব ছিল। তিনি নাকি ইতিপূর্বে পরমহংসদেবকে তাঁহার ইষ্টমূর্তিরূপে দর্শন করিয়াছিলেন।

স্রী একত্রে উপবেশন করিয়া আছেন, এমন সময়ে তীর্থাদি সম্বন্ধে কুথোপ-
কথন আরম্ভ হইল। নানান্নিধ মতামতের দ্বারা তীর্থযাত্রা ভাল *কিছা
মন্দ বিচার হইবারে পর মথুর বাবুর স্রী কাশী রন্দাবনাদি ভ্রমণ করিবার
জ্ঞা মনের সাধ ব্যক্ত করিলেন। মথুর বাবু তাহাতে অসম্মত হইয়া বলিলেন
যে, “অনর্থক অর্থ ব্যয় এবং শারীরিক ক্লেশ ইচ্ছা করিয়া ডাকিয়া আনিবার
প্রয়োজন কি ? ঠাকুর সম্মুখে রহিয়াছেন, আবার ঠাকুর দেখিবে কি ?”
পরমহংসদেব এ কথা প্রতিবাদ করিয়া পূর্বপ্রচলিত প্রথা কাহারও রহিত
করিবার অধিকার নাই বলিয়া মথুর বাবুর স্রীর মত সমর্থন করিলেন।
মথুর বাবুর স্রীর আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি তীর্থে গমন করিবেন
বলিয়া তখন সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিলেন। মথুর বাবু কহিলেন, “যত্নপি
বাবা গমন করেন, তাহা হইলে আমি যাইব, নতুবা তোমাকে একাকী যাইতে
হইবে।” পরমহংসদেব তাহা স্বীকার করিলেন।

অতঃপর শুভদিনে শুভরূপে মথুর বাবু সঙ্গীক পরমহংসদেবের সহিত অতি
সমারোহে তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইলেন। তিনি পরমহংসদেবের সেবার
নিমিত্ত পূর্বোন্নিখিত হৃদয়কে সমভিব্যাহারে রাখিয়াছিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

কাশীধামে উপস্থিত হইয়া পরমহংসদেব কাশীনাথ ও অন্নপূর্ণা দর্শন
করিলেন। দর্শন কথাটা প্রয়োগ হইল বটে। কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে দেবদেবী
দর্শন করা প্রায় ঘটিয়া উঠিত না। কখন ঠাকুরের নাম শ্রবণ করিয়াই
তাঁহার ভাবাবেশ হইয়া যাইত, তখন ধরাধরি করিয়া তাঁহার জড়বৎ
দেহটাকে লইয়া গিয়া ঠাকুরের সম্মুখে সংস্থাপিত করা হইত। কখন বা
মন্দিরের নিকট পৌঁছিবামাত্র আপনাকে আপনি হারাইয়া ফেলিতেন এবং
কখন বা ঠাকুরের নিকট পর্য্যন্ত যাইতে পারিতেন। ফলে, সাধারণ
লোকেরা যে প্রকারে প্রাণ ভরিয়া ঠাকুর দর্শন করে, সে প্রকার দর্শন
পরমহংসদেবের কখনই ভাল করিয়া ঘটে নাই। তথাপি ঠাকুর দর্শন করি-
বার আড়ম্বর পূর্ণ যাত্রায় হইত। তিনি কি দেখিতেন, কি বুঝিতেন এবং
তাঁহার প্রাণেই বা কি হইত, অথবা বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া অন্তর্দৃষ্টিতে কি

দেখিতেন, তাহা আমরা স্থলদ্রষ্টা কি করিয়া অনুমান করিতে পারিব ? কালীর লোকেরাও আশ্চর্য্য মানিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ক্ষণে ক্ষণে মানুষটী অচেতন হইতেছেন এবং ক্ষণে ক্ষণে আবার বীরভাবে আনন্দ-মুচক গান করিতেছেন, সাধুর জ্ঞায় পরিচ্ছদাদি * নাই, কোন সাম্প্রদায়িক লক্ষণ দ্বারাও লক্ষিত নহেন এবং সঙ্গে একজন বিশেষ ধনী ব্যক্তি, এমন ব্যক্তি কে ? ইত্যাকার নানাবিধ লোকে নানাবিধ তর্ক বিতর্ক করিত। তাহার কালীবাসী, বিখেখরের রাজ্যে বাস করে বটে, কিন্তু সেকাল আর নাই। কালপ্রভাবে কালীর লোকেরাও সাধু চিনিলা না। চিনিবে কি ? স্থল দৃষ্টি হ'লো কালধর্ম্ম। কালীতে দেখে কেবল দণ্ডী আর মাথা ছাড়া পরমহংস। শোনে কেবল দর্শন শাস্ত্রের বাক্‌বিতণ্ডা, আত্মগরিমা এবং কর্ম্মকাণ্ডের মোটা মোটা কথাগুলি। তাহাদের অন্তদৃষ্টি নাই—চিনিবে কিরূপে ? পাণ্ডারাও তজ্জপ। তাঁহাদের কথা গণনার বহির্ভূত। বিশ্বনাথ যাহাদের ব্যবসা, তাঁহাদের কথা কাহার সহিত তুলনা হইতে পারে না। পরমহংস-দেবের কালী যাত্রায় কোন ব্যক্তির তদ্বপন্থের কোনরূপ সুবিধা হয় নাই, কিন্তু তাঁহার দ্বারা অর্থব্যয়িত বিশেষ উপকার অনেকেরই হইয়াছিল। মথুর বাবু, যেমন ধনী লোকের নিয়ম, জুখাকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে কিছু দান করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে পর, তাহা কিরূপে প্রদান করিতে হইবে, পরমহংসদেব ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। প্রত্যেক পরিবারের বালক বালিকা বৃদ্ধ বৃদ্ধা, যুবক যুবতী, যতগুলি পরিজন ছিল, গণনা করিয়া প্রত্যেককে এক টাকার হিসাবে প্রদান করিতে বলিয়াছিলেন। মথুর বাবু তাহাতে দ্বিগুণিত করেন নাই। তদনন্তর তিনি ত্রৈলোক্যস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিশেষ স্মৃষ্টি হইয়া কালী হইতে বৃন্দাবনে গমন করেন। এ স্থানে পৌঁছিয়া তিনি দেবাদি দর্শন করণান্তর স্থানবিশেষে বিশেষপ্রকার গুজাদি দেওয়াইয়া বন-পরিক্রম সমাধা করেন। এই স্থানে তিনি গুপ্তভাবে বৈষ্ণবমতে ভেদ ধারণ করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনে বাইয়াও তিনি কালীর জ্ঞায় বিফল

* পরমহংসদেবকে কখন সাধুর বেশভূষায় লোকসমাজে অথবা তাঁহার বাসস্থানে দেখিতে পাওয়া বাইত না। যখন তিনি যে যে সাধন করিয়াছিলেন, তখন সেই সেই পন্থানুসারে বেশ ভূষা করিতেন, তাহার পর আর সে সকল পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেন না। তিনি অধিক দিন একখানি মোটা চাদর গায়ে দিয়াই কাটাইয়াছিলেন, পরে বস্ত্র পরিধান করিতেন যাত্র। সর্ব্বশেষে ভক্তদিগের কথায় শিরাগাদিও ব্যবহার করিয়াছিলেন।

দ্বনোরথ হইয়াছিলেন। তথায় প্রকৃত ঈশ্বরানুরাগী একটি ব্যক্তিরও সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হন নাই। পরমহংসদেব একদিন আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, “বৃন্দাবনে আসিয়া কি করিলাম? সেখানে (দক্ষিণেশ্বরে) যেমন তেঁতুল গাছটী, এখানকার তেঁতুল গাছও তেমন, সেখানকার পক্ষীগুলি যেমন, এখানকার পক্ষীরাও তেমন, সেখানকার রাধাকৃষ্ণ যেমন, এখানকার রাধাকৃষ্ণও তেমন, সেখানকার মানুষগুলো যেমন, এখানকার মানুষগুলোও তেমন। তবে কি জন্তু এত দূর আসিলাম?”

পরমহংসদেব বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন যে, বৃন্দাবনে যাইয়া শান্তোক্ত বৃন্দাবন দেখিবেন, সেই গোপ গোপীর নিকাম প্রেমতরঙ্গের রঙ্গ দেখিবেন; এখন যে, সকল ধর্মসম্প্রদায় চিনেবাজারের দোকানদার হইয়া পড়িয়াছে, তাহা তিনি যেন জানিয়াও জানেন নাই। যে বৃন্দাবনে নিকাম ধর্মের খেলা, আজ সেই বৃন্দাবনে সকাম ব্রতের জীবন্তপ্রোত প্রবাহিত হইতেছে! মুখে রাধাকৃষ্ণ, হৃদয় কপটতায় পরিপূর্ণ! শ্রীবৃন্দাবনের এইরূপ দশা দেখিয়াই পরমহংসদেব আক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে কেহই চিনিতে পারিল না। কিন্তু বৃন্দাবন বাস্তবিক শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াস্থল, প্রেমময়ী রাধা যে স্থানের অধীশ্বরী, তথায় যে প্রেমিক প্রেমিকা একেবারে পরিশূন্য হইবে, তাহা কদাপি হইবার নহে। যেমন এক ত্রৈলোক্যস্বামী কাশীর মর্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন, তেমনি বৃন্দাবনেও পরমহংসদেবের সহিত অচিরাতঃ এক অপূর্ণ সন্মিলন হইয়াছিল। বৃন্দাবন প্রকৃতিগত প্রকৃতিবিশেষ, সে স্থানে পুরুষ কি প্রকারে প্রকৃতিভাব লাভ করিবে? ওষ্ঠলোম ফেলিয়া বামারূপ ধরিলেই কি প্রকৃতি হইতে পারে? এই নিমিত্ত প্রকৃতিবেশধারী প্রকৃতিবিশিষ্ট বৃন্দাবনবাসীদিগের সহবাসে পরমহংসদেব স্মৃধী হইতে পারেন নাই। অতঃপর তিনি একদিন নিধুবনে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন, তথায় গঙ্গামাতা নায়ী এক অতি প্রাচীনার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়; পরমহংসদেবকে দর্শন করিবামাত্র গঙ্গামাতার আনন্দসিদ্ধি উৎখলিয়া উঠিল। তিনি “আরে! দুলালী! * দুলালী!” বলিয়া প্রেমালিঙ্গন করিলেন।

পরমহংসদেব তখন বাহুচৈতন্ত হারাইয়াছিলেন। গঙ্গামাতার অপূর্ণ ভাবাবেশ দর্শন পূর্বক আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন। তাঁহার নয়নযুগল হইতে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে দুলালী বলিয়া উঠিতে

লাগিলেন। বোধ হইল যেন কি বলিবেন, কিন্তু অপরিমিত আনন্দ হইলে, যেমন থাক্‌রোধ হইয়া যায়, তাঁহার তদবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি কেবল ঐকদৃষ্টিতে পরমহংসদেবের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। এইরূপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে পর পরমহংসদেব পূৰ্ণ প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং উভয়ে ঠারে ঠারে নানা প্রকার কথা কহিলেন। সে সকল কথার ভাব কেহই বুঝিতে পারে নাই।

গঙ্গামাতা স্বহস্তে আহাৰাদি প্রস্তুত করিয়া পরমহংসদেবকে ভোজন করাইতেন এবং সৰ্বদাই তত্ত্বপ্রসঙ্গে দিন যাপন করিতেন।

বৃন্দাবন হইতে যখন পরমহংসদেব প্রত্যাগমন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, গঙ্গামাতা বিষাদিত হইয়া নানাবিধ প্রতিবন্ধক জন্মাইতে লাগিলেন। তিনি রোদন করিয়া বলিলেন, “আরে ছালালী! বৃন্দাবন যে তোৰ থাকিবার স্থান। ব্রজবালাদিগেরও বৃন্দাবন বাসীত আর স্থান নাই। আমি বৃন্দাবনে বাস করিয়া রহিয়াছি, কেন রহিয়াছি, তাকি তুই জানিস্নে? যদি দাসী ব’লে মনে হ’য়েছে, যদি দয়া ক’রে দেখা দিলি, তবে আর কেন আমায় বিরহানলে দগ্ধ করবি? হাঁসারে! আশায় কত দিন প্রাণ বাচে? বরং আশা থাকিলে তাহাতে প্রাণ ঝাটিলেও বাচিতে পারে। কিন্তু মিলনের পর বিরহ যে কি অসহ্যঃ, ছালালী! তা কি তুই জানিস্নে? আমি এতদিন কেবল ভাবে প্রাণ ধারণ ক’রেছি। মনে করিতাম, এই বৃন্দাবনে একদিন আমার কমলিনী কদম্ব-মূলে—কোন্ কদম্বটী তা জানি না—কানাইয়ার সহিত বিহার করিয়া গিয়াছেন, কদম্ব বৃক্ষ চারিদিকে দেখিতে পাই; কিন্তু কোথাও আমার নন্দকিশোর-রাই কিশোরীকে দেখিতে পাই নাই! আমাদের সেই যুগলরূপ কৈ? যখন বিপিন প্রান্তে, প্রান্তরে নবদুর্কাদল ঘনীভূত হইয়া রহিয়াছে দেখিতে পাই, তখন মনে হয় কোথায় সে গোপাল! সে গোপালগণ কোথায়! কোথায় সে গোপাল বৎসগণ! আবার যখন ঐ মাঠে গো পাল বিচরণ করিয়া বেড়ায়, তাহাদের দেখিয়া আমার পূৰ্ব্বকথা স্মরণ হইয়া নয়নে জলধারা বহিয়া যায়। মনে হয়, সখি! আমাদের গোপাল এক সময়ে ঐ রূপে গো পাল লইয়া বেড়াইত। তখন মা বশোদার সাজানবেশ মনে উদ্ভিত হইয়া আমায় আপনহারা করিত! গোপালের মাথায় চূড়া, নাসায় তিলক, ললাটে ও কপোলদেশে অলকাবিন্দু সকল যেমন শরদাকাশের নিশার তারকারাজি সদৃশ দেখাইত! তাহার ওষ্ঠাধরে গজমতি। আহা! কি স্নমধুর মৃদু হাস! হাস্যচ্ছটায় মনপ্রাণ

বিশোহিত হইয়া যাইত ! মরি ! মরি ! কিবা ভ্রতঙ্গী, সে আড়নরনের চাউনি মনে হ'লে কোন্ কুলবালা কুলশীলে জলাঞ্জলি না দিয়া স্থির থাকিতে পারে ? যে ভাল তার কি সকলই ভাল—ভাল কিসে ? অমন নির্ভর কি আর আছে ? কুলের কুল-বধূর কুল ভাঙ্গিয়া তাহাদের পথের ভিখারিণী করিয়া শেষে হুকুল নষ্ট করিবার অমন গুরুমহাশয় আর কি দ্বিতীয় আছে ? সখি ! ঐ দেখ সেই যমুনা, যে যমুনাকূলে ব্রজ-কুলবালা কুলশীল ভুলিয়া গোকুলচন্দ্রের বদনবিনিঃসৃত স্তমধুর বংশীধ্বনি-স্বরূপ অমৃতধারা শ্রবণপথে ঢালিবার জন্য একত্রিত হইত ; যে যমুনাতীরে একদিন নন্দহুলাল গোপাঙ্গনাদিগের বস্ত্রহরণ করিয়া রক্ষাধায় লুপ্তায়িত ছিল ; সে রক্ষ আছে, সে যমুনাট আছে, কিন্তু সে চোর কৈ ? তাকে কেন দেখিতে পাই না ? যে যমুনাগুলিনে আমাদের কমলিনী কনক-লতিকা শ্রাম-কদম্ব-ত্রিষ্ট হইয়া যে দিন ধূলায় ধূসরিত হইলে, সখীদিগের রোদন স্বরের সহিত 'হা কৃষ্ণ ! হা কৃষ্ণ !' স্বর সমস্বরে ধ্বনিত হইয়াছিল, সে সখীরাই বা কোথায় ? আর সেই ব্রজেশ্বরীই বা কোথায় ? সে কুঞ্জবন আর নাই ! এখন সকলই নিবিড় বন ! বন্দাবনে বাস করি, কিন্তু মনের সাথে কথা কহিবার কেহই নাই । তাই বলি, আরে হুলালী ! তুই কোথায় আমায় ফেলিয়া পলায়ন করুবি ?" এই বলিয়া গঙ্গামাতা পরমহংসদেবের হস্ত ধারণ করিলেন । পরমহংসদেব এতক্ষণ ভাবাবেশে ছিলেন । গঙ্গামাতা যে সকল কথা কহিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছিল কি না বলা যায় না । পরমহংসদেবের ভাবাবেশ সাম্য হইলে, তিনি গমনোত্ত হইলেন । গঙ্গামাতা কোন মতে হস্ত ছাড়িলেন না । হৃদয় নিকটে দণ্ডায়মান ছিলেন । গঙ্গামাতার আগ্রহ দেখিয়া তিনিও পরমহংসদেবের আর একটা হস্ত ধারণ করিয়া হইতে চলিয়া আসিবার জন্য বার বার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে লাগিলেন । একদিকে গঙ্গামাতা, অপরদিকে হৃদয় পরমহংসদেবের হস্ত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন । পরমহংসদেব তখন রোদন আরম্ভ করিলেন । তাঁহাকে দুঃখিত হইতে দেখিয়া গঙ্গামাতা লজ্জিতা হইয়া ছাড়িয়া দিলেন এবং কৃতজ্ঞলিপুটে আশীর্বাদ প্রার্থনা করিলেন । পরমহংসদেব অভয় দিয়া তথা হইতে কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলেন । গঙ্গামাতা তৎপরে বন্দাবনের নিকট বর্ষণ নামক স্থানে বাস করিয়া কয়েক বৎসর হইল দেহত্যাগ করিয়াছেন ।

পশ্চিমধ্যে কোনস্থানে কতকগুলি পার্শ্বতীয় অসত্য নরনারী একটা প্রান্তরে বাস করিতেছিল । তাহাদের পরিধেয় বিশেষ কোনপ্রকার বস্ত্র ছিল না।

ধাকিবার আবাসস্থান বৃক্ষতল, আহার বোধ হয়, কখন হয় এবং কখন অনাহারেই থাকিতে হয় । তাহাদের মলিন বেশ, মলিন অবস্থা দেখিয়া পরমহংসদেব রোদন করিয়া বলিলেন, “মা ! তোমার সংসারে এমন দুঃখীও আছে ? তুমি না মা দয়াময়ী, দুঃখবারিণী ? তোমার এমন ভেদাভেদ কেন মা ? কেহ তোমার রূপায় অতুল ঐশ্বৰ্য্যের অধিপতি হইয়া রহিয়াছে । আবার কেহ কি জগৎ দারিদ্র্যের চরমদশায় পতিত হইয়া রোদন করিয়া দিন যাপন করিতেছে ? মা ! এ কি তোমার লীলা ? কেহ মা তোমার প্রসাদে হিরণ্ময় চাকটিকা প্রাসাদে বাস করিয়া দেহের স্বচ্ছন্দতা লাভ করিতেছে এবং কাহাকে একখানি তালবৃন্তনির্মিত কুটীরাভাবে বৃক্ষতলে শয়ন করিতে হইতেছে ? কেহ মা তোমার সংসারে অমৃতবৎ পদার্থ আহার করিতে না পারিয়া কুকুর বিড়ালকে দিতেছে ; এবং কেহ মা আহার বিহনে অনাহারে দিন যাপন করিতেছে ! কেহ গাড়ী ঘোড়ায় গমনাগমন করিতেও ক্লেশাভূতব করিয়া থাকে এবং কেহ মধ্যাহ্নের তপন তাপে, বৃষ্টিধারায় ভিজিয়া ও বাতাসাতে আহত হইয়া, পদব্রজে মস্তকে মোট লইয়া গমন করিতেছে ! মা ! তোমার খেলা তোমাকেই সাজে । রামপ্রসাদ ঠিক বলিয়াছে । কাহার দুখে চিনি এবং কাহার শাকে বালি । মা ! সে কি তোমার পাকা ধানে মৈ দিয়াছে ?”

পরমহংসদেবকে রোদন করিতে দেখিয়া মথুর বাবু নানাপ্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই শুনিলেন না । তদনন্তর তিনি কহিতে লাগিলেন, “দেখ মথুর ! এই অনাথা, আশ্রমবিহীন দীন দরিদ্রদিগকে উত্তমরূপে অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করাইয়া ভোজন করাও এবং প্রত্যেককে একখানি বস্ত্র প্রদান কর ।” মথুর বাবু এই কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, “বাবা ! তোমার দয়াদ্রি হৃদয়, সকলকেই সমজ্ঞান কর ; দুঃখী দেখিলে তোমার প্রাণ ব্যাকুলিত হইয়া উঠে, সেই জগৎ হীনাবস্থার ব্যক্তি দেখিলে তুমি কাতুর হইয়া থাক । কিন্তু বাবা ! অর্থ কাহাকে বলে তোমার জ্ঞান নাই । আমার এমন কি সঙ্গতি আছে যে, সকল দুঃখীর দুঃখ বিমোচন করিতে পারি ?” ইহাকেই বিষয়ের আসক্তি বলে । পরমহংসদেবই তন্নিমিত্ত বার বার কাঞ্চন অর্থাৎ বিষয়কে অকিঞ্চিংকর জ্ঞান করিবার নিমিত্ত ভূরি ভূরি উপদেশ দিয়াছিলেন । মথুর বাবু বিপুল সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়া এবং তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াও বিষয়ের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন ।

সে যাহা হউক, তিনি অবশেষে পরমহংসদেবের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিতে

বাধা হইয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে বস্ত্র আনাওয়া ঐ দরিদ্রদিগকে এক এক খণ্ড করিয়া বস্ত্র দান করা হইয়াছিল এবং এক সপ্তাহকাল, অতি আড়ম্বরের সহিত উহাদিগকে চাভুর্কিধানে ভোজনাদি করান হইয়াছিল। তথা, হইতে আসিবার সময় পরমহংসদেবের আজ্ঞায় পুনরায় উহাদের প্রত্যেককে একটা করিয়া সিকি দেওয়া হইয়াছিল।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ ।

পরমহংসদেব দক্ষিণেখরে আবদ্ধ থাকিতেন না, তিনি সময়ে সময়ে নানা-স্থানে গমন করিতেন। একদা আদি ব্রাহ্মসমাজের উপদেশপদ্ধতি দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। সেই সময়ে বাবু কেশবচন্দ্র সেন ঐ সমাজভুক্ত ছিলেন। পরমহংসদেব তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, সকলেই উপাসনায় নিযুক্ত রহিয়াছেন, তিনিও ধীরভাবে উপবেশন করিয়া উপাসনায় যোগ দিয়াছিলেন। উপাসনান্তে পরমহংসদেব মথুর বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, “কেবল ঐ তরুণ যুবকটির ফাত্না * নড়িতেছে, অবশিষ্ট ব্যক্তিদিগের এখন পর্য্যাপ্ত।” কিছুই হয় নাই। উহার কপট ধ্যান করিতেছে।” কলিকাতার অন্তঃপাতী কলুটোলা নামক স্থানে চৈতন্ত-সভা নামক একটি সভা ছিল। তথাকার সভ্যরা চৈতন্তদেবের আসন মধ্যস্থানে স্থাপন পূর্বক চতুর্দিক পরিবেষ্টন করিয়া সঙ্কীর্ণ করিতেন। পরমহংসদেব সেই সভায় গমন পূর্বক ভাবাবেশে চৈতন্ত-আসনে উপবেশন করিয়াছিলেন। কেহ কেহ এই ব্যাপার দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন, কেহ বা তাঁহাকে প্রবঞ্চক, কপটী, চৈতন্তদেবের ভাব অন্ধকরণ পূর্বক আপনাকে অবতাররূপে প্রকটিত করিতেছেন বলিয়া, অভিযোগ করিতে লাগিলেন। যাহারা মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহারা ক্রমে ক্রমে মহাভাবের লক্ষণ পরম্পরা দর্শন করিয়া জীবন এবং মরণের সার্থকতা বোধ করিতে লাগিলেন। এই ঘটনায় বৈষ্ণবমণ্ডলীর মধ্যে একটা বিশেষ গোল-যোগ উপস্থিত হইয়াছিল।

* মনের সহিত ফাত্নার তুলনা দেওয়া হইয়াছে। এখানে প্রাণরূপ কাঁটায়, নাররূপ টোপে, ভক্তিরূপ চার দ্বারা ঐশ্বররূপ মীন টোপ ধরিলে মন ফাত্না নড়িয়া থাকে।

সেই সময়ে কাল্নায় বৈষ্ণবকুলগৌরব পরম ভাগবত শ্রীমৎ ভগবান্ দাস বাবাজীর নিবাস ছিল। তাঁহার ইতিবৃত্ত শ্রবণ করিলে, কেবল আশ্চর্য্য নহে, নির্দীপ্ত ও বুদ্ধিব্রষ্ট হইয়া যাইতে হয়। তাঁহার বৃত্তান্ত তদন্ত করিলে, তাঁহাকে শান্ত, দান্ত, মহান্ত বলিলেও তাঁহার গুণের অন্ত করা হয় না। কারণ, সকলের প্রমুখ্যৎ খ্যাত আছে যে, তাঁহার বয়ঃক্রম নিরূপণ হওয়া কাহার সামর্থ্যে সংকুলান হয় নাই। বাহার মনে যেমন হইত, সে তাঁহার বয়ঃক্রম সম্বন্ধে তদ্রূপ বলিত। তাঁহার উঠিবার শক্তি ছিল না, কিন্তু সঙ্কীর্ণনাদিতে মত্ত-মাতঙ্গের ঞ্চায় নৃত্য করিতে পারিতেন। তাঁহার বিশেষ কি ভাব ছিল, তাহা জ্ঞাত হওয়া যায় না, কিন্তু একজন প্রেমিক ভক্ত ছিলেন বলিয়া বিখ্যাত আছেন। পরমহংসদেব কর্তৃক চৈতন্ত-আসন গৃহীত হইয়াছে শুনিয়া ভগবান্ দাস বাবাজী যারপরনাই কুপিত হইয়া যথোচিত তিরস্কার করিয়াছিলেন। কিয়দ্বিবস পরে পরমহংসদেব মথুরা-কবুর সহিত নৌকাপথে ভ্রমণ করিতে করিতে কাল্নায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় গমন করিয়া পরমহংসদেব হৃদয়ের সহিত উক্ত বাবাজীর আশ্রমে সমাগত হইলেন। বাবাজীর বয়ো-বুদ্ধিবিধায় দৃষ্টিহানি হইয়াছিল, তন্নিমিত্ত কাহাকেও সহসা চিনিতে পারিতেন না। তিনি নয়নে দেখিতে পাইতেন না বটে, কিন্তু সাধনপ্রভাবে সকলই বুঝিতে পারিতেন। পরমহংসদেব তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইবামাত্র বাবাজী বলিয়া উঠিলেন, “কোন্ মহাপুরুষ দোনের প্রতি দয়া করিয়া কুটীরে চরণ-ধূলি প্রদান করিলেন?” এই কথা বলিতেছেন, এমন সময়ে পরমহংসদেব তাঁহার সম্মুখে যাইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। বাবাজী অমনই চরণ ধারণ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, “আজ আমি কৃতার্থ হইলাম! প্রভু! আমায় হীন শক্তিবিহীন কাল্জাল জানিয়া দয়াপরবশে নিজ উদারতা গুণে দর্শন দিয়া চির আশা সম্পূর্ণ করিলেন। আমি অতি অপবিত্র, নরাধম, মহাপাপী। কেন না আমি আপনি ভীর্ণ পর্য্যটন কিম্বা সাধু দর্শন করিতে অশক্ত হইয়া একস্থানে পিণ্ডাকারে পতিত রহিয়াছি। কিন্তু দয়ার সাগর ভগবান্, ভগবান্ দাসের প্রতি বুকিলাম এতদিন পরে সুপ্রসন্ন হইয়াছেন! আজ সাধুপদধূলিতে আমি পবিত্র, আশ্রম পবিত্র এবং দেশও পবিত্র হইল। এমন সুহৃৎ পদার্থ সর্ব্বত্র অপ্রাপ্ত। বাঁহাদের মধ্যে ব্রহ্মভেজ বিরাজ করিতেছেন, বাঁহাদের হৃদয়ে জগতের আনন্দ-বিধাতা শ্রীকৃষ্ণ বিহার করিতেছেন, বাঁহারা হৃদি-স্থন্দাবনে নিত্য রাসলীলা দর্শন করিয়া রসিকশেখরের চরম প্রেম আবাদন করিতেছেন,

ধাঁহার। সৃজিত হইয়া সৃষ্টিকর্তাকে আপন হৃদয়পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছেন, তাঁহারাই সকলের পূজ্য এবং সকলের ঐশ্বর্য্য। বাবাজী পরমহংসদেবের মহাভাবের অবস্থা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। মহাভাব কথার কথা নহে, সহজে সাধনসাপেক্ষ নহে। যাহা জীবে কদাচ প্রকাশিত হইবার নহে, যাহার দৃষ্টান্ত এক মহাপ্রভু ত্রীচৈতন্য ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ দেখে নাই, তাহা কেমন করিয়া মনুষ্যবুদ্ধি অনায়াসে অনুমান করিতে পারিবে? বাবাজী পণ্ডিত না হইলেও সাধক ছিলেন, বিশেষতঃ বৈষ্ণব শ্রেণী-ভুক্ত তাঁহার মহাভাব অবশ্যই জানা ছিল। তিনি পর্য্যায়ক্রমে তাহা দেখিতে পাইলেন এবং শাস্ত্রের সহিত তদসমুদায় লক্ষণ মিলাইয়া পাইয়া হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে জয়ধ্বনি দিয়। উঠিলেন। তদনন্তর তিনি জানিতে পারিলেন যে, এই মহাত্মা কলুটোলার চৈতন্য-আসন অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব অপরাধ স্মরণ হইল এবং আপনাকে অশেষ প্রকার দিক্কার দিয়া অজ্ঞানকৃত অপরাধের জগু বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

পরমহংসদেব কয়েকবার তাঁহার স্বদেশেও গমন করিয়াছিলেন। তথাকার লোকেরা তাঁহাকে লইয়া মহা আনন্দ করিত। তিনি যে স্থানে বাসা করিতেন, সর্বদা লোকের সমাগমে সেই স্থানটী উৎসবক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইত। হৃদয়ের বাটীতে অনেক সময় থাকিতেন। একদা শ্রামবাজার নামক স্থানে গমন করিয়াছিলেন। তথায় সপ্তাহকাল নিরবচ্ছিন্ন সঙ্কীৰ্ত্তন হইয়াছিল। দেশ দেশান্তর হইতে দলে দলে লোক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। এক্রপ জনতা প্রায় পল্লীগ্রামে মেলা হইলেও হয় না। প্রত্যেক লোকের মুখে এই কথা যে, এক অদ্ভুত ব্যক্তি আসিয়াছেন, তিনি ক্রমে ক্রমে মৃতপ্রায় হইতেছেন, আবার হরিনাম সঙ্কীৰ্ত্তনের উচ্চ রোলে তিনি পুনর্জীবিত হইয়া সিংহের ঞ্চায় নৃত্য করিতেছেন। এমন নৃত্য কেহ কখন দেখে নাই, এমন কীৰ্ত্তনও কেহ কখনও শুনে নাই। মাঠে, গৃহস্থের গৃহের চালে, প্রাচীরে, বৃক্ষে, অবশেষে তাল বৃক্ষের উপর পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়া লোকে এই অপূর্ব্ব ভাব দর্শন করিয়াছিল। এই জনতা হওয়ার পরমহংসদেব দুই দণ্ড স্থির হইয়া বিশ্রাম অথবা তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার করিতে পারেন নাই। এই জনরব যতই বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ক্রমে লোক সমাগমের আর পরিসীমা থাকিল না। তিনি তদনন্তর কোন উপায় না দেখিয়া বহির্দেশে গমনচ্ছলে তথা হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন। তদবধি জনতা ভয়ে আর আপনাকে ভাল করিয়া কাহার

নিকট পরিচয় দিতেন না। অধিকাংশ সময়েই ছদ্মবেশে এবং ছদ্মভাবে থাকিতেন।

পরমহংসদেব প্রতি বৎসর পানিহাটীর মহোৎসবে যাইয়া সঙ্কীৰ্ত্তনাদি করিতেন। ত্রীগৌরাদেবের সময় বখন নিত্যানন্দ ঠাকুর প্রচার কার্যে বহির্গত হইয়া নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া পানিহাটীতে আগমন করেন। তখন তিনি কাহারও বাটীতে অবস্থিতি না করিয়া একটা বটবৃক্ষমূলে রজনী বাপন করিয়াছিলেন। পরদিবস প্রাতঃকালে তথায় জলযোগ করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিয়াছিলেন। বৈক্যবেরা অত্মাপি সেই বৃক্ষতলে প্রতি বৎসর মহোৎসব করিয়া থাকেন। বৈক্যবদিগের সঙ্কীৰ্ত্তনে পরমহংসদেবের যোগ দেওয়ায় অতি অপূৰ্ণভাব ধারণ করিত। আমরা সৌভাগ্যক্রমে সেইরূপ সঙ্কীৰ্ত্তন কয়েকবার শ্রবণ করিয়াছি, তাহা লেখনী দ্বারা অংশরূপেও প্রকাশ করা আমাদের পক্ষে সাধ্যাতীত। আমরা অনেক সঙ্কীৰ্ত্তন ও প্রেমিক ভক্ত দেখিয়াছি, অনেক জানী সাধকও দেখিয়াছি, অনেক সুপণ্ডিত ও সঙ্গীতশাস্ত্র বিশারদ গায়ক দেখিয়াছি, অনেক লয় মান সংযুক্ত নৃত্যও দেখিয়াছি, কিন্তু পরমহংসদেবের নৃত্য ও সঙ্কীৰ্ত্তনের ভাব এক চৈতন্যরূপে ব্যতীত আর কাহার সহিত তুলিত হইতে পারে না। বাঁহারা তাঁহার হরিষাম শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানিতে পারিয়াছেন। হরিভক্ত বাঁহারা, তাঁহারা সেই সঙ্কীৰ্ত্তন শ্রবণ করিয়া প্রেমাবেশে পুলকিত হইতেন, একথা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু বাঁহারা তমোগুণের আকর, ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানিতেন না, ভক্তি প্রীতি যে প্রদেশে লেশমাত্র ছিল না, বাঁহাদের হৃদয় শূণ্য লৌহময় বলিলেও বলা যাইত, বাঁহারা পাশ্চাত্য সভ্যতার অল্পরোধে রাজপথে সাধারণ স্থানে ও সাধারণ ব্যক্তিদিগের সমক্ষে নৃত্যাদি করা অসভ্যতার লক্ষণ জ্ঞান করিতেন, বাঁহারা ভাব ও প্রেমকে মস্তিষ্কের ও মনের বিকার বলিয়া আফালন করিতেন, তাঁহারাও প্রেমে বিহ্বল হইয়া হৃদয়ের চিরসঞ্চিত সভ্যতার মস্তকে পদাঘাত করিয়া সঙ্কীৰ্ত্তনে নৃত্য করিয়াছেন।

পরমহংসদেব বখন সঙ্কীৰ্ত্তনে মাতিয়া উঠিতেন, তখন তাঁহার বাহুজ্ঞান একেবারে থাকিত না। তিনি কখন হস্তার দিয়া নৃত্য করিতেন এবং কখন স্থির হইয়া চলিয়া পড়িতেন। এই নিমিত্ত ভক্তেরা সৰ্বদাই তাঁহার নিকটে নিকটে থাকিতেন। পরমহংসদেব বেলঘরিয়ায় দুইবার গমন করিয়াছিলেন। প্রথমে ইং ১৮৭২ সালে, ফাল্গুন কিম্বা চৈত্র মাসে বেলা ৮১২ টার সময় জয়গোপাল সেনের উদ্ভানে কেশবচন্দ্র সেনকে দেখিতে গিয়াছিলেন। কেশব বাবু ও

তাহার পারিষদবর্গ সেই সময়ে মান করিবার আয়োজন করিতেছিলেন । তাঁহাকে দেখিয়া কেহ সমাদর কিম্বা হতাদর করেন নাই । পরমহংসদেব কাহার প্রতি কটাক্ষ না করিয়া কেশব বাবুর সম্মুখে যাইয়া বলিয়াছিলেন, “তোমার ল্যাজ্ খসিয়াছে ।” ভাবের কথায় কে প্রবেশ করিবে ? কেহ অবাক্ হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল এবং কেহ হাসিয়া উঠিল । কেশব বাবু তাহাতে বিরক্তিভাব প্রকাশ করিয়া কহিয়াছিলেন, “উনি কি বলেন, শ্রবণ কর ।” পরমহংসদেব বলিতে লাগিলেন, “যে পর্য্যন্ত ব্যাঙাচির ল্যাজ্ থাকে, তাহার জলে বাস করে, ল্যাজ্ খসিলে মাটিতে লান্ফাইয়া পড়ে ।” ইহার ভাব এই যে, সাংসারিক জীবগণ ব্যাঙাচি সদৃশ, কারণ তাহার সংসারেই ঘুরিয়া বেড়ায় । যে জীব চৈতন্তরাজ্যে পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহার অবস্থা সাধারণ জীবের ত্রায় নহে । পরমহংসদেবের প্রত্যেক কথা ভাবে পরিপূর্ণ । একটা ভাবে তিনি যেন কোন কথাই কহিতেন না । এই ব্যাঙাচির দৃষ্টান্তে আরও কতদূর তিনি লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন, তাহা বলিয়া উঠা যায় না । দৃষ্টান্তটী যে ভাবে কথিত হইল, তাহা দ্বারা যে কেশব বাবুর উচ্চাবস্থা নিরূপিত হইতেছে, তাহা নহে । ব্যাঙের ল্যাজ্ খসিলেই যে সে পরিজ্ঞান পাইল না, তাহা সকলেই জানেন, তবে ব্যাঙাচি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উন্নত বলিতে হইবে । কারণ, কাল-ভুজঙ্গের গ্রাস হইতে যে পর্য্যন্ত অব্যাহতি না পায়, সে পর্য্যন্ত ব্যাঙের কোন আশা তরসা নাই ; কেশব বাবু তখন সে অবস্থা অতিক্রম করিতে পারেন নাই । সেইজন্ত উপরোক্ত দৃষ্টান্ত দিয়াছিলেন । কেশব বাবুর সহিত কথা কহিয়া পরমহংসদেব আনন্দিত হইয়াছিলেন ।

দ্বিতীয় বারে, গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে যাইয়া নানাবিধ উপদেশ ও সঙ্কীর্ণনাদি করিয়াছিলেন ।

পরমহংসদেব কলিকাতায় এবং ইহার সম্মিহিত প্রায় অধিকাংশ স্থানেই গতিবিধি করিতেন, কিন্তু বাগবাজারে বলরাম বসুর বাটীতেই তাঁহার প্রধান আরামের স্থল ছিল । পরমহংসদেব দক্ষিণেশ্বর গমনাবধি রাসমণির জান-বাজারের বাটী ব্যতীত অন্য স্থানে কখন রজনী যাপন করেন নাই । বলরাম বাবুর বাটীতে কেবল সে নিয়ম ছিল না । বলরাম বাবুই দত্ত ! তাঁহার ত্রায় সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি অতি অল্পই দেখা যায় ।

কোমলগরে তিনি কয়েকবার যাতায়াত করিয়াছিলেন । একবার তথাকার পণ্ডিতবর দীনবন্ধু ত্রায়র পরমহংসদেবকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন ।

তিনি উপস্থিত হইবামাত্র পরমহংসদেব তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। কিন্তু দীনবন্ধু তাহা না করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কি আমার প্রণাম্য?”

• পরমহংসদেব অতি দীনভাবে দীনবন্ধুকে কহিলেন, “আমি সকলের দাস, আমার প্রণাম্য সকলেই। আমার কাছে নিয়্য নাই, সকলের নিয়্য আমি।” দীনবন্ধু তথাপি কহিতে লাগিলেন, “আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহার উত্তর দিতে হইবে। আপনি আমার নমস্কার কি না?” পরমহংসদেব কাতর হইয়া বলিলেন, “তাহা কেমন করিব বলিব? আমি নিশ্চয় জানি যে, আমা অপেক্ষা বিশ্ব-সংসারের সকল বস্তুই শ্রেষ্ঠ, আমি সকলের দাসামুদাস।” দীনবন্ধু তখন কহিতে লাগিলেন, “আপনি কি আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারেন নাই? আপনার যজ্ঞোপবীত নাই, সেজন্য আপনি ব্রাহ্মণের নমস্কার নহেন। তবে যজ্ঞপি সন্ন্যাসাশ্রমী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাদের অবশ্য নমস্কার হইতে পারেন।” দীনবন্ধু পণ্ডিত, বিশেষতঃ নৈয়ায়িক। তিনি ভক্তিতত্ত্বের গূঢ় মর্ম্ম কেমন করিয়া বুঝিবেন? তত্ত্বের লক্ষণ, সাধুর শিষ্টাচার, বা দীনভাবে অর্থ দাত্তিক পণ্ডিতেরা কি অনুধাবন করিতে পারেন? দীনবন্ধু হয় ত মনে করিয়াছিলেন যে, আমি বিলক্ষণ জ্ঞানের ফাঁকি বাহির করিয়াছি। পরমহংস আর কোন দিকে পলাইতে পারিবে না; কিন্তু স্থলদেহী নৈয়ায়িক মহাশয় সে দিন নিরহঙ্কারী সাক্ষাৎ শুকদেবসদৃশ অমাহুষভাষাপন্ন রামকৃষ্ণের ফাঁকি ধরিয়া ফাঁকে পড়িয়া গিয়াছেন। তিনি বুঝিলেন না যে, আমি সন্ন্যাসী হইয়াছিলাম, একথা যে ব্যক্তি স্বীকার করিতেছেন না, তাঁহার কত উচ্চ ভাব, তিনি কতদূর অহঙ্কার বিবর্জিত! কর্ণে শুনিতেছেন যে ব্যক্তি পরমহংস, তাঁহাকে কি আবার সন্ন্যাসী কি না, এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে হয়? তাঁহার একটি আপত্তি থাকিতে পারে। অত্যাশ্চর্য পরমহংসের জ্ঞান তাঁহার গৈরিক বসন ছিল না। এই যদি তাঁহার আপত্তি হয়, তাহা হইলে সে কথা কোন ভক্তকে জিজ্ঞাসা করিলেই হইত। গৈরিক পরিধান করা ত অহঙ্কারের পরিচয়। কারণ, যুখে না বলিয়া, পরিচ্ছদ দ্বারা নিজ অবস্থা সর্বসাধারণকে বিজ্ঞাপন করা যারপর-নাই রাজ্যোপাধির পরিচয়বিশেষ। জ্ঞানরত্ন মহাশয় তথাপি ছাড়িলেন না। অতঃপর তিনি যুগ্মদ্বয়ে তাহা স্বীকার করিয়াছিলেন। পরমহংসদেব কখন কখন হরিসভায় ও ব্রাহ্মমন্দিরে যাইতেন। কিন্তু কুত্রাপি বিশিষ্টরূপে আনন্দলাভ করিতে পারিতেন না।

বিংশ পরিচ্ছেদ ।

—০—

যৎকালে পরমহংসদেব এইরূপে নানা স্থানে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তাঁহার জীবন্ত উপদেশের দ্বারা অনেকেরই ঈশ্বর বিষয়ে বিস্তৃত জ্ঞান সঞ্চার হইতেছিল। সূতরাং অনেকের নিকটেই তিনি প্রকাশিত হইয়াছিলেন। পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, সর্বপ্রথমে মথুর বাবু তাঁহাকে চিনিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি আপনভাব কাহারও সমক্ষে প্রকাশ করেন নাই। কলিকাতার আর একটী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শঙ্কুচরণ মল্লিকের প্রতি পরমহংসদেবের সমধিক কৃপা ছিল। তিনি সদাসর্বদা তাঁহার বাটীতে যাইতেন। শঙ্কু মল্লিক একজন প্রকৃত ঈশ্বরানুরাগী ভক্ত ছিলেন। তাঁহার দানশক্তির বিশেষ সুখ্যাতি আছে। এ সকল গুণ তিনি পরমহংসদেবের আশীর্বাদে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ভারতবর্ষের যে স্থানে যত রকম সাধু সন্ন্যাসী ছিলেন, প্রায় তাঁহারা সকলেই পরমহংসদেবকে জানিতেন। তাঁহারা জগন্নাথদেব দর্শন কিম্বা গঙ্গাসাগর উপলক্ষে কলিকাতায় আসিলে পরমহংসদেবের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া যাইতেন না।

ক্রমে পরমহংসদেব সর্বজনসমক্ষে প্রকটিত হইতে আরম্ভ হইলেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, তিনি গোলযোগ ভালবাসিতেন না। দুইটী তিনটীর অধিক লোক যাতায়াত করিলে কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইতেন। কিন্তু মুখে কাহাকেও কটু কথা কহিতে পারিতেন না। ক্রমে লোক সমাগম কিছু অধিক আরম্ভ হইল। সে সময়ে খোঁটা ও মাড়োয়ারীরাও দলে দলে যাইতেন। এই মাড়োয়ারীদিগের মধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণ নামক এক ব্যক্তির গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থাদিতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। লোকের স্বভাবই এই যে, কেহ কিছু জাম্বুক আর নাই জাম্বুক, একটী কথা উত্থাপন হইলে তদ্বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে কেহই পশ্চাৎদৃষ্টি করে না। তাহাতে যদি কিছু কাহারও জানা থাকে, তাহা হইলে আর কোন মতে নিস্তার নাই। লক্ষ্মীনারায়ণের কিছু ধর্মশাস্ত্র জানা ছিল। তিনি সেই ভক্ত পরমহংসদেবের সহিত নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক করিয়া যখন পরাস্ত হইলেন, তখন অগত্যা তাঁহাকে সাধু বলিয়া স্বীকার করিলেন। তিনি তদনন্তর মধ্যে মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন এবং

পরমহংসদেবের সহিত নানা প্রকার তত্ত্ব-আলাপন করিয়া আনন্দে দিন যাপন করিয়া যাইতেন ।

একদা পরমহংসদেবের বিছানার চাদরখানি ছিঁড়িয়া গিয়াছে দেখিয়া, লক্ষ্মীনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনার বিছানার চাদরখানি ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, কি জন্ত পরিবর্তন করা হয় নাই ?” তাহাতে পরমহংসদেব বলিয়া-ছিলেন যে, “উহা এখন ব্যবহারোপযোগী আছে। যখন নিতান্ত প্রয়োজন হইবে, তখন এই মন্দিরস্বামী প্রদান করিবেন।” এই কথা শ্রবণানন্তর লক্ষ্মী-নারায়ণ কহিতে লাগিলেন, “এ প্রকার নিয়ম অজ্ঞায়। বস্ত্র ছিন্ন হইয়া যাইলে, তাহা চাহিবার পূর্বেই প্রদান করা কর্তব্য। এ দেশের ধনীরা এ সম্বন্ধে নিতান্ত অজ্ঞান, সাধুর মর্যাদা তাহারা বুঝিতে পারে না। যাহা হউক, আমাদের দেশে এরূপ প্রথা আছে যে, সাধু মহাত্মাদিগের ব্যয় সংকুলানের নিমিত্ত ধনী ব্যক্তির। কিছু অর্থ দিয়া থাকেন। সাধুকে আর কাহারও নিকটে ভিক্ষা করিতে হয় না। সাধুকে যতপি নিজ ধরনের সংস্থানের নিমিত্ত সমস্ত দিন চিন্তা করিতে হয় এবং দ্বারে দ্বারে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের সাধন সম্বন্ধে বিশেষ বিঘ্ন ঘটয়া থাকে। সাধনের জন্ত বিষয় পরিত্যাগ করা। যতপি সেই বিষয়েই আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইল, তাহা হইলে সংসার তাঁহাদের অপরাধ করিয়াছিল কি? মহাশয়ের পক্ষে ঠিক তাহা নহে। তথাপি অপরে না দিলে অভাব বিমোচন হইতেছে না। কাহার মনের ভাব কখন কিরূপ হয়, কিছুই বলা যায় না। এক ব্যক্তি অন্ত সাধুসেবায় ব্রতী রহিয়াছে, কাল আবার সেই ব্যক্তিকেই সাধুর পরম শত্রুরূপে দেখা যাইতেছে। তাহাদের ভক্তির উপর সাধুর ভাল মন্দ নির্ভর করিতেছে। আমার বাসনা এই যে, আমি মহাশয়ের নামে দশ সহস্র মুদ্রার কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করিয়া দিই। তাহার মাসিক সুদ ন্যূন সংখ্যায় চলিশ টাকা হইবে। এই টাকায় আপনার সমুদয় অভাব সম্পূর্ণ হইয়া যাইবে।” লক্ষ্মী-নারায়ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া পরমহংসদেব নিতান্ত বিরক্ত হইয়া কহিলেন, “কেন আমায় অর্থের প্রলোভন দেখাইয়া অনর্থের কূপে নিক্ষেপ করিবে! অর্থ পরমার্থ-পথের কণ্টকস্বরূপ এবং তৎস্থান হইতে পরিভ্রষ্ট করিয়া থাকে। তুমি আমায় বলিতে পার, অর্থের দ্বারা সচ্চিদানন্দ লাভ হয় কি না? কখন হয় না এবং হইবার নহে, আমি তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অর্থ জড় পদার্থ, তাহার দ্বারা যাহা হয়, তাহাও জড় পদার্থ। জড় পদার্থের আবশ্যক আছে,

তাহা আমি স্বীকার করি । দেহের জ্ঞান অর্থের প্রয়োজন হয়, কেবল প্রয়োজন কেন ? বিশেষ প্রয়োজন হয় বটে ; কিন্তু আমার এক প্রকার কালীর ইচ্ছায় স্বচ্ছন্দে চলিতেছে, সে স্থলে অর্থ সঞ্চিত করিয়া রাখিবার কোন হেতু আমি দেখিতেছি না । তুমি কি বিশ্বাস কর যে, এই রাসমণির দেবালয়ে অবস্থিতি করিতেছি বলিয়া, রাসমণি আমায় আহার দিতেছে ? তাহা অজ্ঞানীরা অবগতই বলিবে ; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা কি সত্য ? রাসমণিকে কে অর্থ দিল ? জন্মকালে সে অর্থ আনে নাই এবং মরিবার সময়ও কিছুই লইয়া যায় নাই । তবে বাহ্যিক একটা উপলক্ষ মাত্র । উপলক্ষকে অবগত নমস্কার করি । কিন্তু যিনি সৃষ্টিকর্তা, সকলের কর্তা, তিনিই আদি কারণ ।

“জড় জগতের পদার্থ জড় পদার্থের সহকারী, চৈতন্তের সহিত আধার আধেয় সম্বন্ধ মাত্র । দেহ জড় পদার্থ দ্বারা গঠিত, অর্থ তাহারই পুষ্টি-সাধন পক্ষে সহায়তা করে । চৈতন্তের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহার কোন সংশ্রব দেখা যাইতেছে না । তবে কি বলিয়া জড় পদার্থের সহিত চৈতন্তের সম্বন্ধ স্থাপন করিব এবং তুমি তাহার পক্ষ সমর্থন করিতেছ ? অতএব যে পদার্থ দ্বারা সারাৎসার বস্তু হইতে বিচ্যূত হওয়া যায়, তাহা নিতান্ত অসার এবং সর্বতোভাবে তাহা হইতে সাবধানে থাক। সকলেরই অবগত কর্তব্য ।

“দ্বিতীয় কথা এই, অহংনাশ না হইলে, আত্মজ্ঞান লাভ হয় না । কারণ, অহঙ্কার সে পথের আবরণবিশেষ । এই অহংবৃক্ষের মূলাংশপাটনের জ্ঞান সাধন ও ভজনের প্রয়োজন হইয়া থাকে । কিন্তু এই ‘অহং’ যাহাতে পরিবুদ্ধি পাইবে, তুমি ভাগবতের পণ্ডিত হইয়া তাহার পথ পরিষ্কার করিয়া দিতেছ । বেদে কথিত আছে যে, ঈশ্বর মহাশয়ের মন এবং বুদ্ধির অগোচর । ইহা যথার্থ কথা । কিন্তু ইহার স্বতন্ত্র ভাব আছে । বিষয়াত্মক মন বুদ্ধির অতীত তিনি এবং বিষয়বিরহিত অর্থাৎ শুদ্ধ মন বুদ্ধির গোচর তিনি ; এই জ্ঞান বলি, আমি অনেক ক্লেশ পাইতেছি, অহংনাশের জ্ঞান আমি কত কি করিয়াছি, কিন্তু আজও আমার অহংনাশ হয় নাই, আজও তুমি আমি জ্ঞান রহিয়াছে, আজও অর্থের কথায় কথা কহিতেছি, আজও অর্থ লইয়া আন্দোলন করিতেছি, আজও আমার মন বিষয়বিরহিত হইতে পারে নাই ; এ অবস্থায় আর আমার সর্বনাশ করিও না । আমায় কেন অর্থ দিবে ? আমি সাধু নহি, মহাস্ত নহি, আমি সিদ্ধপুরুষ নহি, আমি কিছুই নহি । আমি পণ্ডিত নহি, আমি ধনবানের পুত্র নহি, আমি সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভব নহি, আমি এখন ব্রাহ্মণও নহি । কতবার

উপবীত ধারণ করিলাম, কি জানি কোথায় হারাইয়া যায়। আমার অর্থ দিলে কি হইবে? অর্থ দিবার অনেক সুপাত্র আছে, তুমি তাহাদের সাহায্য কর, বিশেষ ফল পাইবে।”

লক্ষ্মীনারায়ণ কহিলেন, “আপনার এই কথায় আমি অমুয়োদন করিতে পারিলাম না। আপনার সম্বন্ধে তাহা খাটিতে পারে না। আপনি কি, তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি এবং সেই জন্তই অল্প এই প্রস্তাব করিয়াছি। আমি জানি যে, আপনার মন বিষয় হইতে একেবারে স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছে। তৈল যেমন জলের উপরে ভাসে, সেইরূপ আপনার মন বিষয়ের উপরে ভাসিবে। অহং-ভাবের কথা যাহা বলিলেন, তাহা এ প্রকার মনে কখনও স্থান পায় না।” পরমহংসদেব কহিলেন, “তৈল এবং জল একত্রে মিশ্রিত না হউক, কিন্তু তখনই জলে তৈলের গন্ধটী বাহির হইয়া দিনকতক পরে তৈল এবং জলের সংযোগ স্থানটী পচিয়া যায়। সেই প্রকার বিষয়ের সহিত মনের সংযোগ হইলে, মনটীতে প্রথমে বিষয়ের দুর্গন্ধ বাহির হইবে এবং পরে মন বিকৃত হইয়া যাইবে।”

লক্ষ্মীনারায়ণ কহিতে লাগিলেন, “ভাল, ইহাতে যদি এতই আপত্তি থাকে, আপনার কোন আত্মীয়ের নামে হউক।” পরমহংসদেব তথাপি অসম্মত হইলেন এবং বলিলেন, “তাহাতেও আমার মনে ছায়া পড়িবে। আমি জানিব যে, অর্থ আমার, বেনামী করিয়া রাখিয়াছি; ইহা আরও দোষ।” লক্ষ্মীনারায়ণ পুনরায় অতিশয় আগ্রহ পূর্বক কহিলেন, “আপনাকে এই টাকা অবজ্ঞাই গ্রহণ করিতে হইবে। আমি যখন একবার আপনাকে দান করিয়াছি, তাহা কোন মতে আর গ্রহণ করিতে পারিব না। আপনার যাহা ইচ্ছা হয়, করিবেন।”

লক্ষ্মীনারায়ণের মুখ হইতে এই কথা বাহির হইতে না হইতে, পরমহংসদেব একেবারে উজ্জ্বলরোদন করিয়া বলিয়া উঠিলেন—“মা! এমন লোককে কেন আন মা! যাহারা তোমার নিকট হইতে আমাকে বিচ্যুত করিতে চায়, তাহারা যে আমার পরম শত্রু মা!” এই বলিতে বলিতে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ বারম্বার এই অপ্রতিভ হইয়া স্তম্ভিত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। পরমহংসদেব তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মিষ্ট কথায় লক্ষ্মীনারায়ণকে পূর্ব প্রকৃতিস্থ করিয়া দিয়াছিলেন। *

* মধুর বাবু এক সময়ে পরমহংসদেবের নামে ৫০,০০০ টাকার কাগজ করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, পরমহংসদেবও সে সময়ে মধুরকে তাৎপর্য বুঝাইয়া দিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ ।

ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, পরমহংসদেবের সহিত কেশবচন্দ্র সেনের পরিচয় হইয়াছিল । কেশব বাবু পরমহংসদেবের প্রকৃত ভাব জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত দুই তিন জন ব্যক্তিকে দক্ষিণেশ্বরে প্রেরণ করিয়াছিলেন । এই ব্রাহ্মেরা মন্দিরবাটীতে দুই তিন দিবস অবস্থিতি পূর্বক পরমহংসদেবের অবস্থা তাঁহাদের বিজ্ঞা বুদ্ধির পরিমাণানুসারে স্থিরীকৃত করিয়া পরমহংসদেবকে উপদেশচ্ছলে বলিয়াছিলেন, “মহাশয় ! আপনাকে একজন ভক্ত বলিয়া আমাদের বিবেচনা হইতেছে । কিন্তু আপনি কখন হরি হরি বলেন, আবার কখন কালী কালী বলিয়া নৃত্য করেন । এ প্রকার অন্ধভাবে না থাকিয়া কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আচার্য্যপ্রবর শ্রীমৎ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের শরণাপন্ন হউন, আপনার পরিব্রাজ হইবে এবং আপনি মুক্তিলাভ করিবেন । তাঁহার নিকট চতুর্দর্শনের ফল পাওয়া যায় ।” পরমহংসদেব কোন ফলাকাঙ্ক্ষী নহেন বলিয়া কথাগুলির প্রতি কিছুই আস্থা স্থাপন না করায়, ব্রাহ্মেরা বিরক্ত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করেন ।

কেশব বাবু প্রেরিত অম্ভচরবর্গ দক্ষিণেশ্বর হইতে প্রত্যাগমন পূর্বক পরমহংসদেব সম্বন্ধীয় কথাগুলি আচার্য্যকে নিবেদন করিলে, তিনি সশিষ্যে অনতিবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন । কেশব বাবুকে দেখিবামাত্র পরমহংসদেব তাঁহার মনের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন । তিনি তন্নিমিত্ত প্রথমেই ব্রহ্মশক্তি লইয়া বিচার করিতে প্ররম্ভ হন । কেশব বাবুর বিশেষ গুণ ছিল যে, কৃতार्কিক বা অবিখ্যাসী ছিলেন না । তিনি তৎকালে নিরাকার ঈশ্বরই মানিতেন । তাঁহার ধারণা ছিল যে, ঈশ্বর অরূপ, কখনই আকারবিশিষ্ট হইতে পারেন না । পরমহংসদেব বলিলেন যে “শক্তি স্বীকার না করিলে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইতে পারে না ।” কেশব বাবু শক্তি মানিতেন না এবং ব্রহ্মোপাসনায় উহা নিশ্চেষ্টাজন বলিয়া নিজ সরল বিশ্বাস যাহা, তাহাই কহিলেন । পরমহংসদেব অতঃপর বলিলেন, “তোমার এরূপ সংস্কার সম্পূর্ণ ভুল । ব্রহ্মের লক্ষণ কি ? পঞ্চতত্ত্ব যথা পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু এবং আকাশ ও

পঞ্চতন্ত্রাৎ যথা—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদির অতীত যে বস্তু, তাঁহাকে ব্রহ্ম কহে । কিম্বা, তিনি অদ্বিতীয়, নিরাকার, নির্বিকার ও চিন্ময় স্বরূপ । তাঁহাকে জানিতে হইলে, তাঁহার সৃষ্টি বিশ্লিষ্ট করিতে হয় । সৃষ্টি তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং তিনিই করিয়াছেন । এই নিমিত্ত তিনিই উপাদান ও নিমিত্ত কারণ । তাঁহার দ্বারা ও তাঁহা হইতে যত্বপি সৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহা হইলে শক্তি স্বীকার করিতে হইবে । কারণ, কেহ তাঁহাকে নিগুণ বলে, গুণময় পদার্থ তাঁহার শক্তি হইতে উৎপন্ন হয় । বলিতে গেলে যদিও ব্রহ্ম ও শক্তি দুইটা কথা আসিয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে । ব্রহ্ম বলিলে বাঁহাকে বুঝায়, শক্তি বলিলেও তাঁহাকেই নির্দেশ করিয়া দেয় । ব্রহ্ম শক্তিতে বিরাজিত অথবা শক্তি ব্রহ্মে নিহিত আছেন । এক পক্ষে, ব্রহ্মের অনন্ত শক্তি স্বীকার করা যায়, এবং অপর পক্ষে অনন্ত শক্তির সমষ্টিকে ব্রহ্ম কহা যায় । ব্রহ্মের একটা নাম সচ্চিদানন্দ । সং—সত্য বা নিত্য, চিৎ—জ্ঞান এবং আনন্দ—আহ্লাদ, অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য বা নিত্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ ও আনন্দ স্বরূপ । অতএব এই ত্রিবিধ ভাবের সমষ্টিই ব্রহ্ম । ইতিপূর্বে কথিত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম শক্তি অভেদ । যেমন অগ্নি । অগ্নি বলিলে আমরা ইহার শক্তির ভাব অগ্রে উপলব্ধি করিয়া থাকি, যথা—উত্তাপ, বর্ণ এবং দাহিকা শক্তি, অথবা এই শক্তিত্রয়ের সমষ্টিকে অগ্নি বলে । যত্বপি ইহার শক্তিগুলি স্বতন্ত্র করা যায়, তাহা হইলে অগ্নি থাকিবে না । এতুলে অগ্নি ও অগ্নির শক্তিবিশেষ যদিও দৈত ভাবের পরিচায়ক হইতেছে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে, উহা একেরই অবস্থাবিশেষ । যেমন দুগ্ধ ও তাহার ধবলত্ব । দুগ্ধ যে বস্তু, ধবলত্ব তাহারই, তাহা দুগ্ধ ছাড়া নহে । যত্বপি ব্রহ্ম শক্তি অভেদ হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম এবং শক্তি দুইটা স্বতন্ত্র শব্দে উল্লেখ করিবার হেতু কি ? যেমন, এক ব্যক্তি লিখিতে পারে, পড়িতে পারে, নাচিতে পারে, গাইতে পারে, বাজাইতে পারে এবং চিত্র করিতে পারে । এ স্থানে ব্যক্তি এক, শক্তি নানাপ্রকার । সেইরূপ, যে সময়ে ব্রহ্মের অনন্ত শক্তির স্বতন্ত্রভাব প্রকাশিত হইতে দেখা যায়, তখনই ঐ শক্তিদিগের কোন প্রকার অবলম্বন স্বীকার করিতে হইবে । অবলম্বন না থাকিলে, শক্তি সকল কি প্রকারে অবস্থিতি করিয়া থাকে ? এই নিমিত্ত সচ্চিদানন্দ শব্দের দ্বারা ব্রহ্মের অবস্থাটী সুন্দররূপে পরিজ্ঞাত হইয়া যাইতেছে । সং—নিত্য, এইটী ব্রহ্মপদবাচ্য । এ অবস্থাটী বাক্য মনের অতীত । নিত্য—এই শব্দটার কি ভাব এবং আমরা বুঝিই বা কি ? অনিত্য বস্তু দেখিয়া

আমরা যে ভাব লাভ করিয়া থাকি, তাহার বিপরীত ভাবে নিত্য কহে, ইহা অনুমান করিবার বস্তুও নহে । চিৎ অর্থে জ্ঞান । এই চিৎ-শক্তি দ্বারা জগৎ উৎপত্তি হইয়াছে । জ্ঞান-শক্তিই সর্ব প্রধান সৃষ্টির নিদান স্বরূপ । সাধারণ দৃষ্টান্তস্থলে একটা কাঠের পুতুল গৃহীত হউক । পুতুলটা কাঠের দ্বারা গঠিত । গঠন করিল কে ? সেই ব্যক্তি, বা তাহার হস্ত, কিম্বা কোন যন্ত্রবিশেষ ? বাটালি কিম্বা করাতকে কারণ বলা যায় না । অথবা কাঠকেও উৎপত্তিক কারণ বলিলে ভুল হয় । এস্থলে সেই ব্যক্তির জ্ঞানশক্তিকে নির্দেশ করা হইয়াছে । মিস্ত্রী, তাহার জ্ঞানশক্তির সাহায্যে একজাতীয় কাঠের নানা প্রকার গঠন করিতে পারে । গঠনের উপাদান কারণ কাঠ, সমবায় কারণ যন্ত্রাদি এবং নিমিত্ত কারণ মিস্ত্রীকে কহা যায় । এই চিৎশক্তি হইতে যাহা কিছু দেখিবার, শুনিবার, বলিবার ও উপলব্ধি করিবার আছে, ছিল বা হইবে, তৎসমুদয় চিৎ-শক্তির অন্তর্গত । চিৎশক্তি হইতে সং বা নিত্যতার প্রকাশ পাইয়া থাকে । যেমন উত্তাপ-শক্তি অগ্নির পরিচায়ক । উত্তপ্ততানা থাকিলে অগ্নি বলিয়া কে জানিতে পারিত ? উত্তাপ-শক্তির দ্বারা যে প্রকারে অগ্নির অস্তিত্ব নিরূপিত হইল, চিৎ-শক্তির দ্বারা সেইরূপভাবে ব্রহ্ম নিরূপিত বা তাঁহাকে উপলব্ধি করা যাইতে পারে । যদিও এস্থলে সং বা ব্রহ্ম এবং চিৎ বা শক্তির মধ্যে ভেদ দেখান হইল, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ভেদ নাই, তাহা একেরই অবস্থাবিশেষ ।

“ব্রহ্ম শক্তির ভেদাভেদ আরও সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে । যেমন জলাশয়ের জল । জল যখন স্থির থাকে, তখন তাহাকে ব্রহ্ম বা সং অথবা পুরুষ কহা যায়, কিন্তু তাহাতে ঢেউ উঠিলে, চিৎ বা প্রকৃতির ভাব আসিয়া থাকে । যখন কোন কার্য্য নাই, সৃষ্টি নাই, তখন তিনি ব্রহ্ম বা অচল, অটল, স্নেহরূপ । কার্য্য আসিলেই শক্তির খেলা বলিতে হইবে ।

“ব্রহ্ম পুরুষ এবং শক্তি প্রকৃতি । কারণ, একের আশ্রয়ীভূত আর একটা, এই নিমিত্ত ব্রহ্ম পুরুষ এবং শক্তি প্রকৃতি বলিয়া উল্লিখিত । যেমন, ব্রহ্ম পুরুষ ও তদেষ্টিত লতা স্ত্রী শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে । নৌকা ক্লীবলিঙ্গ, তন্মধ্যে আরোহী থাকিলে, উহা স্ত্রীলিঙ্গবাচক হইবে । তুমি একখানি চিত্রপট প্রস্তুত করিলে, চিত্রটী তোমার চিত্রকর্য্য শক্তি হইতে তোমার দ্বারা জন্মিল, এই জন্ত তুমি পুরুষ, তোমার চিত্রকর্য্য শক্তি তোমার স্ত্রী এবং চিত্রটী সন্তান-বিশেষ । সেই প্রকার ব্রহ্ম পিতা, শক্তি মাতা এবং আমরা সন্তান স্বরূপ । অতএব ব্রহ্মোপাসনার প্রথমে শক্তির উপাসনা করা কর্তব্য । কারণ, ব্রহ্ম

হইতে, সৃষ্ট পদার্থ পর্যন্ত শক্তির ঐশ্বর্য্য বা অধিকার । যাহা লইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিবে, তৎসমুদায় শক্তির সম্পত্তি জানিবে । ব্রহ্মোপাসনায় উপযুক্ত হওয়া ও সেই অবস্থায় আনয়ন করিবার শক্তি, শক্তি ভিন্ন কাহারও শক্তি নাই । কারণ, যাহা বলিবে অথবা যাহা করিবে, তাহা শক্তির অন্তর্গত । ভক্তি শক্তির সম্পত্তি, ভাব ও প্রেম শক্তির সম্পত্তি, ফলে যে সকল উপকরণাদি লইয়া ব্রহ্ম পূজা করিবে, তাহা শক্তি ভিন্ন আর কাহারও নহে । শক্তি অতিক্রম করিয়া যে কাহারও ব্রহ্মোপাসনা হয় না, তাহার কারণ এই । ব্রহ্মোপাসনার যে সকল প্রণালী প্রচলিত আছে, তাহাতে কোন প্রকার ভাব অবলম্বন ভিন্ন সাধন কার্য্য হইতে পারে না । হয় পিতা পুত্র সম্বন্ধ, না হয় প্রভু ভূত্য সম্বন্ধ, কোন স্থানে সৃষ্টিকর্ত্তা বা সৃজিত সম্বন্ধ এবং কোন স্থানে রাজা প্রজা সম্বন্ধ, এই সম্বন্ধগুলি সুন্দর বটে, কিন্তু স্থানে স্থানে ভাবের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটয়াছে । পিতা বলিলে মাতা চাই, সৃষ্টিকর্ত্তা বলিলে কর্ত্তা চাই, কারণ, কেবল কর্ত্তা একাকী সৃষ্টি করিতে পারেন না । কথায় বলে, মাঠক দিয়ে বাপকে চেনা । মা নাই, বাপকে স্বীকার করিতেছি, ইহা যারপরনাই অস্বাভাবিক । এখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, উপরোক্ত ভাবে মাতৃ বা ঔৎপত্তিক স্থানটী ব্যবধান রহিয়াছে । অতএব ঐ মাতৃ স্থানটীই সকলের উৎপত্তির স্থল, উহাকে মা বলা যায় । ঐ মা বা চিৎশক্তি কেবল সৃষ্টিস্থিত বস্তু কেন, অবতার বল, রূপ বল, জ্যোতিঃ বল, সকলই প্রসব করিয়া থাকেন । এই জ্ঞ

‘অনন্ত রাধার মায়া কহেনে না যায়,

কোটি কৃষ্ণ, কোটি রাম, হয় যায় রয় ।’

বলিয়া উল্লেখ করা হয় । মুখে শক্তি অস্বীকার করিলে চলিবে না, শক্তি ব্যতীত কোন কার্য্যই হইতেছে না । দেখ জড় জগৎ, উহা কিরূপে চলিতেছে ? শক্তিতে । দেখ সৌরজগৎ, উহাও শক্তিতে চলিতেছে । মনুষ্যগণ দেখিতেছে দর্শন শক্তিতে, আহার পরিপাক হইতেছে পাক শক্তিতে, কথা কহিতেছে বাক্ শক্তিতে এবং অহুতর করিতেছে স্পর্শ শক্তিতে । যে দিকে দেখ, কি বাহিরে, কি অভ্যন্তরে, কি উর্দ্ধে, কি অধোদেশে, শক্তির কার্য্য নাই, এমন স্থানই কুত্রাপি দেখা যাইবে না । মনোনিবেশ পূর্বক চিন্তা করিয়া দেখ, অনায়াসে বুঝিতে পারিবে ।

“যে শক্তিতে জগৎ সৃষ্ট হয়, কথিত হইয়াছে, তাহাকে চিৎশক্তি বা মায়া কহে । এই মায়া কার্য্যবিশেষে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে । একটীকে

বিজ্ঞা-মায়ী এবং অপরটাকে অবিজ্ঞা-মায়ী কহে । বিজ্ঞা-মায়ার অন্তর্গত বিবেক এবং বৈরাগ্য ; কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য অবিজ্ঞা-মায়ার অন্তর্গত বলিয়া উল্লিখিত । জীবগণ যখন অবিজ্ঞা-মায়ায় অভিভূত থাকে, তখন তাহারা ঈশ্বর হইতে অনেক দূরে পতিত হইয়া যায় । তাহারা ষড়্‌রিপুর দোৰ্দ্দণ্ড প্রতাপে এমনি বিমুগ্ধ ও পরাজিত হইয়া পড়ে যে, তাহারা আপনাদের বিমুগ্ধ হইয়া রিপুদিগের আয়ত্বাধীনে এককালে উৎসর্গীকৃত হইয়া যায় । মহাশক্তির উপাসনা করিলে রিপুগণ ক্রমে বিদূরিত হইয়া যায়, তখন মনোরাজ্যে বিবেক ও বৈরাগ্য আসিয়া অধিকার বিস্তার করে । তখন মন তাবরূপ রাজপথ প্রাপ্ত হইয়া মহাভাবময়ী মহাশক্তির শক্তিতে ব্রহ্মে মিলিত হইয়া যায় । ব্রহ্ম ব্রহ্ম করিয়া ত দেখিয়াছে, কিছুই প্রাপ্ত হও নাই । একবার মা কিম্বা সচ্চিদানন্দময়ী অথবা ব্রহ্মময়ী বলিয়া ডাক দেখি, এখনি তাঁহার ধনে ধনী হইয়া যাইবে ! যে ঈশ্বর-দর্শন এখন অদর্শন হইয়া রহিয়াছে, তাহা দর্শন করিবে, ভাবে নহে, প্রত্যক্ষ করিবে । যে ঈশ্বরকে অস্ত্রেয় বলিয়া বোধ করিতেছে, এ বোধ মায়িক মনে হইতেছে ; তাঁহার সহিত বাস্তবিক বিহার করিবে । যে ঈশ্বরকে জ্ঞানে নিরাকার বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে, তাঁহাকে সাকার রূপে নিকটে পাইবে, স্পর্শ করিবে ; ভাবিতেছে, হয় কি না হয় ? করিয়া দেখ । একবার অকপট চিন্তে বালকরূপে বুদ্ধিতে মা মা বলিয়া কাদিয়া দেখ । বল, কোথায় আনন্দময়ী ! মা আনন্দখনমুর্তি দর্শন দিয়া আনন্দধামে লইয়া যাইবেন । তাঁহাকে চায় কে ? পাছে তিনি আইসেন, পাছে তাঁহার দর্শনলাভ হয়, এই জ্ঞাত একেবারে তাঁহার রূপ উড়াইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিলে কি দেখা যাইবে ? ঈশ্বর দর্শনের জ্ঞাত কাহার আকাঙ্ক্ষা আছে ? কে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে বলিয়া সাধন ভজন করিয়া থাকে ? ধন হইল না বলিয়া এক ঘটি কাদিবে, পুত্র হইল না বলিয়া দশ ঘটি কাদিবে, মাগ্ন হউক বলিয়া কাদিয়া ভাসাইয়া দিবে । কিন্তু ঈশ্বর লাভের জ্ঞাত বল দেখি এক কোঁটা চক্ষের জল কেহ কখন কি ফেলিয়াছে ? যে কাদিয়াছে, যে প্রাণ ভরিয়া ডাকিয়াছে, তাহার নিকটে তিনি প্রকাশিত হইয়া আছেন । সে প্রাণে প্রাণে তাঁহার রসাস্বাদন করিতেছে । যত্বপি দেখা দাও বলিয়া বারো ক্ষণ, বারো দিন, বারো মাস, অথবা বারো বৎসর (এতদ্বারা অমুরাগের তারতম্য দেখাইয়াছেন) কাদ, অবশ্রুই দেখা পাইবে, তাহার কিছু-মাত্র সন্দেহ নাই ।

“শক্তির কোন বিশেষ একটি নাম নাই । কেহ কালী বলে, কেহ রাধা

বলে, কেহ বা মা বলিয়া ডাকে । শক্তি এক, তাঁহার নাম অনন্ত । যে কথায় যে বর্ষে বা যে ভাবে তাঁহাকে ডাকা হয়, তাহা একেরই জানিবে । শাস্ত্রে তাঁহাকে পঞ্চাশবর্ণ-রূপিণী বলিয়া কথিত হইয়াছে । ইহার অর্থ এই যে, জগতে যত প্রকার বর্ণ আছে, যদ্বারা আমাদের মনোভাব ব্যক্ত করিয়া থাকি, তৎসমুদায় বর্ণ দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় । এই মহাশক্তিকে যে কোন নামে বা যে কোন ভাবে মনঃসংযোগ করিয়া ডাক, অন্তর্যামিনী সেই মুহূর্ত্তে মনোভীষ্ট পূর্ণ করিয়া দিবেন ।” পরমহংসদেব এইরূপ নানাবিধ উপদেশ দ্বারা কেশব বাবুকে শক্তি স্বীকার করাইয়া লইয়াছিলেন ।

ব্রহ্মোপাসনায় কি জন্ত শক্তি-সাধন আবশ্যক, তাহা পরমহংসদেব এইরূপ কহিয়াছেন । মনুষ্যগণ যাহা দেখিতে পায়, অথবা যাহা অনুভব করিতে পারে, তদ্বারা সেই বস্তু বা ভাব যে প্রকার হৃদয়ঙ্গম হইবার সম্ভাবনা, কেবল উদ্দেশ্যে সেরূপ হয় না । ভাব চাই, ভাব ব্যতীত সকল বস্তুই শূন্য ও অন্ধকার-ময় । আমরা বাল্যকালাবধি শাস্ত্র, দান্ত, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর, এই পঞ্চ ভাব পরিবার মধ্যে শিক্ষা করিয়া থাকি । এইরূপ ভাবশিক্ষা মনুষ্য-স্বভাবসিদ্ধ । শাস্ত্র, দান্ত ও সখ্যভাব প্রায় মনুষ্যমাত্রেরই আছে । বাৎসল্য ও মধুর কাহার নাও থাকিতে পারে । শাস্ত্র ও দান্তভাব পিতা মাতার ও অগ্রাণ্ড গুরুজনের নিকট শিক্ষা করা যায় অথবা তাঁহাদের প্রতি মনুষ্যের স্বাভাবিক যে শ্রদ্ধা ভক্তির ভাব প্রদর্শিত হয়, তাহাকে শাস্ত্র ও দান্তভাব কহে । বয়স্ক ও ভ্রাতা ভগিনীর সহিত সখ্যভাব, বাৎসল্য ভাব সন্তান সন্ততির প্রতি এবং মধুরভাব স্বামী ও স্ত্রীতে লক্ষিত হইয়া থাকে ।

কথিত হইল যে, পিতা এবং মাতার প্রতি সন্তানের শাস্ত্র ও দান্তভাব বিকশিত হইয়া থাকে ; কিন্তু পিতা সন্তানের মঙ্গল কামনায় কিঞ্চিৎ কর্কশ ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং জননীর অপেক্ষা তাঁহার স্নেহ অল্প, তাহার সন্দেহ নাই । জননীর ভাব সেরূপ নহে । সন্তান যতই দোষের দোষী হউক, তাঁহার চক্ষে নির্দোষী বলিয়া পরিগণিত । মাকে একবার মা বলিয়া ডাকিলে সন্তানের মনে যেমন শান্তি হয়, মাও তেমনি আনন্দিত হইয়া থাকেন । তথায় ভয়ের লেশমাত্র থাকে না ; কিন্তু পিতা বলিলে সে প্রকার ভাব হয় না । মাতার নিকট দোষ স্বীকার করিতে ভয় হয় না, কিন্তু পিতার নিকটে অপরাধী সন্তান অগ্রসর হইতেই অসমর্থ হয়, দোষ স্বীকার করিবে কি ? এই নিমিত্ত মাতৃভাবের সাধনই উত্তম । মাতৃভাবের সাধনের আরও হেতু আছে । মনুষ্য-

চিন্তা স্বভাবতঃ দুর্বল। নারীর কথা হইলেই কুৎসিত ভাবের উদ্বেগ হইয়া মনকে একেবারে নিরুত্ত পশুবাৎ করিয়া তুলে। সখ্যভাবোৎসাহ মনের সমতা রক্ষা করা যায় না। কিন্তু মাতৃভাবে সে প্রকার দোষ ঘটিতে পারে না। মাতৃভাবে ঈশ্বর-সাধনা করিলে মন ক্রমে উচ্চগামী হয় এবং পৃথিবীর বিশেষ আকর্ষণী কামিনী হইতে রক্ষা পাইয়া থাকে।

কেশব বাবু মধ্যে মধ্যে অবসর ক্রমে পরমহংসদেবের নিকট গমন করিতে লাগিলেন এবং ভূরি ভূরি জীবন্ত দৃষ্টান্তের দ্বারা ও ব্রহ্মতত্ত্ববিষয়ক নিগূঢ় ভাব সকল হৃদয়ের স্তরে স্তরে স্থাপন করিয়া তদনুরূপ আপনাকে প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কখন তর্ক করিতেন না, অথবা কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেন না, অথবা হইয়া শুনিয়া যাইতেন।

কেশব বাবুকে এইরূপে উপদেশ দিয়া তাঁহাকে আর এক ছাঁচে ঢালিলেন। কেশব ঈশ্বরকে দয়াময় করুণাময় বলিয়া জানিতেন, এক্ষণে মা শব্দ বলিতে শিখিয়া, নিরস, শুদ্ধ, নিরাকার ব্রহ্ম হইতে রসাল মাতৃ ভাব পাইলেন। তিনি তদবধি মাতৃ ভাবে উপাসনা করিতেন। তিনি এত দিনে ব্রহ্ম এবং ঈশ্বরের প্রভেদ বুঝিলেন। ব্রহ্ম যে বলিবার কিছা ভাবিবার বস্তু নহে, তাহাও তিনি জ্ঞাত হইলেন। তিনি সেই জগৎ চিৎখন রূপের অমূল্য হইয়া ভক্তনা-নন্দ সম্ভোগ আরম্ভ করিলেন।

পরমহংসদেব যখন দেখিলেন যে, কেশব বাবু শক্তির রসাস্বাদন পাইয়াছেন, তখন তিনি বলিলেন যে, ভগবান্, ভাগবত ও ভক্ত, তিনই এক। অর্থাৎ যিনি ভগবান্, তিনিই ভাগবত ও তিনিই ভক্ত। কেশব বাবু এই কথা শুনিয়া আশ্চর্য হইয়া এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। অল্প কেশব বাবুর মহা পরীক্ষার দিন। ষাঁহার ঈশ্বর এবং জীব স্বতন্ত্র বলিয়া স্বতন্ত্র দলের সৃষ্টি করিয়াছেন, ষাঁহার সর্বত্রই ঈশ্বরজ্ঞানকে বহু ঈশ্বরবাদী বলিয়া একেশ্বরবাদের আড়ম্বর করিয়া থাকেন, আজ সেই গর্জিত ধর্ম্মদেবীদিগের সন্ধিকাল উপস্থিত। কেশব বাবু কোন কথা কহিলেন না। পরমহংসদেব কহিতে লাগিলেন, ভগবান্, ভাগবত ও ভক্ত, তিনকে এক বলিবার উদ্দেশ্য এই। ঈশ্বরকে ভগবান্ কহে, তাঁহার গুণানুবাদ বাহাতে বর্ণিত আছে, তাহাকে ভাগবত ও সেই ভাগবতীয় ভাব ষাঁহার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তাহাকে ভক্ত বলে। ভক্তের অবস্থা সাধকের জায় নহে। কারণ সাধকানুসার কেমন করিয়া লীলাসময়কে হৃদয়ে ধারণ করিবেন, সাধকের এইমাত্র চেষ্টা থাকে। পরে যখন ভগবান্ ভক্তের হৃদয়ে প্রবেশ করেন,

তথায় তিনিই তাঁহার বাসস্থান নির্মাণ করিয়া, তখন সেই ভক্তের হৃদয় মধ্যে কার্য্য করিয়া থাকেন। সুতরাং, ভগবানের স্ব-স্বরূপের অবস্থার সহিত তাঁহার ভক্তহৃদয়বিহারকালীন অবস্থার কোন প্রভেদ থাকে না। যেমন, মূৰ্ত্তের ভিতর পাণ্ডিত্য শক্তি জ্বলিলে তাহাকে পণ্ডিতই বলিতে হইবে। পূৰ্বে মূৰ্ত্তাবস্থা ছিল বলিয়া চিরকাল তাহাকে সেই আখ্যায় পরিচিত হইতে হয় না।

ভক্তেরা ঈশ্বরকে পরমাত্মীয় জ্ঞান করিয়া থাকেন, এমন কি তাঁহাকে তাঁহাদের জীবনের জীবন স্বরূপ, আত্মার পরমাত্মা স্বরূপ স্থির করিয়া থাকেন। তাঁহার পাদপদ্মে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া, আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে, সকল সময়েই তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া তাঁহাতেই বিলীন হইয়া থাকেন। যেমন, কোন ব্যক্তি বাতাহত হইয়া শয্য-তরঙ্গে নিপতিত হইলে আপনাকে শ্রোতের বিপক্ষে পরিচালিত করিতে পারে না। তাহাকে তাহার গত্যাত্মীয় ইত্যন্ততঃ ভাসিয়া যািতে হয়; চিদাম্বুদ সাগরে পতিত হইলে ভক্তদিগেরও সেইরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে। ভক্তেরা অগত্যা তাঁহার ইচ্ছার প্রতি নির্ভর করিতে বাধ্য হয়। এ প্রকার আত্মনিবেদিত ভক্তের যাবতীয় কার্য্য স্বয়ং ভগবানকেই সম্পন্ন করিতে হয়। যেমন, কোন ব্যক্তিকে কেহ অভিভাবক জ্ঞান করিলে, তাহার সকল কার্য্যেই তিনি উপস্থিত থাকিয়া আশ্রিত ব্যক্তিকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। কিন্তু যত্বপি সেই আশ্রিত ব্যক্তি মৌখিক অভিভাবক স্বীকার করে এবং আপন ইচ্ছাক্রমে কার্য্য সমাধা করিয়া লয়, তাহা হইলে অভিভাবক সে আশ্রিতের কোন কার্য্যেই হস্তনির্দেশ করিতে চাহেন না। কপট ভক্তদিগের এই প্রকার দুর্দশা হইয়া থাকে।

যেমন, কোন রাজসরকারের একটা ভৃত্য আছে। ভৃত্যটী রাজার বিশেষ অমুগত, বিশ্বাসী এবং প্রিয়। কিছু দিন পরে সেই ভৃত্যের বাটীতে কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে, রাজাকে লইয়া যাইবার জন্ত তাহার মনে মনে বিশেষ আগ্রহ জন্মিল। স্বল্পবেতনভোগী ভৃত্য, বাটীতে উত্তম স্থান না থাকায় অথবা কোন উপায় না দেখিয়া ইত্যন্ততঃ চিন্তা করিয়া রাজার কোন প্রিয়তম কর্ম্মচারীর নিকট আপন মনোভাব অতি দীনভাবে প্রকাশ করিল। সেই কর্ম্মচারী ভৃত্যের দীনতা দেখিয়া নিতান্ত প্রীতি লাভ করিলেন এবং বাহাতে এই কথা মহারাজের কর্ণগোচর করিতে পারেন, এরূপ সুবিধা অবেষণ করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে তিনি তাহাতে কৃতকার্য্যও হইলেন। ভৃত্যের বিনয়ে

রাজা পূর্ব হইতেই সন্তুষ্ট ছিলেন । এ প্রস্তাব হইবামাত্র তিনি বিরুদ্ধ করিলেন না । ভৃত্যের অবস্থা রাজার অবিদিত ছিল না । তাঁহার গমনের নিমিত্ত যে সকল দ্রব্যাদির প্রয়োজন হইবে, তাহা রাজসরকার হইতে আয়োজন হইবার জ্ঞাত আজ্ঞা দিলেন । রাজার এই আজ্ঞা প্রকটিত হইবামাত্র, সেই ভৃত্যের বাটীতে লোক প্রেরিত হইল । তাহারা প্রথমে অরণ্য পরিষ্কার, তদনন্তর শিবির সংস্থাপন, রাজাসন সুসজ্জিত ও ভোজনের আয়োজন করিতে লাগিল । পরে নির্দিষ্ট সময়ে রাজা স্বজন সমভিব্যাহারে ভৃত্যের বাটীতে আসিয়া উপবেশন করিলেন । ভক্ত সম্বন্ধেও তদ্রূপ । ভূতরূপ উপাসক সেই রাজাধিরাজ মহাপ্রভুর রাজসরকারে বিশ্বাসী, বিনয়ী এবং অভিমানশূন্য হইলে, সাধুভক্তরূপ প্রিয় কর্মচারীদের অনুরাগভাজন হইবেন । সাধুদিগের রূপা হইলে ভগবানের রূপা হইয়া থাকে । তখন তাঁহার নিকট যাহা অনুরোধ করা হয়, তাহা তিনি রক্ষা করেন । উপাসকের হৃদয়ের কথা এই যে, হৃদয়েশ্বরকে হৃদয়মাঝে বসাইয়া হৃদয় ভরিয়া তাঁহাকে দেখিয়া লইবেন । রাজরাজেশ্বরের নিকট উপাসকের মনোভাব পৌঁছিবামাত্র, অন্তরারণা পরিষ্কার হইবার ব্যবস্থা হইতে আরম্ভ হয় । তখন কাম, ক্রোধ প্রভৃতি কণ্টক রক্ষা সকল উৎপাটিত হইয়া রত্নবেদী স্থাপিত হয় । প্রেম ভক্তিরূপ ভোজ্য পদার্থ সকল রাজভাণ্ডার হইতে প্রেরিত হইতে থাকে । কালক্রমে রাজাধিরাজ ভৃত্যের হৃদয়-কুটীরে আগমন পূর্বক হৃদয়-মন্দিরস্থ রত্নবেদীর উপরে উপবেশন করেন এবং সকল কার্যাই আপনি সম্পন্ন করিয়া থাকেন । অতএব ভক্ত ও ভগবানের এইরূপ তাৎপর্য্য হইলে, এতদ্ব্যতিরিক্ত কোন প্রভেদ দৃষ্ট হয় না । এক্ষণে ভগবানের সহিত ভাগবতের কোন পার্থক্য আছে কি না, দেখিতে হইবে ।

জীবগণ সচরাচর ত্রিবিধ অবস্থায় অবস্থিতি করিয়া থাকে । যখন তাহারা মন সংযম করিয়া ধ্যানে নিমগ্ন হয়, তখন তাহাদিগকে ঈশ্বরাস্তর্গত কহা যায় । কেন না, সে সময়ে তাহাদের অহঙ্কার, মন এবং বুদ্ধির কোন প্রকার কার্য্য থাকে না । ধ্যান ভঙ্গ হইলে, মন রক্ষার দ্বিতীয় উপায় ভাগবত অর্থাৎ যাহাতে ঈশ্বরের মহিমা এবং গুণকীর্ত্তনাদি বর্ণিত আছে । এ অবস্থায় মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার ভগবানের লীলারস পানে বিস্তার হইয়া পড়ে । সুতরাং অল্প দিকে তাহারা ধাবিত হইতে পারে না । ধ্যানকালীন মনের অবস্থা যে প্রকার, ভাগবত রত্নান্ত তদন্ত সময়েও মনের অবস্থা সেই প্রকার হইয়া থাকে । এই নিমিত্ত এতদ্ব্যতিরিক্ত মধ্যে কোন প্রভেদ নাই বলিয়া ব্যক্ত করা

যায়। ভক্ত-স্বভাব স্বতন্ত্র প্রকার। তাঁহারা একাকী নির্জন স্থানে সদা সর্বদা বাস করিতে পারেন না অথবা চাহেন না। ভক্তজ্ঞ সময়ে সময়ে ভক্তসমাজে আসিয়া মিলিত হইয়া থাকেন। ভক্তদিগকে দেখিলে ভগবানকে স্মরণ হয়, তাঁহার ভাব সকল ক্রমান্বয়ে মনোমধ্যে উদ্দীপিত হইয়া যায়। যেমন, শোকার আভা দেখিলে সত্যের আভা মনে হয়, উকীলদের দেখিলে আদালতের কথা স্মরণ হয়, তেমনি ভক্ত দেখিলে ঈশ্বরের ভাবই আসিয়া থাকে। এই রূপে শরীরের অবস্থান্তর সংঘটিত হইলেও মনের এক অবস্থা অনায়াসে সংরক্ষিত হইতে পারে; অর্থাৎ ধ্যানে ভগবান্, ভাগবত-রূপে ভগবান্ এবং ভক্তরূপেও ভগবান্, মনের অবস্থা বিচারে একাবস্থা নিরূপিত হইতেছে। এইজন্ত ভগবান্, ভাগবত ও ভক্ত এক বলা যায়।

একদা গোকুলকুলরাজী যশোদা গোকুলবিহারী গোপালের কোন সংবাদ না পাইয়া প্রেমময়ী রাধার নিকট গমন পূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, “মা গো! তুমি আমার গোপালের কোন সংবাদ জান কি?” মহাভাবময়ী তখন ভাবে নিমগ্ন ছিলেন। যশোদার কথা তাঁহার কর্ণগোচর হইল বটে, কিন্তু মনের নিকট অগ্রসর হইতে পারিল না। যখন যোগমাতার যোগ ভঙ্গ হইল, তিনি সম্মুখে নন্দরাজীকে দণ্ডায়মান দেখিয়া তৎক্ষণাৎ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণিপাত করিলেন এবং সহসা কি জন্ত আগমন করিয়াছেন, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। যশোদা তদ্বিবরণ নিবেদন করিলে পর, শ্রীমতি তাঁহাকে নয়ন মুদ্রিত করিয়া গোপালের রূপ চিন্তা করিতে কহিলেন। যশোদা নয়ন মুদ্রিত করিবামাত্র মহাভাবময়ী তাঁহাকে মহাভাবে অভিভূত করিয়া ফেলিলেন। তিনি ভাবাবেশে গোপালকে দেখিতে লাগিলেন। গোপালরূপ দর্শন করিয়া যখন ভাবভ্রষ্ট হইলেন, তখন শ্রীমতির নিকটে এই বর প্রার্থনা করিলেন, “মা! আমি যেন নয়ন মুদ্রিত করিলেই গোপালকে দেখিতে পাই। একাকিনী থাকিলে যেন আমার জিহ্বা গোপাল নাম জপ করিতে পারে এবং লোকালয়ে যাইলে যেন গোপালেরই স্ব-গণকে দেখিতে পাই।”

পরমহংসদেব এইরূপ নানাবিধ দৃষ্টান্ত প্রদান পূর্বক কেশবচন্দ্রকে ভগবান্, ভাগবত ও ভক্ত বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি যখন কোন উপদেশ প্রদান করিতেন, তাহার সহিত আর একটি পদার্থ মিশ্রিত থাকিত। সেই পদার্থের মোহিনী শক্তির দ্বারা সকলেই বিমোহিত হইয়া বাইতেন। সেই শক্তি কেবল তাঁহারই ছিল। উপদেশ অনেকেই দিয়া থাকেন, কিন্তু তাহার সাময়িক

কার্য্যও কদাচিৎ হইতে দেখা যায়। এই মোহিনী শক্তিতে কেশব বাবু পরাক্রান্ত হইয়া ভগবান্, ভাগবত ও ভক্ত স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। পরমহংসদেব তদনন্তর কৃষ্ণ, গুরু এবং বৈষ্ণব, তিনই এক, এই কথা স্বীকার করিতে বলেন, তাহাতে কেশব বাবু বিনীত ভাবে বলিয়াছিলেন, এক্ষণে উহা পারিব না।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ ।

ভগবান্কে ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু বলিয়া ভক্তেরা উল্লেখ করেন, সে কথাটা তাঁহাদের প্রত্যক্ষ সিদ্ধান্তের ফল। তাঁহার নিকটে যে যাহা চায়, তিনি তাহাকে তাহাই দিয়া থাকেন। মাতা যেমন সন্তানের আদার ভাল মন্দ বিচার না করিয়া, মেহবশে তৎক্ষণাৎ অতিলম্বিত দ্রব্য প্রদান করিয়া তাহার আনন্দ বর্দ্ধন করেন, ভক্ত-বৎসল ভগবান্ও তাহাই করিয়া থাকেন। কেশব বাবু ঈশ্বরতত্ত্ব লাভের জগ্গ বাস্তবিক জ্ঞাতি, কুল, মর্য্যাদা ও নিজ সামাজিক উন্নতি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি যথার্থই ঈশ্বর-প্রেমরস পান করিবার জগ্গ আপনাকে উৎসর্গীকৃত করিয়াছিলেন। তিনি প্রাণের আবেগে, মনের উচ্ছ্বাসে যে তত্ত্বকথানুত লাভেচ্ছায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেন, তাহার কিছুমাত্র সংশয় নাই। কার্য্য দেখিলেই কারণ বুঝা যায়। তাঁহার হৃদয় মরুভূমিপ্রায় ছিল, তাঁহার মন নিরাকার ভাবিয়া একেবারে অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়াছিল এবং এক পথে যাইতে বিপরীত পথে যাইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি যদিও ক কে স্ব বলিয়াছেন এবং আমকে আমড়া বলিয়াছেন, কিন্তু সকল কথায় তাঁহার সরল ও সহজ ভাবের আভাস পাওয়া যাইত। এই গুণে ব্রাহ্মসমাজনেতা পরমহংসদেবের কৃপা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার সরল প্রকৃতি ও সত্যানুসন্ধিৎসু চিন্তা ছিল বলিয়া “পরমহংসের জীবন হইতেই ঈশ্বরের মাতৃভাব *

* পরমহংসদেবের তিরোত্তাবের পর নববিধানসংক্রান্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ১৮৮৬ সালের সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবরের ইন্টারপ্রিটার নামক ইংরেজী মাসিক পত্রিকার ৮৭ পৃষ্ঠায় তাঁহার সম্বন্ধে এক অদ্ভুত প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন। এই প্রকার অশ্বাভাবিক মত পরিবর্তনের হেতু কি, তাহা আমরা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। তিনি লিখিয়াছেন—
“He did not bring the idea (God as our mother) into the church, it was

ব্রাহ্মসমাজে সঞ্চারিত হয়। সরল শিশুর জায় ঈশ্বরকে সুমধুর মা নামে সম্বোধন এবং তাঁহার নিকট শিশুর মত প্রার্থনা ও আদ্যাকর করা, এই অবস্থাটী পরমহংস হইতেই আচার্য্যদেব বিশেষরূপে প্রাপ্ত হন। পূর্বে ব্রাহ্মধর্ম শুদ্ধ তর্ক ও জ্ঞানের ধর্ম ছিল। পরমহংসের জীবনের ছায়া পড়িয়া ব্রাহ্মধর্মকে

there before the minister's acquaintance with him." "নববিশ্বাসের মাতৃভাব পরমহংসদেব হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, তাঁহার সহিত আচার্য্যের পরিচয় হইবার পূর্বে তাহা বর্তমান ছিল।" "But he by his childlike Bhakti, by his strong conception of an ever ready motherhood, helped to unfold it in our minds wonderfully." "কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁহার প্রগাঢ় মাতৃভাব এবং বালকবৎ ভক্তির পরাক্রমে আমাদের মাতৃভাব আশ্চর্য্য রূপে বিকশিত হইতে সাহায্য হইয়াছিল।" "His mother was realized as an imaginary Hindu deity, our mother was purely spiritual." হিন্দুদিগের কাল্পনিক ঈশ্বরকে তিনি মাতৃভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের মাতৃজ্ঞান বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক 'ছিল।" "But he undoubtedly intensified and vivified our conception, we as undoubtedly spiritualized his." "কিন্তু তাঁহার দ্বারা আমাদের মাতৃভাবের ধারণা মিশ্রিত জীবিত এবং প্রগাঢ় হইয়াছিল। আমরা তাঁহার মাতৃভাবকে আধ্যাত্মিক ভাবে পরিণত করিয়াছিলাম।" "His conceptions were all mythological, our conceptions were purely monotheistic" "তাঁহার সমুদয় ধারণা কাল্পনিক দেবদেবীর ভাবে পরিপূর্ণ ছিল; আমাদের ধারণা বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ।" "By associating with him we learnt better Divine attributes as scattered over the 330 millions of Deities of mythological India. the God of the Purans. By associating with us he learnt to realize better the undivided Deity, the God of the Upanishad, the Akhanda Sachchida nanda." "তাঁহার সংসর্গে পৌরাণিক ভারতের ইতস্ততঃ বিকল্প ঈশ্বরের প্রকৃতি, বাহ্য তেজস্বী কোটি দেবদেবী বলিয়া উল্লিখিত, তাহা পূর্বাগেক উত্তমরূপে ধারণা করিতে শিক্ষা করিয়াছি; আমাদের সহবাসে তিনি উপনিষদের অখণ্ড সচ্চিদানন্দের ভাব উপলব্ধি করিতে শিক্ষা করিয়াছেন।" তত্ত্বমঞ্জরী ১৮০৮ শক, ২য় ভাগ, ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা ৭১ পৃষ্ঠা। কিন্তু এই মহাত্মা কর্তৃক ১৮৭১ সালের ষষ্ঠিক কোরাটাবলী রিভিউ নামক পত্রিকার ৩৩ পৃষ্ঠায় বাহ্য লিখিত হইয়াছিল, তাহা উদ্ধৃত করা যাইতেছে। "What is his religion? It is Hinduism, but Hinduism of a strange type. Ramkrishna Paramhansa, for that is the saint's name, is the worshipper of no particular Hindu God. He is not a Shivite, he is not a Shakta, he is not a Vaishnava, he is not a Vedantist. Yet he is all these. He worships Shiva, he worships Kali, he worships Rama, he worships Krishna and is a confirmed advocate of Vedantist

সরস করিয়া ফেল।” ষষ্ঠতর ১৮০৯ শক, ১লা আশ্বিন ১২৫ পৃষ্ঠা ৮ লাইন। কেশব বাবুর ভিতর স্বচ্ছ ও পরিষ্কার না থাকিলে, পরমহংসদেবের ছায়া কখনই পতিত হইতে পারিত না। এক দিকে কেশব বাবু এবং তাঁহার সম্প্রদায় পরমহংসদেব হইতে যেরূপে তাঁহাদের অবস্থানরূপ ধর্ম গঠন করিতে হয়, তাহার বিশেষ সুবিধা পাইলেন। পরমহংসদেবও কেশবের ছায় বুদ্ধিমান, doctrines. He is an idolator and is yet a faithful and most devoted meditator of the perfections of the one formless, infinite Deity, whom he terms, Akhanda Sachchidananda.” “তাঁহার ধর্ম কি? হিন্দুধর্ম, কিন্তু ইহা এক আশ্চর্য্য প্রকার হিন্দুধর্ম। সাধু রামকৃষ্ণ পরমহংস কোন বিশেষ হিন্দু দেবতার উপাসক নহেন। তিনি শৈবও নহেন, শাক্তও নহেন, বৈষ্ণবও নহেন এবং বৈদান্তিকও নহেন। কিন্তু এ সকলই তিনি। তিনি শিবের উপাসনা করেন, কালীর উপাসনা করেন, রামের উপাসনা করেন, কৃষ্ণের উপাসনা করেন, এবং বেদান্ত মতের দৃঢ় সমর্থনকারী। তিনি একজন গোষ্ঠ-লিকও বটেন, কিন্তু অদ্বিতীয় নিরাকার এবং অনন্ত ঈশ্বরের পূর্ণত্বের একান্ত উৎসর্গীকৃত অম্লরক্ত ধাতা, বাঁহাকে তিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বলিয়া অভিহিত করেন।” “To him each of these deities is a force, an incarnated principle tending to reveal the supreme relation of the soul to that eternal and formless Being who is unchangable in his blessedness and light of wisdom.” “তাঁহার নিকট এই প্রত্যেক দেবতাই সেই সনাতন চিদানন্দ এবং নিরাকার সত্ত্বার সহিত মানবাত্মার মহোচ্চ সম্বন্ধ আবিষ্কারক একটী শক্তি এবং আকারে পরিণত তত্ত্ব।” “These incarnations, he says, are but the forces (Shakti , and dispensations (Leela) of the eternally wise and blessed (Akhanda Sachchidananda) who never can be changed,nor formulated, who is one endless and everlasting ocean of light, truth and joy.” “তিনি বলেন যে, এই সকল অবতার সেই অনন্ত জ্ঞানময় এবং করুণা-নিদান অখণ্ড সচ্চিদানন্দের লীলা এবং শক্তি। যিনি পরিবর্তন এবং নিরাকরণহীন। যিনি অদ্বিতীয়, অসীম এবং অখণ্ড সং চিৎ এবং আনন্দের সমুদ্র।” “He would sometimes say, the incarnations forsook him, his mother the Vidyashakti Kali stood at a distance, Krishna could not be realized by him, either as Gopal the child, or swami, the lord of the heart and neither Rama nor Mahadev would offer him much help. The nirakar Brahma would swallow everything and he would be lost in speechless devotion and rapture.” “তিনি কখন কখন বলেন যে, রূপাদি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতেছে। তাঁহার মাতা বিদ্যাশক্তি কালী দূরে আছেন, কৃষ্ণকে বাৎসল্য ভাবে গোপালরূপে অথবা মধুর ভাবে স্বামীরূপে অনুভব করিতে পারিতেছেন না। রাম কিম্বা মহাদেবও তাঁহাকে সাহায্য করেন না। নিরাকার

বিচক্ষণ, ভক্তিপরায়ন লোক সে পর্য্যন্ত আর বিত্তীয় প্রাপ্ত হন নাই। তিনি বারী বলিতেন, যে ভাবে কথা কহিতেন, তাহা কেশব বাবু সমুদায় বুঝিতে পারিতেন কি না, জানি না; কিন্তু আপন ভাবেই হউক, অথবা অল্প কোন ভাবে গঠিত করিয়াই হউক, তাহা আয়ত্ত করিয়া লইতেন; বাক্য বিতণ্ডা করিয়া নিজ মত কখন প্রবল করিতে চেষ্টা করিতেন না, কিম্বা ইহা কখন মনেও স্থান দিতেন না। যখন কোনও মতে বুঝিতে না পারিতেন, তখন পরমহংসদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া লইতেন। এই নিমিত্ত পরমহংসদেব কেশবের সহিত বাক্যালাপ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইতেন। ফলে, কেশব বাবু হইতেই পরমহংসদেব এক প্রকার প্রচার কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন।

পরমহংসদেব কখন কখন ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া উপাসনাদি শ্রবণ করিয়া যাইতেন। একদা উপাসনাস্তে পরমহংসদেব কেশব বাবুকে ডাকিয়া কহিয়াছিলেন, “কেশব! তুমি বলিলে যে, ভক্তি-নদীতে প্রীতি কমল প্রফুল্লিত হইলে—ভাল জিজ্ঞাসা করি, নদীতে কি কখন পদ্ম ফুটিতে দেখিয়াছ? পুষ্করিণীতে কিম্বা অগ্নিবদ্ধ জলাশয়ে পদ্ম জন্মে। কোন্ নদীতে পদ্ম দেখিয়াছ? অতএব এ উপাশাটী অসংলগ্ন হইয়াছে। আর এক কথা তুমি বলিয়াছ যে, ভক্তি-নদীতে ডুব দিয়া চিদানন্দ সাগরে চলিয়া যাও। ইহা তোমার কি ভাব? নদী সকল সাগরের সহিত মিলিত হইয়া আছে, কিন্তু তুমি নদীতে ডুব দিয়া সাগরে যাইবে কিরূপে? একবার ডুবিয়া দেখ দেখি, যাইতে পার কি না? পশ্চাতে যে পায়ে দড়ি বাধিয়া পুত্র

ব্রহ্ম সমুদায় গ্রাস করিয়া ফেলে এবং তিনি নির্ঝাঁক আনন্দ এবং ভক্তিরসে নিমগ্ন হইয়া যান।”

“But so long as he is spared to us, gladly shall we sit at his feet to learn from him the sublime precepts of purity, unworldliness, spirituality and inebriation in the love of God.” “কিন্তু যতদিন তিনি আমাদের নিকট জীবিত আছেন, আমরা আনন্দের সহিত তাঁহার চরণতলে উপবেশন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে পবিত্রতা, বৈরাগ্য, চিরবাসনাশূন্য আধ্যাত্মিকতা এবং ভগবৎপ্রেমাগন্ততা সম্বন্ধীয় অত্যাচ্ছ উপদেশ শিক্ষা করিব।” তত্ত্বমঞ্জরী ১৮-১৮ শ্লোক, ২য় ভাগ, বই ৩ সপ্তম সংখ্যা, ১১৬ পৃষ্ঠা। প্রতাপ বাবু পরমহংসদেবের জীবদ্দশায় তাঁহাতে ধর্মের সকল ভাবই দেখিয়াছিলেন, কিন্তু পরলোক যাত্রার পর তাঁহাকে একটি কিণ্ডুত কিষাকার ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। এ প্রকার সত্য অপলাপ করিবার হেতু কি? তাঁহার ভাব হইতে নববিধান গ্রহণ করা হইয়াছে, এ কথা পাছে প্রকাশ হইয়া পড়ে, সেই অন্য আপনাদের সুবিধা মত তাঁহাকে বর্ণনা করা হইয়াছে। এ কথা ভিন্ন আর কি বলা যাইবে?

পরিবার দাঁড়াইয়া আছে, তাহা ভুলিয়া গিয়াছে ? যদি বল যে, নদীতে আলিয়া শরীর স্নিগ্ধ হইয়াছে, এখন গাত্রদাহ নিবারণ হওয়ায় বল পাইয়াছি, ডুব দিয়া দড়ি কাটিয়া পলাইয়া যাইব, কিন্তু তাহা পারিবে না। যাহাদের সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি, (তথাকার উপস্থিত মহিলাদিগকে দেখাইয়া) ওঁদের দশা কি হইবে ? সংসারে থাকিয়া যত দিন ঈশ্বর-সাধন করিবে, ততদিন একেবারে ডুব দিয়া সাগরে না যাইয়া এক একবার নদীর কিনারায় উঠিও।”

পরমহংসদেবের উপদেশ সকল নিতান্ত কঠোর ও রসহীন নহে। তিনি নিজে রসিক-চুড়ামণি ছিলেন, সেইজন্ত তাঁহার এক একটা উপদেশ রসে ঢল ঢল করিতে থাকে। একদিন কেশব বাবুকে দক্ষিণেশ্বরে রজনী স্থাপন করিবার জন্ত পরমহংসদেব আজ্ঞা করিয়াছিলেন। কেশব বাবু নানাবিধ কারণ দেখাইয়া সন্ধ্যার পূর্বেই চলিয়া আসিতে মনস্থ করিলেন। পরমহংসদেব তচ্ছবণে কহিয়াছিলেন, “বাস্তবিক আমার এরূপ অনুরোধ করা ভাল হয় নাই। আস্ চুব্ ডো না হইলে কি তোমাদের ঘুম হয় ? আমার একটা গল্প মনে হইতেছে। কোন গ্রামে দুই জন ধীবর কার্য্যাহুরোধে গ্রামান্তরে গমন করিয়াছিল। প্রত্যাগমনের সময় পথিমধ্যে সন্ধ্যা হইল। পথটা নিতান্ত দুর্গম, দুই পাশ্বে বন, রাত্রে দিগ্বিদিক্ কিছুই দেখা যায় না। কোথায় যাইবে, বিবেচনা করিয়া নিকটস্থ এক উচ্চানে প্রবেশ পূর্বক মালির গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিল। একে পুষ্পোদ্ভান, তাহাতে রাত্রিকাল, নানা জাতীয় ফুলের সৌরভে বাগানটা আশোদিত করিয়া রাখিয়াছে। ধীবরদিগের স্থান পরিবর্তন বিধায় এবং পুষ্প-সৌরভ তাহাদের চির অভ্যস্ত শুক মৎস্তের দুর্গন্ধ-ভোগের নাসারন্ধ্রে অসহ্য হওয়ায় কিছুতেই নিদ্রাকর্ষণ হইল না। যত মন্দ মন্দ সমীরণ পুষ্পের সুগন্ধকণা তাহাদের নিকট সঞ্চালিত করিতে লাগিল, ততই তাহাদের ক্রেশের পরিসীমা রহিল না। অবশেষে তাহারা উঠিয়া বসিল এবং কত ক্ষণে রজনী শেষ হইবে, এই ভাবিয়া ছট্ ফট্ করিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইয়া আসিল, এমন সময়ে কয়েকজন ধীবর-কণ্ঠা মন্তকে মৎস্তের ঝুড়ি লইয়া মৎস্ত ক্রয় করিতে যাইতেছিল। তাহাদের দেখিয়া ধীবরেরা উর্জ্জ্বাসে দৌড়াইয়া গিয়া তাহাদের নিকট হইতে মৎস্তের ঝুড়ি লইয়া তন্মধ্যে মন্তক প্রবিষ্ট করিয়া দিল এবং আশ্রণ লইয়া এতক্ষণে বাটলাম বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। তাই ত, কেশব ! ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের নেতা হইয়া আজও রেড়ীর কলটী বন্ধ করিতে পারিলে না ?

ইহা নিতান্ত কুলক্ষণ জানিবে।” কেশব বাবু কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া এই বাক্যগুলি শিরোধার্য জ্ঞান করিয়া লইয়াছিলেন।

পরমহংসদেবের উপদেশে কেশব বাবু নিতান্ত আশ্বহারা হন নাই। তাঁহার নিজস্ব ভাব বিসর্জন দিয়া পরমহংসদেবের ভাবগুলি লইয়া একেবারে পরিবর্তিত হইয়া যান নাই। যদিও সেই উপদেশগুলি রত্নভাণ্ডারে সংস্থাপন করিয়া রাখিয়াছিলেন, যদিও তাহার কিয়দংশ “পরমহংসের উক্তি” বলিয়া কুদ্র পুস্তকাকারে ছাপাইয়াছিলেন, কিন্তু অধিকাংশ ভাব নিজের মতে পুনরায় গঠন করিতে যাইয়া বিকৃত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন যে, এক ঈশ্বর, তাঁহার অনন্ত শক্তি, প্রত্যেক শক্তির স্বতন্ত্র ভাব এবং স্বতন্ত্র রূপ। মনুষ্যগণ এক জাতি পদার্থ দ্বারা সংগঠিত হইয়াও আকৃতি ও প্রকৃতিতে প্রত্যেককে স্বতন্ত্র বলিয়া দেখা যায়। কোন ব্যক্তির মুখ কাহার সহিত সমান নহে। কিম্বা যেমন জল এক পদার্থ। কেহ তাহাকে পানি, কেহ বারি, কেহ নীর, কেহ ওয়াটার (water) এবং কেহ একোয়া (aqua) বলে। এখানে ভাষার সম্পূর্ণ প্রভেদ রহিয়াছে। ওয়াটার কিম্বা একোয়া বলিলে ইংল্যান্ডী কিম্বা ল্যাটিন বিদ্বানভিজ্ঞ ব্যক্তি কিছুই বুঝিতে পারিবে না বলিয়া, ইংরাজের কি ভাবান্তর হইয়াছে বলিতে হইবে? কখনই নহে। সেই প্রকার এক ঈশ্বরকে, যে যে ভাবেই উপাসনা করুক, তাহাতে কোন দোষ হয় না। কেশব বাবু একটী নূতন কথা গুলি-লেন। সাম্প্রদায়িক ধর্মের জন্য পৃথিবী বিখ্যাত। সকল দেশের ধর্ম সম্প্রদায়ে এই ভাব জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। ভারতবর্ষ ধর্মের জন্য চির-প্রসিদ্ধ, তাই এ দেশে ঘরে ঘরে সম্প্রদায়। খৃষ্টমতাবলম্বীরা ধর্ম প্রচার করিতে সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া আসিয়াছেন। সাম্প্রদায়িকতার আর অন্য দৃষ্টান্তের প্রয়োজন কি? সকলেই মনে করেন, তাঁহার ধর্মটী প্রেষ্ঠ; কিন্তু পরমহংসদেব সকলের মান রাখিয়াছিলেন। তিনি ধর্ম-জগতের এই আভ্যন্তরিক বিবাদ তত্ত্বন করিবার জন্য স্বয়ং সাধক হইয়াছিলেন, তাই তিনি জোর করিয়া বলিতে পারিতেন, সকলের ধর্মই সত্য, সকলেই এক জনের উপাসনা করিয়া থাকে। কেশব বাবু এই ভাববিকৃত করিলেন। বর্তমান শতাব্দীতে ইংরাজ কর্তৃক হিন্দু শাস্ত্র ভাবান্তর হইলে, উহা আমাদের পাঠোপযোগী হইয়া থাকে। সেই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা হিন্দু ধর্ম শিক্ষা করিয়া থাকি। ইহা আমাদের নিতান্ত পৌরুষের কথা নহে। এই জন্যই হিন্দুদের দুরবস্থার একশেষ হই-

যাচ্ছে। এই অবস্থায় আমরা আমাদের ধর্মের মর্ম যে প্রকার বুঝিয়া, থাকি, তাহা আর পরিচয়ের প্রয়োজন নাই। কেশব বাবু তাহা প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছিলেন। তিনি একটা যে নূতন ভাব লাভ করিয়াছেন বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ভ্রম হয় নাই। কিন্তু কালের কি প্রভাপ! পৃথিবীর কি আশ্চর্য কাণ্ড! কেশব বাবু সে ভাব আর এক প্রকারে দাঁড় করাইলেন। এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের অনন্ত ভাব। অনন্ত ভাবের পরিচয় অনন্ত ব্যক্তি, যে ব্যক্তির যে ভাব, সেই ব্যক্তি সেই ভাবের পরিচায়ক। তাহা না বলিয়া, তিনি সকল ভাবের সমষ্টি করিয়া এক স্থানে দেখাইতে চেষ্টা করিলেন। তাহার নাম “নববিধান” দেওয়া হইল। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ও বৌদ্ধ প্রভৃতি সকল ধর্মের সারভাগ মছন করিয়া এই নূতন বিধানের সৃষ্টি হইল। ইহা তাঁহার নিতান্ত বুঝিবার দোষ হইয়াছিল। তিনি ভাবরাজ্যে প্রবেশ করিবার পূর্বেই স্বভাব হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। স্বকপোলকল্পিত ভাব কি, ধর্মজগতে এক মুহূর্ত্ত থাকিতে পারে? এত আকাশ কুসুম নহে যে, যাহা বলিলাম, কেহ ধরিতে পারিবে না? ধর্ম প্রাণের আরাম, ঈশ্বর প্রত্যক্ষ বস্তু, যে কেহ খুঁজিবে, সেই পাইবে, সেই বুঝিবে, তাহাতে গোঁজা মিলন চলিতে পারে না। সত্যের জয় চিরকাল। কেশব বাবু পরমহংসদেবকে চাপা দিয়া যাইলেন। নববিধানের ঢোল বাজিয়া উঠিল—বিধানপতাকা পং পং করিয়া গগনমার্গে উড্ডীয়মান হইল। কিন্তু তাহা আর নাই। সে নিশান ছিন্ন ভিন্ন, সে ঢোল ফাঁসিয়া গিয়াছে। সত্য প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে* ।

* কেশব বাবু কখন কোন প্রকাণ্ড স্থানে অথবা কোন পুস্তকে কিম্বা সংবাদপত্রে পরমহংসদেব সম্বন্ধে তাঁহার নিজের ভাব কিছু প্রকাশ করিয়াছেন কি না, তাহা আমরা অবগত নহি। আমাদের যত দূর জানা আছে, তাহাতে তিনি কিছু বলেন নাই, এই বিশ্বাস। কারণ “নববিধান” নামক গ্রন্থের পঞ্চম পৃষ্ঠায় কেশব বাবু যাহা নববিধানের নূতন বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা পরমহংসদেবের কথা, ভিন্ন অর্থে স্বনামে প্রকাশিত হইয়াছে—যথা ঈশ্বর দর্শন ও তাঁহাকে স্পর্শন করা যায়, প্রত্যক্ষ নহে—ভাবে। নিরাকার ঈশ্বরকে নিরাকারে স্পর্শন করা যায়। এই সকল বিষয়ের ভাবচ্যুতি হইয়াছে। সর্বধর্মসম্বন্ধের ভিতরেও বিশেষ পোলযোগ রাখিয়াছে। তিনি জ্ঞানী, কর্মী, ভক্ত, খৃষ্ট প্রভৃতির নামোল্লেখ করিয়া তাহাদের বথান্থান নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ যে ধর্মের যেটা সার, তিনি তাহা এক স্থানে সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহাই নবভাব, কিন্তু আত্মপের বিষয় এই যে, ভাববিশেষ লাভ করিতে হইলে, তাহার সাধন চাই। বিনা সাধনে কি সাধ্য বস্তু লাভ হইতে পারে? বৈষ্ণবদিগের প্রেম উত্তম, তাহা তিনি লইয়াছেন, ক্রিপণে লইলেন? বৈষ্ণবমতে কি তিনি

কেশব বাবু একজন পণ্ডিত এবং পরমহংসদেব সে সম্বন্ধে নিরঙ্কর ছিলেন। কেশব বাবু কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তির পুত্র, পরমহংসদেব সাত টাকা বেতনের দেবালয়ের কর্মচারী; এমন ব্যক্তির পদে মন্তকাবনত করা সামান্য কথা নহে। আমরা দেখিয়াছি, কেশব বাবু পরমহংসদেবকে যে প্রকার শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন এবং পরমহংসদেবও কেশব বাবুকে যে প্রকার ভালবাসিতেন, তেমন আমরা আর দেখি নাই বলিলে অত্যাক্তি হয় না। কেশব বাবু যখন পরমহংসদেবের নিকট গমন করিতেন, তিনি হিন্দুদিগের দেবদর্শনে যাইবার পদ্ধতি অবলম্বন পূর্বক পুষ্প কিম্বা একটা ফল লইয়া যাইতেন। উহা তিনি গুপ্তভাবে প্রদান করিতেন এবং আসিবার সময় চরণ-স্পর্শিত কোন একটা দ্রব্য লইয়া আসিতেন। কেশব বাবু পরমহংসদেবকে তাঁহা হইতে কত উচ্চ জ্ঞান করিতেন, তাহা একটী দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝা যাইবে। একদিন পরমহংসদেব কেশব বাবুকে কিছু উপদেশ দিতে বলিয়াছিলেন। কেশব বাবু হাসিয়া বলিয়াছিলেন, “কামাক্সের দোকানে কি হুচিকা বিক্রয় করা সাজে?”

কেশব বাবু নববিধান রচনা করিয়া, পরিশেষে আপনি তাহার বিষময় ফল অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মকে এক করিয়াছিলেন, কিন্তু গোটাকতক স্বজাতীয় লোককে এক মতে রাখিতে পারেন নাই।

কেশব বাবু শেষাবস্থায় পরমহংসদেবকে চৈতন্তের অবতার বলিয়া কোন কোন ব্যক্তিকে বলিয়াছেন। একদিন ভূতপূর্ব বাঙ্গালা দপ্তরের সহকারী সম্পাদক বাবু রাজেন্দ্রনাথ মিত্র কেশব বাবুকে পরমহংসদেবের ঈশ্বর-পরায়ণতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। কেশব বাবু তাহাতে বলিয়াছিলেন যে, শাস্ত্র হইতে প্রেমভাব মহাভাব প্রভৃতি যে সকল লক্ষণ জানা যায়, তাহা সকল সাধকে পরিলক্ষিত হয় না। মহাভাবের লক্ষণ এ প্রদেশে চৈতন্তের ছিল

পরমহংসদেবের মত সাধন করিয়াছিলেন? শক্তি না হইলে শক্তির ভাব বুঝিবে কে? মুসলমান হইয়া সাধক না হইলে মহামদীয় ভাব আয়ত্ত হইবে কিরূপে? খ্রীষ্টান ধর্ম আলোচনা না করিলে কি খ্রীষ্টকে জানা যায়? মুখের কথা এবং বুদ্ধির বিচারে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। এই সকল কারণে কেশব বাবু নিতান্ত ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন এবং পরমহংসদেবের প্রকৃত ভাব বুঝিয়াই হউক, কিম্বা না বুঝিয়াই হউক, তিনি যে ভিন্ন ভাবে একটি করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা এতদ্যক নিরপেক্ষ ব্যক্তি স্বীকার করিবেন।

এবং বিজ্ঞাতীয়দিগের মধ্যে ঐশ্বর মহাভাব হইত ; এই বলিয়া তাঁহার গৃহের একখানি ছবি দেখাইয়া দিলেন । পরমহংসদেবের এই ভাব হয়, তজ্জন্তু অশ্বেকে তাঁহাকে চৈতন্ত্যাবতার বলিয়া মনে করেন ।

কেশব বাবু যখন পীড়িতাবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, তখন পরমহংসদেব তাঁহাকে দেখিতে আসিয়া বলিয়াছিলেন, বাগানে ফুল ফুটলে উদ্ভান-স্বামী উহা ছিঁড়িয়া লয় অর্থাৎ তোমার মনরূপ ভক্তি-পুষ্প এখন ফুটিয়াছে, উহা মাতার চরণপ্রান্তে যাইয়া চিরদিনের মত পতিত হউক । কেশব বাবুর পরলোক যাত্রায় পরমহংসদেব বিশেষ বিধাদিত হইয়াছিলেন । কেশব বাবু আর কিছু দিন জীবিত থাকিলে কি হইত, বলা যায় না । বিজয় বাবুকে • দেখিয়া এখন নানাবিধ ভাব মনে আসিয়া থাকে ।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ*

ইতিপূর্বে কথিত হইয়াছে যে, ভারতবর্ষের প্রায় সকল সাধুরই সহিত পরমহংসদেবের পরিচয় ছিল, কিন্তু অপর সাধারণ লোকে এমন কি, দক্ষিণেশ্বর-নিবাসী ভদ্রলোকেরা তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিত না । দক্ষিণেশ্বরের যে সকল লোকের সহিত তাঁহার আলাপ ছিল, তাহারা তাঁহাকে পাগল বলিয়া স্থির নিশ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল । অত্যাপি তথাকার অনেকেরই এই ধারণা আছে । কেশব বাবুর গতিবিধি হওয়ায় লোকের কিঞ্চিৎ চমক্ হইয়াছিল এবং ভক্ত সাধু বলিয়া তিনি কাগজে লিখিতেন ও অনেকের নিকটে গল্পও করিতেন, ইহা দ্বারা অপর সাধারণে তাঁহাকে জানিতে পারিয়াছিলেন । কিন্তু পরমহংসদেব যে একজন অতি মহান ব্যক্তি, এ প্রকার ধারণা করিয়া দিবার জন্ত কেহই চেষ্টা করেন নাই ।†

* বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী—কয়েক বৎসর হইল দেহত্যাগ করিয়াছেন ।

† চেষ্টা করা দূরে থাক, আমরা যখন তাঁহার নিকট গতিবিধি করিতাম, কেশব বাবুর কোন শিষ্য আমাদের তথা হইতে ভাড়াইয়া স্বদলভুক্ত করিবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিলেন । কেশব বাবু নাকি কহিয়াছিলেন যে, পরমহংস মহাশয় কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী, তাঁহার নিকটে গৃহীত পোষাইবে না । তিনি একদিন কুটুস করিয়া কামড়াইয়া ধরিলেন । সে দিন উহাদের (আমাদের) কি হইবে? আমাদের মধ্যে সকল ভাবই আছে ।” কেশব বাবুর উক্ত শিষ্য মহাশয়ের সহিত একদিন গুরুতত্ত্ব লইয়া আমাদের অনেক কথা হয় । সেই

লোকের স্বার্থপরতাদোষ বশতঃই হউক, কিম্বা পরমহংসদেব জনতা হওয়া ভালবাসিতেন না বলিয়াই হউক, সাধারণের মনে উক্ত ধারণা করিয়া দিতে কি “জন্তু কাহার সাহস হয় নাই, তাহা বলিতে পারা দুঃসাধ্য। ফলে, সর্বসাধারণের তদ্বারা বিলক্ষণ ক্ষতি হইয়াছে। আজ কাল ধর্মশাস্ত্রের সারমর্মোদ্ধার করা অতিশয় শ্রুতকঠিন। বিশেষতঃ, বর্তমান বিজাতীয় ভাব-সঙ্কর কালে পরমহংসদেবের জ্ঞান আচার্য্যের বিশেষ প্রয়োজন এবং সেই নিমিত্তই তাঁহার শুভাগমন হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। সে বাহা হউক, পরমহংসদেব আর রাস-মণির কালীবাটীর কেবল এক জন বাতুল বলিয়া বিষয়বাতুলদিগের নিকট পরিচিত রহিলেন না। তাঁহার নিকটে দলে দলে পণ্ডিত, জ্ঞানী এবং ধর্ম-পিপাসু ব্যক্তিদিগের সমাগম হইতে আরম্ভ হইল। যিনি একদিন গিয়াছেন, তিনি আর তাঁহাকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই।

পরমহংসদেব ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগকে দেখিতে পারিতেন না এবং তাঁহারা তাঁহার কাছে বাইলে, এমন ভাবে কথা কহিতেন যে, তাঁহারা আর প্রাণান্তেও তথায় বাইতেন না।*

একদা কৃষ্ণদাস পাল, মহারাজা ও রাজা বাহাদুর প্রভৃতি স্নসভামণ্ডলীতে তাঁহাকে আহ্বান করা হইয়াছিল। কৃষ্ণদাস বাবু সে সময়ে সভ্যদিগের মুখপাত ছিলেন। এখানেও তিনি অগ্রভাগে গিয়া পরমহংসদেবকে কহিয়া-ছিলেন, “বৈরাগ্য শাস্ত্র এদেশের সর্বনাশ করিয়াছে। সকল বস্তু এ দেশে অসার বলিয়া শিক্ষা দেওয়া সেকালের কথা। এইরূপ শিক্ষার দোষে আজ ভারতবর্ষ পরাধীন। বাহাতে আপনার এবং দেশের হিতসাধন হয়, এমন উপদেশ দিবেন।” পরমহংসদেব মুহূ হাস্তে বলিয়াছিলেন, “তোমার মত রাঁড়িপুত + বুজির লোক আর দেখা যায় না। তুমি কি বলিতেছ? জীবের

সকল কথা কেশব বাবুকে বলায়, তিনি কহিয়াছিলেন যে, উহাদের আর বেঁটাইয়া কাজ নাই।

* অনেকে মনে করেন যে, ধনী ব্যক্তিদিগকে পরমহংসদেব বিশেষ ভালবাসিতেন, কিন্তু এ কথা মনে করা সম্পূর্ণ ভুল। কোন্ ধনী ব্যক্তি তাঁহার নিকট একবারের অধিক গিয়াছে? এবং শিষ্যদিগের মধ্যেই বা ধনী কে? তিনি ধনীর মনরাখা সাধু হইলে, কোন্ কালে মোহন্ত হইয়া বসিয়া থাকিতেন।

+ স্বাধীবিহীন রাজলোকেরা গৃহস্থের বাটীতে পরিচারিকা বৃত্তিধারা বে সন্তানকে লেখা পড়া শিখাইয়া মাদ্রুৎ করে, সে পরে দশ টাকা উপার্জনকর হইলেও ঐয় নীচপ্রকৃতিবিশিষ্ট হইয়া থাকে। তাহার হৃদয় ও মন কখন প্রশস্ত হইতে পারে না।

হিতসাধন করিবে? কি হিত করিবে, আমায় বুঝাইয়া দিতে পার? তোমরা যাহাকে হিত বল, তাহা আমি জানি। পাঁচজনকে অন্ন দেওয়া এবং ঋষি হইলে চিকিৎসা করা, একটা রাস্তা করা কিম্বা একটা পুষ্করিণী বুঝাইয়া দেওয়া রহিত করা; একে ত বল হিতসাধন? হিত—কিয়ৎপরিমাণে বটে। কিন্তু বল দেখি, মানুষের শক্তিতে এই হিত কতদূর সাধিত হইতে পারে? অন্নকষ্ট নিবারণ করিবে? এক কষ্ট হইল কেন? কারণ, ঈশ্বর প্রচুর ধাত্তাদি দেন নাই। তোমরা নানাস্থান হইতে চাউল লইয়া দুর্ভিক্ষ নিবারণের চেষ্টা পাইলে, কিন্তু তাহাতে কি ফল হইল? কত লোককে বাঁচাইলে? সত্য বল, উড়িয়া ও মাদ্রাজের দুর্ভিক্ষে কত লক্ষ নরনারী অনাহারে মরিয়া গিয়াছে? তোমাদের চেষ্টার ত ফল হয় নাই, অর্থের অনাটন ছিল না, তবে লোক রক্ষা হইল না কেন? ‘মালোয়ারি’ জ্বরে এক একটা দেশ জনশূন্য হইয়া গিয়াছে। ঔষধে কি করিল? যাহারা বাঁচিয়াছে, ঔষধ না দিলেও তাহারা বাঁচিত। হিত করিবে বলিয়া মনে অহঙ্কার কর, কিন্তু জগৎখানা কি? কত বিস্তীর্ণ, তাহার কোন জ্ঞান আছে? জীব বলিলে কেবল মনুষ্য বুঝায় না। যত প্রাণী এই জগতে আছে, সকলের আহার যোগ্যকে? ইহাদের রক্ষা করে কে? ঈশ্বর বলিয়াছেন, মনুষ্যের আত্মাভিমান দেখিয়া তিনি তিনবার হাসিয়া থাকেন। কোন ব্যক্তির আসন্ন কাল উপস্থিত হইলে, চিকিৎসক যখন জোর করিয়া বলে, ভয় কি, আমি বাঁচাইয়া দিব। এই একবার তিনি হাসিয়া থাকেন। তাই ভয়ে বিবাদ করিয়া হুত্র ফেলিয়া যখন জমি ভাগ করে, তখন তাঁহার দ্বিতীয় বার হাসা এবং এক রাজা যখন অপরের রাজ্য কাড়িয়া লয়, তখন তিনি তৃতীয় বার হাসিয়া থাকেন। বাবু! গঙ্গায় কাঁকড়ার বাচ্চা হয়, দেখেছ? অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে তুমি একটা কাঁকড়ার বাচ্চাবিশেষ; জীবের হিত করিবে মনে করিলে পাপ হয়!” কৃষ্ণদাস বাবুর আর কথা চলিল না, তিনি অবাক হইয়া রহিলেন। জনৈক মহারাজা বাহাদুর আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি কৃষ্ণদাসের রক্ষার্ধসম্মুখীন হইলেন; কিন্তু তেজোয়ান সাধুর নিকটে কি রাজা নবাব কেহ অগ্রসর হইতে পারেন? রাজা উপাধি ধনের জন্ত, যাহারা ধনের কান্দাল, তাহারা রাজার সম্মান রক্ষা করে। সাধুরা ধনকে কাকবিষ্ঠাবৎ জ্ঞান করিয়া থাকেন। সেই সাধুর নিকটে কি ধনীর মর্যাদা থাকে? যাহারা ধনের মর্যাদা মুক্তিকার জায় অকিঞ্চিৎকর বোধ করেন, তাঁহাদের নিকটে ধনীও অকিঞ্চিৎকর, হয়ে বস্তু বলিয়া পরিগণিত

হইয়া থাকে। সুতরাং রাজাবাহাদুরকে সেই সভাস্থলে নানা প্রকার কথা শ্রবণ করিতে হইয়াছিল।

আমরা সহরে সময়ে সময়ে নানাবিধ বুজবুজদার সাধু দেখিতে পাই। তাহারা ধনীদিগের বৈঠকখানায় ঠাট্টা, তামাসা ও পাঁচশত খোসামোদ করিয়া নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করিয়া লইবার সুযোগ অন্বেষণ করিয়া থাকে। ধনীদিগের সেই সংস্কার ছিল। কিন্তু পরমহংসদেব যে সে শ্রেণীর নহেন, তাহা তাঁহারা অনুমান করিতে পারেন নাই। ধনীদিগের মধ্যে পাধুরিয়াঘাটার যত্নলাল মল্লিক সর্বদা পরমহংসদেবের সহবাস ভালবাসিতেন। যত্ন বাবুর কিঞ্চিৎ সাত্বিক ভাব ছিল, সেই জন্য পরমহংসদেবও তাঁহাকে ভালবাসিতেন। আমরা তাঁহার সহিত অনেকবার যত্ন বাবুর বাগানে গমন করিয়াছি। যত্ন বাবু পরমহংসদেবের নিকট উপদেশ শুণিতেন। যত্ন বাবুর মাতা পরমহংসদেবকে বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন এবং প্রায়ই তাঁহাকে বাটীতে লইয়া গিয়া ধর্মোপদেশ লইতেন।

ধনী ব্যক্তির পরমহংসদেবকে লইতেন না এবং তিনিও তাঁহাদের সহিত কথা কহিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেন না। ক্রমে ইহাদের দল কমিয়া আসিল। কলিকাতার মধ্যে কয়েকজন মধ্যবিত্ত লোক তাঁহার নিকট সর্বদা গমনাগমন করিতেন। সিন্দুরিয়াপটীর মনিলাল মল্লিক (ইনি ব্রাহ্ম চং এর লোক, কিন্তু ইহার একটা বিধবা কন্যা পরমহংসদেবের বিশেষ অনুগ্রহীতা পাত্রী ছিলেন) মাধাঘসার গলির জয়গোপাল সেন, ইনিও ব্রাহ্ম; কলিকাতার ভূতপূর্ব ডেপুটি কলেक्टर অধরলাল সেন, ইনি শাক্ত ছিলেন। অধর বাবুর বাটীতে একদিন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহিত পরমহংসদেবের সাক্ষাৎ হয়। পরমহংসদেব তাঁহাকে বঙ্কিম (বাঁকা) বলিয়া রহস্য করিয়াছিলেন। নেপাল রাজ্যের প্রতিনিধি বিশ্বনাথ উপাধ্যায় পরমহংসদেবের নিতান্ত অনুগত ভক্ত ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে নানাবিধ জনশ্রুতি আছে। উপাধ্যায় প্রথমে নেপালীদিগের যুসুড়ির সালকাঠের কারখানায় একজন কর্মচারী ছিলেন। একদিন স্বপ্নে দেখিলেন যে, এক ব্যক্তি বিষ্ঠার মধ্যস্থলে বসিয়া তাঁহাকে তত্ত্বজ্ঞান দিবার জন্য ডাকিতেছেন। স্বপ্নান্তে তাঁহার মনে নানাবিধ তর্ক উঠিতে লাগিল। বিষ্ঠার মধ্যস্থলে অনুধ্য বসিয়া আছেন, তিনি তর্ক-কথা বলিবেন কি ? তাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির নিশ্চয় করিতে পারিলেন না। কিয়দিন পরে তিনি একদা সহসা দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া উপস্থিত হন; তথায়

• পরমহংসদেবকে দেখিয়া তাঁহার স্বপ্নের কথা শ্রবণ হইল এবং স্বপ্নদৃষ্ট ব্যক্তির স্তায় তাঁহাকে বোধ হইল। উপাধ্যায় বিবশ সঙ্কটে পড়িলেন। তিনি পরমহংসদেবের সম্মুখে যাইবামাত্র যেন পরিচিতের স্তায় আলাপ করিতে লাগিলেন। উপাধ্যায়ের মন, সেই দিন হইতে যেন তিনি কাড়িয়া লইলেন। তদবধি উপাধ্যায় প্রতি সপ্তাহে দক্ষিণেশ্বরে গমন করিতেন এবং প্রতিমাসে পরমহংসদেবকে বাটীতে আনিয়া তাঁহার স্ত্রী দ্বারা পাক করাইয়া ভোজন করাইতেন। পরমহংসদেব একটু পরিকার স্থানে শৌচক্রিয়াদি সমাধা করিতেন। উপাধ্যায় সেইজন্ত বাটীর ছাদের উপর তাম্বু খাটাইয়া তন্মধ্যে পাইখানা নির্মাণ করিয়া রাখিতেন। পরমহংসদেবের ভোজন হইলে, উপাধ্যায় সন্ন্যাসীক তাঁহার সেবা করিতেন। ধন্য উপাধ্যায় ! ধন্য আপনার স্ত্রী ! আপনারাই চরিতার্থ হইয়াছেন ! আপনারা সাধু সেবা করিতে জানিতেন। আপনাদের ভক্তি আমাদের শিক্ষা করিবার বিষয়।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

এ পর্য্যন্ত যে সকল ব্যক্তি গমনাগমন করিতেছিলেন, তাঁহারা কেহ প্রকাশে পরমহংসদেবের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন নাই। পরমহংসদেবের গুরুগিরি ছিল না। তিনি যেন গুরুগিরি চূর্ণ করিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহাকে প্রশংসা করিবার অগ্রে তিনি নমস্কার করিয়া ফেলিতেন। তাঁহার চরণধূলি লইবার কাহারও অধিকার ছিল না। তাঁহাকে গুরু বলিলে অত্যন্ত কাতর হইতেন।

১৮৭৯ সালে আমরা তাঁহার নিকট গমন করিয়াছিলাম। সে সময়ে আমরা জৈনদের অন্তিমে বিশ্বাস করিতাম না। স্বভাবে সকলই হয়, যায়, রয়, এই প্রকার সিদ্ধান্তই ছিল। সুতরাং আমরা এক প্রকার নীরাকারে জন্তবিশেষ ছিলাম। জানিতাম আহার, নিদ্রা এবং মৈথুন। এই কার্যত্রয় সাধনা করিতে যে পারিবে, সেই ব্যক্তিই ধন্য। সুতরাং যাহাতে তদ্বিষয়ে স্নানিপূর্ণ হওয়া যায়, তাহার ব্যবস্থাই হইত। আমাদের যে স্বভাব বর্ণনা করিলাম, এই এখনকার বাজার। আমরা সেইজন্ত বাজার ছাড়া ছিলাম না। আমরা

বেলা একটার সময় উপস্থিত হইয়াছিলাম। তখন তাঁহার গৃহের দ্বার রুদ্ধ ছিল। তাঁহাকে ডাকিব, কি বলিয়া ডাকিব, ভাবিতেছি, এমন সময়ে এক ব্যক্তি আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমাদের প্রাণ যেন শীতল হইল; কিন্তু কে তিনি, তখন জানিতে পারিলাম না। গৃহের ভিতরে যাইয়া প্রণামানন্তর উপবেশন করিলাম এবং মনে হইল যে, ইনিই সেই মহাপুরুষ হইবেন। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, পরমহংসদেব কখন কোনপ্রকার সাধুর পরিচায়ক বেশভূষা করিতেন না। তন্নিমিত্ত অনেকে তাঁহাকে দেখিয়াও চিনিতে পারে নাই। আমাদের সেইদিন সৌভাগ্য-স্বৰ্ঘ্য উদ্ভিত হইল, আমাদের মনের কুসংস্কারের গুদাম সেইদিন পরিষ্কৃত হইল। বিলাতী কু-শিক্ষায় যে সকল বিষয়কে কুসংস্কার বলিয়া অতি যত্নে শিক্ষা করিয়াছিলাম, পুনরায় তাহাদের আদর করিয়া লইতে শিক্ষা পাইলাম। পরমহংসদেব যে জ্ঞান আসিয়াছিলেন, যে জ্ঞান তাঁহার জপ তপ, যে জ্ঞান তাঁহার কার্যকলাপ, যে জ্ঞান তাঁহার প্রচার, সেই দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। নাস্তিকের ঠাকুর, পতিত-পাবন পরমহংসদেব! আপনি আমাদের জ্ঞানই এতদিন ঘুরিয়া বেড়াইতে-ছিলেন! নির্ধন কাকালের জ্ঞান ধনীরা মুক্তহস্ত হইয়া থাকেন। মুক্তহস্ত হইলে কি হইবে, ধন গ্রহণ করে কে? যেমন আমরা কাকাল, যেমন দরিদ্র ছিলাম, যেমন আমাদের সকল স্থানই শূন্য ছিল, তেমনই আমাদের দাতা জটিল। আমরা আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া তাঁহার রত্নভাণ্ডার লুট করিব মনে করিয়া সপরিবারে, সবারূপে, স্বজনবর্গের সহিত কত প্রয়াস পাইলাম, আমাদের সকলের আধার পরিপূর্ণ হইয়া পড়িল; কিন্তু তাঁহার ভাণ্ডার কিছুতেই শূন্য করিতে পারিলাম না—কেহই পারিল না। হায়! হায়! ভাণ্ডারে কত রত্নই ছিল, অগ্রে জানিলে, স্বদেশ বিদেশ হইতে পরিচিত অপরিচিত যে যেখানে আছেন, তাঁহারা না আসিলে অহুন্নয় করিয়া পায়ে ধরিয়া সকলকে দিয়া রত্ন লুট করাইতাম। ক্ষুদ্র আধার, সীমাবিশিষ্ট বুদ্ধি লইয়া বাস করিতেছি, অসীম ব্যাপার বুঝিব কি? তাহা স্থান পাইবে কোথায়?

পরমহংসদেব বাস্তবিকই জ্ঞান-রত্ন ও ভক্তি-মাণিক্যের আকর ছিলেন। এতগুলি কাকাল ধনী হইয়া গেল, তথাপি ধন ফুরাইল না, এ কি সামান্য রহস্তের কথা! এখন ক্রমে আমাদের স্থায় কত চোর, লম্পট, মাতাল, অনাচারী, বিশ্বাসঘাতক, দলে দলে আসিয়া আশ্রয় লইতে লাগিল। অব্যবহৃত দ্বার; কাহাকেও বিমুখ করিলেন না! দয়ার অবতার না বলিয়া আর-কি

অলিঙ্গ ? বাহারা লোকাগয়ে স্থান পাইত না, বাহাদের ধর্ম ধর্মজগতে ছিল না, বাহাদের গুরু গুরুশ্রেণীরা হন নাই, বাহা প্রসারণ করিয়া পরমহংসদেব তাহাদের ক্রোড়ে লইলেন ।

এই ভক্তদিগের মধ্যে প্রত্যেকের ভাব স্বতন্ত্র প্রকার । কাহাকে কালী, কৃষ্ণ, গৌরান্ধ, প্রভৃতি সাকার উপাসক ও কাহাকে শব্দর প্রভৃতি জ্ঞানপথাবলম্বী সাধকদিগের পদচিহ্নানুক্রমে গমন করিতে দেখা যাইতেছে এবং কাহাকেও বা পরমহংসদেবকে জীবন মরণের একমাত্র অবলম্বন, সহায়, সম্পত্তি, গুরু, ঈশ্বর ও পরিত্রাতা বলিয়া নিশ্চিন্তে, নিরুপদ্রবে, নির্বিশেষে, নিরানন্দবিহনে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে দেখা যাইতেছে ।

এই ভক্তগণ ব্যতীত তাঁহার আরও ভিন্ন ভিন্ন ভাবের অসংখ্য ভক্ত আছেন । কতকগুলি মুসলমান, (এক জনকে আমরা জানি, তিনি ডাক্তার,) খৃষ্টান, (দুই জনের সহিত আমাদের পরিচয় আছে, একজনের নাম পি. ডি. মিসির, ইনি সম্যাসী বিশেষ, মন্ত্র মাংসভ্যাগী, ইহার যোগাদি অভ্যাস আছে, নামেও ভাব হয় ; অপর ব্যক্তির নাম উইলিয়াম, ইনি ভক্তিপ্রধান প্রকৃতির লোক, পরমহংসদেবের নিকটে অভিপ্রেত আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া এক্ষণে পার্শ্বত্যাগেদশে যোগাভ্যাস করিতেছেন ;) এবং বাউল, কণ্ঠভজা, নবরসিক প্রভৃতি অনেক ভক্তই আছেন । তাঁহারা আপন আপন ভাবেই গুপ্ত সাধন করেন ।

পরমহংসদেব এইরূপে অমুমান শতাধিক ভক্ত লইয়া কিছুদিন আনন্দের তরঙ্গ ছুটাইয়াছিলেন । কোন দিন বাদ নাই, কোন রাত্রে বাদ নাই, ভক্তসঙ্গে সদাই আনন্দিত থাকিতেন । প্রতি সপ্তাহের শনিবারে কোন একজন ভক্তের বাটীতে আসিতেন । তথায় কীৰ্ত্তন, নৃত্য ও উচ্চ হরিশ্রবণিতে সে বাটা ও পল্লী পুলকার্ণবে ভাসাইয়া যাইতেন । তাঁহার হরিনামসঙ্কীৰ্ত্তনে যে কত পাণ্ডা দলিত হইয়াছে, তাহার সীমা নাই ।

পরমহংসদেবের অতিশয় অনুরূপি ছিল । বাহার বাহা মনে হইত, যে বাহা মনে প্রার্থনা করিত, তিনি তখনই তাহা সম্পূর্ণ করিয়া দিতেন, প্রত্যেক ভক্ত এই বিষয়ে বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন । তাঁহার এই শক্তি পরীক্ষা করিবার জন্ত জটনক বীরাচারী ভক্ত নিজ বাটীতে বসিয়া তাঁহাকে মনে মনে আহ্বান করিবারাত্র, পরমহংসদেব তৎক্ষণাৎ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন । সুরেশ বাবু তিন দিন পরীক্ষা করেন । একদিন তাঁহাকে দেখিবার জন্ত সুরেশ বাবুর মন বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠে । তিনি আফিসে যাইয়া কর্ত্ত

কাজ করিতে পারিলেন না। সূতরাং তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে বাইতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, পরমহংসদেব একখানি গাড়ী আনাইয়া সুরেশ বাবুর বাটীতে আসিবার উদ্ভোগ করিতেছিলেন। সুরেশকে দেখিয়া বলিলেন, ভূমি যদি আসিয়াছ, তবে আর কেন যাইব। তোমায় দেখিবার নিমিত্ত বড়ই উতলা হইয়াছিলাম। সুরেশ বাবু তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া নিজ বাটীতে আসিয়াছিলেন। আরও দুই দিন তিনি পরমহংসদেবের সাক্ষাৎকার প্রয়োজন বিবেচনায় কাঁদিয়াছিলেন; তিনি দুই দিবসই আসিয়া প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়াছিলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

পরমহংসদেব এইরূপে শিষ্টের পালন এবং পাষণ্ড দলন করিয়া ভগবৎ গুণানুকীৰ্ত্তন পূৰ্ব্বক দিনাতিবাহিত করিতেছিলেন। ঠাকুরবাড়ীর সকল কর্মচারীরাই পরমহংসদেবকে পূৰ্বেকৃত্যায় শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। মথুর বাবুর পুত্র ত্রৈলোক্য বাবুও ভক্তির ক্রটি করিতেন না; কিন্তু তাঁহার পিতার যে প্রকার ভক্তি ছিল, তাহার শতাংশের একাংশও দেখাইতে পারেন নাই। বিষয়ী লোকেরা যেমন সচরাচর হইয়া থাকে, ইনি সেই প্রকার ছিলেন। ঠাকুরবাড়ীর উদ্যানটী তিনি দুইভাবে ব্যবহার করিতেন। তাঁহার সহিত কলিকাতার অনেক রকমের লোকই যাইতেন। তাঁহারা বাগানের আমোদ আফ্লাদেই দিন কাটাইতেন এবং মধ্যে মধ্যে পরমহংসদেবকেও তথায় ডাকাইয়া পাঠাইতেন। উদারচেতা পরমহংসদেব তাহাতে কখন অভিমান প্রকাশ করেন নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন, যাহারা বৈঠকখানায় বসিয়া সাধুকে ডাকিয়া পাঠান, তাঁহাদের উপর কি মান অভিমান সাজে? ডাকিবামাত্র তিনি তথায় চলিয়া যাইতেন, কিন্তু দীর্ঘকাল থাকিতে পারিতেন না।

পূর্বে যে হৃদয়ের কথা উল্লিখিত হইয়াছিল, তিনি এ পর্য্যন্ত ঠাকুরবাড়ীতে সেবাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। হৃদয় পরমহংসদেবের অনেক সেবা করিয়াছিলেন। সেই সেবার ফলে তিনি মধ্যে পরমহংসদেবের অনুগ্রহও লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু অনুগ্রহ হইলে কি হইবে? তাঁহার হিঙ্গু কুস্ত, সমুদায়

রূপা-বারি বাহির হইয়া গিয়াছিল। পরমহংসদেব হৃদয়কে প্রাণাধিক ভাল-বসিতেন। হৃদয় কামিনীকাঞ্চনত্যাগী মহাপুরুষের নিকটে থাকিলেও তাঁহার সেই কামিনীকাঞ্চন-ভাব অতি প্রবলরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সাধারণ লোকেরাই তাঁহার মাথা ধাইয়াছিল, তাহার সংশয় নাই। হৃদয়কে সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে, কেহ ইচ্ছাক্রমে কিম্বা প্রাণ ভরিয়া পরমহংসদেবের নিকটে বসিতে অথবা তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতে পারিত না। স্মৃতরাং যাহার যেমন সঙ্গতি, তিনি সেই প্রকারে হৃদয়ের পূজা করিতে বাধ্য হইতেন। ক্রমে তাঁহার লোভ বাড়িয়া গেল। পরমহংসদেব তাহা জানিতে পারিয়া হৃদয়কে নানাপ্রকার উপদেশ দিতেন এবং কেহ কিছু দিতে চাহিলে, তিনি নিষেধ করিতেন। হৃদয় তাহাতে বিরক্ত হইতে লাগিলেন এবং সময়ে সময়ে পরমহংসদেবকে কটু-কাটব্যও বলিতে আরম্ভ করিলেন। মরি! মরি! বিষয়ের কি মহিমা! যে ব্যক্তি এক সময়ে অর্থকে গ্রাহ্য করিতেন না, তাঁহার পরিণাম দেখিলে আতঙ্কে সর্বশরীর শিহরিয়া উঠে! হৃদয়ের বিশেষ কষ্ট এবং পরমহংসদেবের প্রতি বিরক্তির কারণ, সেই লক্ষ্মীনারায়ণের দশ হাজার টাকা। বাস্তবিক, হৃদয়ের কেন, অনেকের পক্ষে তাহা সামান্য প্রলোভন নহে। ফলে, হৃদয়ের হৃদয় ক্রমে পরমহংসদেবের প্রতি বীতরাগ হইয়া উঠিল। তিনি সময়ে সময়ে এমন মর্থাভেদী কথা বলিয়া পরমহংসদেবকে বিরক্ত করিতেন যে, সে কথা শুনিলে আপাদমস্তক ক্রোধে পরিপূর্ণ হইত এবং তাহার সমুচিত দণ্ড হওয়া বিধেয় বলিয়া আপনি মনে মনে ঈশ্বরের কাছে কামনা হইয়া যাইত। এক একদিন পরমহংসদেব বালকের ছায়া কত কাঁদিতেন, ক্লতাঞ্জলি হইয়া হৃদয়কে কত অশ্রু নয় করিতেন, কিন্তু তিনি সে কথায় আরও প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিতেন।

সাধন অপেক্ষা অশুকরণ করা সহজ। হৃদয় মহাপুরুষের সেবক হইয়া, তাঁহার সদগুণ লাভ করিবার প্রয়াস না পাইয়া, হাব ভাব অশুকরণ করিতে লাগিলেন এবং সেই প্রকারে লোকের নিকটে নৃত্য গীত করিয়া আপনাকে দ্বিতীয় পরমহংস করিয়া তুলিলেন। হৃদয়ের এতদূর সম্পর্ক ও অবনতি হইয়াছিল যে, সময়ে সময়ে তাঁহার ভক্তদিগের সমক্ষে পরমহংসদেবকে ভ্রুকুটি করিয়া কথা কহিতেন। এক দিন পরমহংসদেব রামপ্রসাদের একটা গান গাহিতেছিলেন। তিনি যেমন এই কয়েকটা চরণ গাহিয়াছেন—“ওমা কাঁদছে কে তোর ধন বিহনে, রত্ন আদি ধন দিবি মা, প’ড়ে রবে ঘরের কোণে”—

অমনি হৃদয় ঠাকুর রোষাবেশে, বিক্রপচ্ছলে এবং বিকৃত স্বরে বলিলেন, “ও কৃষ্ণ কীদৃশে তোমার ধন বিহনে—যদি কাদিতেছ না, তবে রাসমণির দেবালয়ে কেন?” এসকল কথা পাঠ করিয়া পাঠকপাঠিকার বিরক্তি বোধ হইবে, তাঁহাদের প্রাণে নিদারুণ আঘাত লাগিবে এবং আমাদের এই কথাগুলি লিখিতে যে কি ক্লেশ হইতেছে, তাহা আর কি বলিব! মধ্যে মধ্যে আমাদেরও ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়া যাইতেছে, কিন্তু কি করিব, উপায়ান্তর নাই। পরমহংসদেব কি বলিবেন, কিঞ্চিৎ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; আর কিছুই বলিলেন না। হৃদয় ঠাকুর এইরূপে সর্বপ্রকারে বিত্বকারী হইয়া দাঁড়াইলেন। হৃদয় ঠাকুর যেমন বলিবেন, তাঁহার যে প্রকার অভিপ্রায় হইবে, পরমহংসদেবকে সেই প্রকারে পরিচালিত হইতে হইবে। কথা রক্ষা না হইলেই ব্রাহ্মণের আর জোখের সীমা থাকিত না।

একদা পরমহংসদেব অরগ্রস্ত হইয়া শয়ন করিয়া আছেন, কোন ভক্ত একটা ফুলকপি লইয়া তাঁহার সম্মুখে সংস্থাপন করিয়া দিল। পরমহংসদেব আশ্চর্য্যে উঠিয়া বসিলেন এবং কপিলীর কতই প্রশংসা করিলেন। অবশেষে বলিলেন যে, “দেখ, তোমরা ঐ স্বরের মধ্যে ইহা লুকাইয়া রাখিয়া আইস। হৃদয়কে বলো না যে, আমি ইহা দেখিয়াছি, তাহা হইলে আমার বড় গালাগালি দিবে।” আজ্ঞামাত্র কপিষ্ঠী স্থানান্তরিত করা হইল। পরমহংসদেব কহিতে লাগিলেন, “দেখ, হৃদে আমার যে সেবা করিয়াছে, তাহা আমি কখনই ভুলিব না। হয় ত মা কালীর ইচ্ছায় সে না থাকিলে আমার দেহ এতদিন থাকিত না। আমি যখন পঞ্চবটীতে ধ্যান করিতাম, হৃদে আমার পশ্চাৎ যাইয়া ভয় দেখাইবার জন্ত ইট মারিত। কিয়ৎকাল পরে আপনি চলিয়া আসিত। একদিন সে সাহসে ভর করিয়া পঞ্চবটীর মধ্যে প্রবেশ করে। সিদ্ধভূমি পঞ্চবটী, তথায় যাইবামাত্র আমি বলিলাম, কেও হৃদে? হৃদে বলিল, ‘মামা! তুমি একলা বসিয়া কি করিতেছ?’ আমি তাহাকে তথায় বসিয়া ধ্যান করিতে বলিলাম, হৃদে উপবেশন করিবামাত্র ‘মামা গো! আমার পিটে কে আগুন চালিয়া দিল’ বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। আমি তাহার পৃষ্ঠে হস্তার্পণ করিয়া ভয় নাই বলায়, সে চুপ করিল। সেই মুহূর্ত্ত হইতে কেমন মা কালীর ইচ্ছা, হৃদয়ের ভাবান্তর হইয়া গেল। যেন পাঁচ বোতল মদের নেশা আসিয়া উপস্থিত হইল আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িল। পরদিন রাত্রে আমি বহির্দেশে গিয়াছি, হৃদে আমার পশ্চাৎ চলিয়া আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে

চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, ‘ওরে রামকৃষ্ণ! তুইও যে, আমিও সে, তৌতে আগাতে প্রভেদ কি? চল, আমরা আর এখানে থাকিব না?’ আমি তাড়াতাড়ি উহার নিকটে আসিয়া বলিলাম, ‘চূপ্! চূপ্! এখনই সকলে জানিতে পারিবে। আমাদের এখানে থাকা ভার হইবে। ওরে, আমরা কি হইয়াছি? চূপ্ কর।’ হৃদে কিছুতেই শুনিল না। উত্তরোত্তর চীৎকার বাড়াইল। আমি তখন উপায় না দেখিয়া তাহাকে বলিলাম, ‘এককণা শক্তি ধারণা করিতে পারিলি না, তবে আর কি হইবে, জড়বৎ হইয়া যা।’ অমনি হৃদে ভূমিতে পতিত হইয়া বলিল, ‘মামা কি সর্বনাশ করিলে, আমি আর অমন করিব না।’ সেই পর্যায়ে হৃদয় ঠাকুর বাস্তবিকই জড়বৎ রহিয়াছেন। তিনি কহিতে লাগিলেন, “হৃদে যেমন আমার সেবা করিয়াছে, মা কালী উহার আশাতীত ফলও দিয়াছেন। দেশে বিলক্ষণ জমি-জমা করিয়াছে, লোককে টাকা ধার দেয়, এই মন্দিরে কর্তার গুণ হইয়া রহিয়াছে এবং এত লোক উহাকে সম্মান করিয়া থাকে।” এই কথা বলিতে বলিতে হৃদয় ঠাকুর তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হৃদয় ঠাকুর অসিলামাত্র পরমহংসদেব তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “দেখ্, আমি এদের কপি আনিতে বলি নাই, ওরা আপনারা আনিয়াছে, মাইরি বলচি, আমি ওদের কিছুই বলি নাই।” হৃদয় ঠাকুর এই কথা শুনিয়া তিরস্কারের অবধি রাখিলেন না। তাহার সেই মূর্তি মনে হইলে এখনও আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়! পরমহংসদেব সরোদনে মা কালীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, “মা! তুই আমার সংসার বন্ধন কাটিয়া দিলি, পিতা গেল, মাতা গেল, ভাই গেল, স্ত্রী গেল, জাতি গেল—শেষে কি না হৃদের হাতে আমার এই দুর্গতি হইতে লাগিল?” এই কথা বলিয়া তিনি পুনরায় হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন, “ও আমায় বড় ভালবাসে, ভালবাসে বলিয়াই বকে, ছেলে মানুষ, ওর বোধ হয় নাই। ওর কথায় কি রাগ কর্তে হয়, মা?” এইরূপ বলিতে বলিতে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু হৃদয় ঠাকুরের ক্রোধ শাস্ত হইল না।

পরমহংসদেব ক্রমেই হৃদয়ের অভ্যাচারে নিতান্তই কাতর হইয়া উঠিলেন। হৃদয় ঠাকুর তখন সকলেরই মর্যাদা হানি করিতে আরম্ভ করিলেন। ঠাকুর-বাটীর প্রত্যেক কর্ণচরী তাহার দ্বারা উৎপীড়িত ও মর্যাহত হইয়া পড়িল। পরমহংসদেব বার বার নিষেধ করিলেন। তিনি নিষেধ বাক্য না শুনিয়া গর্ষিতভাবে বলিলেন, “রাসমণির অন্ন ব্যতীত তোমার গতি নাই। তুমি

সকলকে ভয় করিবে, আমি কাহাকে গ্রাহ্য করি? না হয় চলিয়া যাইব।” গরিব ব্রাহ্মণ, সাধুর রূপায় পাঁচ জনের পূজনীয় হইয়া সম্মানের সহিত ছিলেন, তাহা অদৃষ্টবশতঃ জ্ঞান হইল না, তাঁহার আসন্নকাল সন্নিহিত হইয়া আসিল।

কালীমন্দির প্রতিষ্ঠার বাৎসরিক উৎসবের দিন সমাগত হইল। সেই দিনে তথায় অপেক্ষাকৃত কিছু ধুমধাম হইয়া থাকে। তন্নিমিত্ত ত্রৈলোক্য বাবু সপরিবারে তথায় আগমন করিয়াছিলেন। উৎসবের দিন প্রাতঃকালে হৃদয় ঠাকুর পূজা করিতে যাইলেন এবং তথায় ত্রৈলোক্য বাবুর একটা দশমবর্ষীয়া বিবাহিতা কন্যা পটুবস্ত্রাদি পরিধান করিয়া দণ্ডায়মান ছিল। হৃদয় সেই বালিকাটির চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেন। ইতিপূর্বে পরমহংসদেব ঐ প্রকার পূজাদি করিতেন। হৃদয় তাহা অমুকরণ করিতে যাইয়া নিজ কাল আশ্রয় করিয়া আনিলেন। কন্যার পায়ে চন্দনেকুচিহ্ন দেখিয়া তাহার মাতা জিজ্ঞাসা করায় হৃদয় ঠাকুরের কাণ্ডকারখানা প্রকাশ হইয়া পড়িল। ত্রৈলোক্য বাবুর স্ত্রী, কন্যার অকল্যাণ হইবে ভাবিয়া কঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার রোদনে ত্রৈলোক্য বাবু মাতিয়া উঠিলেন এবং মত্ত মাতঙ্গের দ্বারা আক্ষাণন পূর্বক দ্বারবান দ্বারা হৃদয়কে উদ্ভাণ হইতে এক বস্ত্রে বন্ধিত করিয়া দিলেন এবং সেই ক্রোধে পরমহংসদেবকেও নাকি চলিয়া যাইবার নিমিত্ত আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। দ্বারবান এ সংবাদ আনিয়া পরমহংসদেবের সমীপে উপস্থিত হইল। পরমহংসদেব হাসিয়া বলিলেন, “তোমার বাবুর আমি কি করিলাম?” এই বলিয়া তিনি তদবস্থায় গৃহ হইতে বাহির হইয়া এক মনে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। পরমহংসদেব যখন বাবুদিগের বৈঠকধানার সম্মুখ দিয়া যাইতেছিলেন, তখন কে জানে, কি নিমিত্ত ত্রৈলোক্য বাবু, “আপনি কোথায় যাইতেছেন” বলায়, পরমহংসদেব অমনি ফিরিলেন এবং তাঁহাদের নিকটে যাইয়া বসিলেন। ত্রৈলোক্য বাবু হৃদয়ের সম্বন্ধে নানা কথা কহিলেন এবং কন্যাটির অকল্যাণের অশঙ্কায় ভীত হইলেন। পরমহংসদেব অভয় দিয়া পুনরায় নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

হৃদয় ঠাকুর বহু মন্দিরের উদ্ভাণে বাস করিতে লাগিলেন। পরমহংসদেব দুই বেলা তাঁহার নিজ অংশ হইতে অন্নব্যাঞ্জন ও মিষ্টান্নাদি পাঠাইয়া দিতেন এবং তিনি নিজের তাঁহাকে দেখিয়া আসিতেন। হৃদয় ঠাকুর এই সময়ে পরমহংসদেবকে মন্দির হইতে চলিয়া আসিবার নিমিত্ত অমুরোধ করেন ও নানাবিধ যুক্তি দিয়া বলিয়াছিলেন যে, কোন স্থানে যাইয়া একটা কালী

মুষ্টি স্থাপন পূর্বক উভয়ে স্মৃতি বাস করিবেন। পরমহংসদেব এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন, “তুই কি আমায় লইয়া ঘারে ঘারে গিরি করিয়া বেড়াইবি?”

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ ।

পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, পরমহংসদেব কখন কাহার কর্ণে মন্ত্র দিয়া গুরুগিরি করিতেন না ; উপদেশ দিতেন, ঈশ্বর লাভের সুলভ পথ নির্দেশ করিয়া দিতেন, কিন্তু কাহারও গুরু হইতেন না। এমন কি গুরু শব্দটা তাঁহার সম্মুখে কেহ বলিতে সাহস করিত না। গুরু বলিলে তিনি বলিতেন, “কে কা’র গুরু, এক ঈশ্বরই সকলের গুরু। চাঁদা মামা আমারও মামা, তোমারও মামা।” এই নিমিত্ত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গুরু শিষ্য সম্বন্ধ কাহারও সহিত তাঁহার ছিল না। তাঁহাকে গুরু বলা নিজ নিজ ইচ্ছার কথা। ইহার দ্বারা এই প্রকাশ পাইতেছে, জোর করিয়া কিম্বা বুজ্জ্বলী দেখাইয়া দলবদ্ধ করিবার তাঁহার চেষ্টা ছিল না। যাহারা আপন মনের টানে তাঁহার প্রতি পারলৌকিক শুভাশুভ নির্ভর করিত, তাহাদের জন্য তিনি বড়ই ব্যাকুলিত থাকিতেন। বস্তুতঃ গুরুকরণ যাহাকে বলে, তাহাই হইত। একরূপ গুরুকরণে শিষ্যেরই উপকার, গুরুর কিছুই লভ্য নাই। যে ব্যক্তি মন্ত্র দিবার জন্য তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করিত, তিনি তাহাদের কুলগুরুর নিকট সে কার্য সাধন করিয়া লইতে বলিতেন। অনেকে গুরুর চরিত্রদোষ ও ধর্মশাস্ত্রে অজ্ঞতা দেখাইয়া, তাহা নিজের রুচিবিরুদ্ধ বলিয়া আপত্তি করিত, কিন্তু তিনি তাহা শুনিতেন না। তিনি বলিতেন—

“যতপি আমার গুরু শু’ড়ী বাড়ী যায়,

ততপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।”

গুরু যেমনই হউন না কেন, তাহাতে আমাদের ক্ষতি বৃদ্ধি কি? যে স্থানেই কাঞ্চন পতিত থাকুক না কেন, তাহার ধর্মের কোন প্রকার পরিবর্তন হয় না। গুরু যে ধন দিয়া থাকেন, তাহা তাঁহার নহে। কিন্তু সেইধন লইয়া

শিষ্যের কার্য, স্থানস্থান বিচারের প্রয়োজন কিছুই নাই। যেমন কাহার মাজা বেগাই হউক, কিম্বা সতী হউক, সম্ভান কি তাহাকে মাতা বলিবে না? পরমহংসদেব এইরূপ উপদেশ দিয়া যাহার মন পরিবর্তন করিতে পারিতেন, সে চলিয়া যাইত। কিন্তু যে তাহা গুণিত না, যে মনে মনে তাহাকে গুরুর স্থানে বসাইয়া লইত; তাহার সহিত অধিক বাকাব্যয় করিতেন না, ‘কালীর ইচ্ছা যাহা, তাহাই হইবে’, বলিয়া নিরন্তর হইতেন। যাহারা জপ তপ কিম্বা সাধন ভজন করিতে আপনাদিগকে অসমর্থ জ্ঞানে তাহার চরণ প্রাপ্তে পড়িয়া থাকিত, তাহাদের জন্য তিনি নিজে দায়ী হইতেন। তিনি সেই সকল ব্যক্তিকে আশ্রমোক্তারনামা বা বকলুমা দিতে কহিতেন। এই শ্রেণীর মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায় পরমহংসদেব কর্তৃক মন্ত্র পাইয়াছে। কোন কোন ব্যক্তিকে, ‘তোমায় পরিভ্রাণ করিলাম,’ বলিয়া অভয় দিয়াছেন। মোটা কথা, যে যাহা চাহিয়াছে, তাহাকে তাহাই দিয়াছেন। এই নিমিত্ত পরমহংসদেবের ভাব সহজে কেহ অনুভব করিতে সক্ষম নহে। তিনি একজনকে চির-সন্ন্যাসী করিয়াছেন, আর এক জনকে আর্দ্রক-সন্ন্যাসী এবং অপরকে গৃহস্থ-সন্ন্যাসী করিয়া রাখিয়াছেন। ইহার মর্ম্ম কাহার মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হইবে এবং কেমন করিয়া তাহা মীমাংসা করা যাইকে?

পরমহংসদেবকে এক স্থানে আমরা পতিতপাবন দয়াময় বলিয়া ফেলিয়াছি। কথাটি নিতান্ত উপেক্ষণ বিষয় নহে। আমরা যে অন্ধ হইয়া সে কথা উল্লেখ করিয়াছি, অথবা তাহার মর্যাদা রুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে অসঙ্গত ও অকর্তব্যকে কর্তব্য জ্ঞান করিয়াছি, তাহা নহে। অলৌকিক কার্য দেখিয়া আমরা তাহাকে পতিতপাবন বলিতে বাধ্য হইয়াছি। আমরা যখন পরমহংসদেবের নিকট গমন করি, তখন আমাদের মনোভাব বাস্তবিক স্বতন্ত্র প্রকার ছিল। সে সময়ে আমরা সংসারের বিভীষিকায় নিতান্ত অন্ধুলিত হইয়া, কোথায় তত্ত্বজ্ঞান পাইব, কে তত্ত্বকথা শ্রবণ করাইবে এবং কেমন করিয়া শাস্তি লাভ করিব, এইরূপ চিন্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। ধার্মিক কিম্বা সাধু হইব, তাহা একেবারেই উদ্বেগ ছিল না। পূর্বে বলিয়াছি যে, আমরা নিতান্ত নিরীশ্বরবাদী ছিলাম। কামিনীকাকনের দাসাহুদাস তন্তু দাস ছিলাম বলিলেও আমাদের প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করা হয় না। কামিনীর দাসত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া কর্তব্য। কামিনীতে এ প্রকার আকৃষ্ট হইয়াছিলাম যে, উহার ভাব উপলব্ধি করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইত না।

চক্ষু এবং কণ্ঠ উভয়ে সর্বদা প্রস্তুত ও সচকিত থাকিত । পথে ভ্রমণকালেই হউক, শকটারোহণে গমনসময়েই হউক, গঙ্গানানকালেই হউক, কোন তীর্থাদি দর্শন করিতে যাইয়াই হউক, কিম্বা কার্যোপলক্ষে পাঁচ বাড়ীর অন্তঃপুর-মহিলাদিগের আপন বাটীতে আনয়ন করিয়াই হউক, কামিনীর রূপ দর্শন এবং মনন না করিয়া যে আমরা ক্ষান্ত হইতাম, তাহা নহে । সর্বদা সকল বিষয়ের সুবিধা হয় না এবং হইবার নহে ; সুতরাং মনোভাব কার্যে পরিণত করিতে কৃতকার্য হওয়া যায় নাই । সেইজন্য লোকের নিকট বাহ্যিক নির্দোষী বলিয়া পরিচিত হইলেও, আমরা তাহা ছিলাম না । বাস্তবিক শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, আমরা নর-পিশাচ শ্রেণীর সভ্য ছিলাম, তাহার সন্দেহ নাই । দয়ার অবতার পরমহংসদেব, আমাদের অবস্থা দেখিয়া ক্রোড়ে করিয়া লইলেন । আমরা জানিতাম যে, আমরা পরীক্ষা দিতে আসি নাই, সে শক্তি আমাদের নাই । আমাদের মনের কথা ও কার্যকলাপ প্রকাশ করিতে বলিলে আমরা তাহা পারিব না—সে শক্তি নাই, সেরূপ মানসিক বলও নাই । মনে মনে প্রার্থনা ছিল যে, ঠাকুর আপনি অন্তর্ধ্যায়ী, মনের সকল কথাই জানিতে পারেন, তবে কেন আর লোকের নিকটে আমাদের অপদস্থ করিবেন । আপনাকে ভয় নাই, লজ্জা নাই, কিন্তু লোককে ভয় ও লজ্জা করি । তিনি দয়াপরবশে সে প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন । কিন্তু তথাপি মনের আসক্তি একেবারে দূর হইল না । চিরকাল যাহাকে আদর করিয়া যত্পূর্বক আশ্রয় দিয়াছি, সে কেমন করিয়া এক কথায় বিদায় হইবে, যাই-য়াও যাইতে চাহে না । যদিও যে কামিনীদিগকে স্ত্রীর স্থানে বসাইতে লালা-য়িত হইতাম, তাহাদের এক্ষণে প্রভুর প্রসাদে অকপটে মাতৃস্থানে সংস্থাপন পূর্বক মাতৃ সঙ্কোচন করিতে সমর্থ লাভ করিলাম, কিন্তু তথাপি পাজী মন এখনও সুবিধা পাইলে পলাইতে চেষ্টা করিত । এক দিন কোন স্ত্রীলোককে দেখিয়া, মন পূর্ব পণ্ডভাবে ছুটিল, কিন্তু সকল বন্ধন ছিঁড়িতে পারিল না ; সুতরাং কিয়দূর যাইয়া পুনরায় প্রত্যাগমন করিল । সেই দিনের ঘটনায় আমরা যারপরনাই দুঃখিত হইয়া পরমহংসদেবের নিকট যাইয়া আত্মদোষলা প্রকাশ করিলাম । অভয়দাতা পরমহংসদেব, দ্বিগুণ হাসিয়া কহিলেন, “সে লজ্জা চিন্তা নাই । যে বিষয়ে মনের দৃঢ় সংস্কার হয়, তাহা প্রায় যায় না । একদা আমি বর্দ্ধমানের পথে গো-যানে গমনকালীন পশ্চিমধ্যে একটা সরাইএতে বিশ্রাম করিতেছিলাম । একটা বলদের উপর আর একটিকে উঠিতে দেখিয়া

আমি আশ্চর্য্য হইলাম এবং ভাবিতে লাগিলাম, ইহারা দাম্ভা, তথাপি এ প্রকার ভাব কেন? পরে বুঝিলাম যে, সহবাস রসাস্বাদন হইবার পর উহাদের 'বোধ' হইয়াছিল। সেইজন্য পূর্বসংস্কার অদ্যাপি বিস্মৃত হয় নাই। তোমাদের সম্বন্ধেও তজ্জপ।" এখনও যে আমরা সাধু হইয়াছি, তাহা নহে। তবে প্রভুর শক্তিতে হস্ত পদ আবদ্ধ আছে। কিছু করিয়া উঠিতে পারি নাই। পাখী উড়িতে না পারিলে পোষ মানে। কাকনের দাস হইয়া আমরা যে ভাবে দিন যাপন করিতেছিলাম, তাহারও কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। অর্ধেক পৃথিবীর সারাংশের পদার্থ বলিয়া আমাদের ধারণা ছিল। অদ্যাপি কি সে সংস্কার গিয়াছে? তাহা কে বলিতে পারে? ধনোপার্জনের জন্য স্বাভাবিক পন্থা ব্যতীত যে কোন রূপে, অর্থাৎ বলে, কলে, কৌশলে, ছুইটা পয়সা গৃহে আনিতে পারা যায়, এই আমাদের একমাত্র জ্ঞান ছিল। মিথ্যাকথা, জুয়াচুরা, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি যে কোন ভাবে অর্থোপার্জনপক্ষে সহায়তা হয়, তাহার অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা করিয়া দেখিবার কোন কারণ ছিল না। ফলে, যে সকল প্রক্রিয়াকে ভদ্রলোকেরা ঘৃণা করেন, বাস্তবিক সে সকল কার্য্যকে আমরা মন্দ বলিয়া একদিনও মনে করিতাম না। তবে উল্লিখিত কামিনীভাবেব জায়, রাজদণ্ডের ভয়েই হউক, কিম্বা স্ত্রীবিধা করিতে পারি নাই বলিয়াই হউক, মনের সাধ পূরিয়া কার্য্য করিতে পারি নাই। স্বার্থপরতা সম্বন্ধীয় একটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ না করিয়া নিরস্ত হইতে পারিতেছি না। পরমহংসদেবকে নানাস্থানে গমন করিতে দেখিয়া মনে হইত যে, কবে দয়া করিয়া আমাদের বাটীতে চরণধূলি দিয়া পবিত্র করিবেন। কালক্রমে একদিন মনোভাব প্রকাশ করিয়া ফেলিলাম। তিনি অস্বীকার করিলেন। মনে তখন ভক্ত বলিয়া বিলম্ব অভিমান হইয়াছে, আপনার অবস্থা তখন ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছি, পরমহংসদেবের চেলা বলিয়া পরিচয় দিতে শিখিয়াছি, আর পায় কে? পরমহংসদেবের কথায় মনে বড়ই ব্যথা পাইলাম। কি বলিব কোন উপায় ছিল না। একদিন সহসা তিনি আমাদের বলিলেন, কবে তোমাদের বাটীতে যাইব? আমরা আকাশ থেকে পড়িলাম। কি বলিব, ভাবিয়া বলিলাম, যে দিন আপনার ইচ্ছা। তিনি দিন স্থির করিয়া দিলেন। পরমহংসদেব যদিও আমাদের বাটীতে আসিবেন বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, আমরা মৌখিক আনন্দের ভাব দেখাইয়া অন্তরে অন্তরে যারপরনাই বিরক্ত হইতে

থাকিলাম। এ প্রকার বিরক্তির কারণ অর্থব্যয়। কেবল এলে গেলে কাহারও কৃতি হয় না। তিনি যথায় যাইতেন, তথায় প্রায় দেড়শত বা দুইশত তক্ত একত্রিত হইতেন। তাঁহাদের সকলকে পরিতৃপ্ত করিয়া ভোজন করাইতে হইলে দশ টাকা ব্যয় হইবার সম্ভাবনা। আমরা বিষয়ী, আমাদের এপ্রকার ব্যয় করিতে সত্য কথা বলিতে কি, ক্লেশকর বোধ হইল। একদিন যাহার চরণধূলি বাটীতে পড়িল না বলিয়া লোকের নিকট কত আড়ম্বরই করিয়া ছিলাম, সে দিন গুরুভক্তির পরাকর্ষ্য দেখাইয়াছিলাম, কিন্তু অল্প সেই ব্যক্তির কতদূর নীচ প্রকৃতি, তাহা সকলে দেখুন! এইরূপ ভক্তিতে আমরা ঈশ্বর লাভ করিব! এইরূপ সন্দেহ লইয়া আমরা কোন্ সাহসে যে ভগবানের নিকট অগ্রসর হই, তাহা সময়ে সময়ে মনে হইলে, আপনার গালে আপনি করাদাত করিলেও যথেষ্ট শাস্তি হয় না বলিয়া মনে হয়।

তাই বলি, আমাদের গুণে পরমহংসদেবকে পাই' নাই, সে গুণ তাঁহারই। আমরা যাহা মনে করি, তাহা কি ঠাকুর কখন করিতে দেন? আমরা ইচ্ছা করিয়া প্রতিযুক্তে বিষ পান করিতে চাই, তিনি যে তাহা কাড়িয়া লইয়া অমৃত প্রদান করিয়া থাকেন। আমরা কি অমৃত চাই? কখন নহে। তাঁহাকে আমাদের বাটীতে কদাচ আনা হইবে না বলিয়া স্থির নিশ্চয় হইল; কিন্তু তিনি তাহা গুনিলেন না। জোর করিয়া আমাদের নিতান্ত আন্তরিক অনিচ্ছাসত্ত্বেও (মুখে অবশ্যই স্বীকার করিয়াছিলাম) তিনি সেই দিবসে সমুদয় তক্ত লইয়া আসিলেন এবং আনন্দ করিয়া যাইলেন। আমরা কিন্তু খুসি হইয়াও নিজের অর্থব্যয়জনিত অঙ্কের গায় প্রাণটা ভরিয়া আনন্দ করিয়া লইতে পারিলাম না। চিকিৎসকেরা যেমন অপরের হাত পা কাটিয়া আনন্দ সম্ভোগ করেন, সেইরূপ অপরের ব্যয়ে উদর পুরিয়া প্রসাদ পাইয়া সংকীর্ণন করিলে যে পরিমাণে লাভ হইল বলিয়া আনন্দ হয়, সে প্রকার কি নিজ ব্যয়ে হইবার সম্ভাবনা? এক ব্যক্তি বেচার জল ফুলের মালা ক্রয় করিয়া গুইয়া যাইতেছিল। তাহার অমনোযোগিতাবশতঃ একহুড়া মালা পথে পড়িয়া কাদা লাগিয়া গেল। সে মনে করিল, কাদা লাগা ফুল সে লইবে না। তবে কি করে? ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে মনে স্থির করিল যে, ঈশ্বর ত সর্বব্যাপী, তিনি এখানেও আছেন, এ মালা তাঁহার গাত্রেই দেওয়া হইয়াছে। আমরা অবশেষে মনে মনে ঐ প্রকার মীমাংসা করিয়া অর্থব্যয়ের কষ্ট নিবারণ করিয়া লইলাম।"

কিন্তু দয়াময় ঈশ্বরের কি মহিমা! কাহাকে তিনি কোন্ পথে কিভাবে কেমন করিয়া কৃতার্থ করেন, তাহা জীব বুদ্ধি কেমন করিয়া বুঝিবে অথবা ধারণা করিতে সমর্থ হইবে? আমরা যেভাবে পরমহংসদেবের পূজা করিলাম, তাহা সকলে অবগত হইয়াছেন, ইহার ফল কি হইতে পারে? কপটের পুরস্কার কি হয়? স্বার্থপরের পরিণাম কি হইয়া থাকে? যাহা হইল, তাহা বেদ-বিধি ছাড়া কেহ কোথাও খুঁজিয়া পাইবেন না, অথবা কেহ অনুমান করিতেও পারিবেন না।

ইতিপূর্বে তাঁহার উপদেশে আমরা আশ্রিত হইয়াছিলাম। উপদেশ অর্থে কেবল মুখের কথা নির্দেশ করিতেছি না। উপদেশ বলিলে আমরা যাহা সচরাচর বুঝিয়া থাকি, অর্থাৎ কতকগুলি বাক্যের কোশল, এ উপদেশ সেরূপ নহে। আমরা যখন তাঁহাকে ঈশ্বর আছেন কি না, এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে, “দিনের বেলায় সূর্য্যের কিরণে একটাও তারা দেখা যায় না, সেইজন্ম তারা নাই একথা বলা যায় না। হৃৎ মাখন আছে, হৃৎ দেখিলে কি মাখনের কোন জ্ঞান জন্মে? মাখন দেখিতে হইলে হৃৎকে দখি করিতে হয়, পরে উহা সূর্য্যোদয়ের পূর্বে (ইচ্ছামত সময়ে) হইবে না। মন্থন করিলে, মাখন বাহির হইয়া থাকে। যেমন বড় পুষ্করিনীতে মাছ ধরিতে হইলে অগ্রে বাহার। জাহাতে মাছ ধরিয়াছে, তাহাদের নিকটে, কেমন মাছ আছে, কিসের টোপে ধায়, কি চার প্রয়োজন, এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, যে ব্যক্তি মাছ ধরিতে যায়, সে ব্যক্তি নিশ্চয় সিদ্ধ মনোরথ হইয়া থাকে। ছিপ ফেলিলামাত্র মাছ ধরা যায় না, স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে হয়। পরে সে ‘বাই ও ফুট’ দেখিতে পায়। তখন তাহার মনে মাছ আছে বলিয়া বিশ্বাস হয় এবং ক্রমে মাছ গাঁথিয়া ফেলে। ঈশ্বর সম্বন্ধেও সেই প্রকার। সাধুর কথায় বিশ্বাস, মন-ছিপে, প্রাণ-কাঁটায়, নাম টোপে, ভজিতার ফেলিয়া অপেক্ষা করিতে হয়, তবে ঈশ্বরের ভাবরূপ ‘বাই ও ফুট’ দেখিতে পাওয়া যাইবে। পরে একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার হইবে।” আমরা ঈশ্বরই মানিতাম না, তাঁহার রূপ দেখা যাইবে, একথা কে বিশ্বাস করিবে? আমাদের এই ধারণা ছিল যে, ঈশ্বর নাই। যদি থাকেন, আমাদের ব্রাহ্ম পণ্ডিতদিগের মতে তাহা নিরাকার, ব্রাহ্মসমাজে বেড়াইয়া তাহা গুনিয়া রাখিয়াছিলাম। বিশ্বাস হইবে কিরূপে? পরমহংসদেব আমাদের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, “ঈশ্বর প্রত্যক্ষ বিষয়। বাহার

‘মায়া এত সুন্দর ও মধুর, তিনি কি অপ্রত্যক্ষ হইতে পারেন ? দেখিতে পাইবে।’ আমরা কহিলাম, ‘সব সত্য, আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহার বিরুদ্ধে কে কথা কহিতে পারিবে ? কিন্তু এই জন্মে কি তাঁহাকে পাওয়া যাইবে ?’ তিনি বলিলেন, ‘যেমন ভাব তেমন লাভ, মূল কেবল প্রত্যয়’। এই বলিয়া একটা গীত গাহিলেন,

“ভাবিলে ভাবের উদয় হয় ।

যেমন ভাব তেমন লাভ মূল সে প্রত্যয় ।

কালৌ পদ সুধা হৃদে, চিত্র ডুবে রয় ।

(যদি চিত্র ডুবে রয়)

তবে, জপ যজ্ঞ পূজা বলি কিছুই কিছু নয় ।”

তিনি পুনরায় বলিলেন, “যে দিকে যত পা যাওয়া যায়, বিপরীত দিক্ তত পশ্চাৎ হইয়া পড়িবে, অর্থাৎ পূর্বদিকে দশহাত্ গমন করিলে পশ্চিম দিকের দশহাত পশ্চাৎ হইবেই হইবে।” আমরা তথাপি বলিলাম যে, “ঈশ্বর আছেন বলিয়া প্রত্যক্ষ কিছু না দেখিলে, দুর্বল অবিখ্যাসী মন কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না।” পরমহংসদেব বলিলেন, “সাম্প্রতিক রোগী এক পুষ্কর জল পান করিতে চায়, এক হাঁড়ী ভাত খাইতে চায়, কবিরাজ কি সে কথায় কখন কাণ দেন ? আজ জ্বর হইয়াছে, কাল কুইনাইন দিলে কি জ্বর বন্ধ হয় ? না, ডাক্তার রোগীর কথায় তাহা ব্যবস্থা করিতে পারেন ? জ্বর পরিপাক পাইলে ডাক্তার আপনি কুইনাইন দিয়া থাকেন, রোগীকে আর কিছু বলিতে হয় না।” আমাদের ব্যস্ত চিত্ত কিছুতেই স্থির হইল না।

দিন কতক পরে আমাদের মনে নিতান্ত ব্যাকুলতা আসিল। সেই সময়ে একদিন রজনৌ অবসান কালে স্বপ্নে দেখিলাম যে, পূর্বপরিচিত এক সরোবরে আমরা স্নান করিয়া উঠিলাম। পরমহংসদেব নিকটে আসিয়া একটা মন্ত্র প্রদান পূর্বক বলিলেন, “প্রত্যহ স্নানের পর আর্দ্র বস্ত্রে একশত বার জপ করিবে।” নিজা ভঙ্গের পর আনন্দে শিহরিয়া উঠিলাম এবং তৎক্ষণাৎ দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার নিকটে যাইয়া স্বপ্নরসান্ত প্রকাশ করিয়া বলিলাম। এই কথা শুনিয়া পরমহংসদেব অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং নানাবিধ উপদেশ দিয়া, স্বপ্নে মন্ত্র পাওয়া নিতান্ত সৌভাগ্যের কথা, বলিয়া আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। আমরা এমনই জন্ম-অবিখ্যাসী, ইহাতেও বিশ্বাস হইল না। পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল কি একদিনে যাইবে ? স্বপ্ন মস্তিষ্কের বিকার, উদয়

উষ্ণ হইলে এবং মনে এক বিষয় সর্বদা চিন্তা করিলে, তাহা স্বপ্নে দেখা যায়, একথা ইংরাজী-বিদ্যা-বিশারদ জ্ঞানী-প্রবরেরা বলিয়াছেন। এ সংস্কার—পরমহংসদেবের কথায় কি দূর হইতে পারে? কি করিব, চূপ করিয়া ফিরিয়া আসিলাম।

তদনন্তর দিন দিন অশান্তি আসিয়া আমাদের হৃদয় অধিকার করিল। পূর্বে কোন দিন কোন সুন্দরী স্ত্রী দেখিলে তাহার ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া, দু'শ মজা সম্ভোগ করিয়া লইতাম, এখন আর সে ভাব আসে না। অশান্তি দূর করিবার নিমিত্ত সুন্দরীর ছবি হৃদয়মধ্যে আনিতে চেষ্টা করি, কিন্তু তাহা আর স্থান পায় না। যে বিষয়ের অনুরোধে একদিন প্রভুর আসাও উপেক্ষা করিয়াছিলাম, তাহার সংস্পর্শে বরং অশান্তি বিগ্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। মনে হইত, যেন এ পৃথিবী আমাদের জন্ত বায়ুশূন্য হইয়াছে। বন্ধঃস্থলের ভিতর, থেকৈ থেকে, যেন কেমন এক প্রকার ক্লেশকর ভাব অনুভব করিতাম। তখন আপস-আপনি আক্ষেপ করিয়া কহিতাম, কি কুক্ষণেই পরমহংসদেবের কাছে আমরা গিয়াছিলাম, কেন আমাদের এ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল! তখন কি কেহ বন্ধ ছিল না, যাহারা এই অশান্তির রাজ্য হইতে আমাদের প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিত? এখন উপায় কি? ঈশ্বর আছেন কি না, তাহা স্থির হইল না। কথায় কে বিশ্বাস করে? যদি এমন আভাস পাওয়া যায় যে, ঈশ্বর বলিয়া কেহ আছেন, তাহা হইলে চূপ করিয়া থাকিতে পারি। জ্ঞান-বিচারে ঈশ্বর নিরূপণ করা পাগলের কথা। কেবল জ্ঞানে ঈশ্বর আছেন বলাও যাহা, আর ঈশ্বর নাই বলিয়া মনে দৃঢ় ধারণা করিয়া রাখাও তজ্জপ। এই প্রকার অবস্থায় আমরা কিয়দিবস অবস্থিতি করিলাম। একদিন বেলা এগারটার সময় পটলডাঙ্গার গোলদিঘির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আমরা দুইজনে আমাদের মনোদুঃখ বলাবলি করিতেছিলাম, এমন সময়ে, একটা গ্রামকায় ব্যক্তি ঈষৎ হাস্য করিয়া, নিকটে আসিয়া, মুহূর্ত্তে বলিলেন, “ব্যস্ত হ'চ্চ কেন, স'য়ে থাক।” আমরা চমকিয়া উঠিলাম। কে আমাদের প্রাণের কথা বুঝিয়া অশান্তিরূপ প্রজ্জ্বলিত হতাশনে “ব্যস্ত হ'চ্চ কেন, স'য়ে থাক” রূপ আশা-বারি ঢালিয়া দিলেন? কে আমাদের অন্তর রাজ্যে প্রবেশ করিয়া অন্তরের কণ্টক-বৃক্ষ ছেদন করিয়া শান্তি স্থাপন করিলেন? এই কি ঈশ্বরের “ফুট” “বাই”? কি এ? তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া দেখি, আর তিনি নাই। কোন্ দিকে বাইলেন, দেখিতে পাইলাম না।

আমরা দুই জনে পাতি পাতি করিয়া দেখিলাম, তাঁহাকে আর দেখা গেল না। আরও সন্দেহ বাড়িল, আরও আনন্দ উথলিয়া উঠিল। কি দেখিলাম, কি শুনিলাম, এ যে অমৃতবৎ-প্রাণ-সংরক্ষণী জীবন-সঞ্জীবনী আকাশবানীর মত হইয়া গেল। বেলা এগারটা, আমরা দুইজনে, সুস্থ দেহে, সুস্থ মনে, দাঁড়াইয়াছিলাম। চক্ষের দোষ ছিল না, কারণ, সকলকে পূর্বের ঠায় দেখিতেছিলাম। কাণের বিকৃতিবস্থা হয় নাই, কারণ, তাহাতেও পূর্ববৎ শ্রবণ করিতেছিলাম। তবে দেখিলাম কি! শুনিলাম কি! আমরা দুই জনে শুনিলাম, দুই জনে দেখিলাম, দুই জনের এক সময়ে এক প্রকার দর্শনের এবং এক প্রকার শ্রবণের বিকার জন্মিল! এ প্রকার বিকারকেও ধ্বং, এ প্রকার দর্শন ও শ্রবণকেও ধ্বং! আমরা দক্ষিণ দিকে বহুবাজার পর্য্যন্ত দেখিলাম, সে দিকে তিনি নাই; পশ্চিমের দিকে কলুটোলা পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছিল, সে দিকেও তিনি নাই; উত্তরের দিক হইতে ত আসিলেন, পূর্বে যাইতে হইলে আমাদের সম্মুখ দিয়া যাইতে হইবে। তাঁহার অদৃশ্য হওয়ার কোন কারণ নিরূপিত করিতে পারিলাম না। কিন্তু সেই দিন এই ধারণা হইল যে, ঈশ্বর আছেন। পরমহংসদেবকে এই সংবাদ প্রদান করা হইল, তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ মূঢ় হান্তে কহিলেন, “কত কি দেখিবে।”

এতদিনে বাস্তবিক আমাদের শান্তি হইল এবং মনের অন্ধকারপুঞ্জ বিদূরিত হইতেছে বলিয়া বুঝিলাম। আমরা ক্রমে আনন্দের আভাস পাইতে লাগিলাম। সময়ে সময়ে হৃদয়মাঝে কেমন এক প্রকার ভাব হইত, পরে উহা পরিবর্তিত হইয়া এ প্রকার উচ্চ হান্তের ফোয়ারা ছুটাইত যে, আমরা ক্রমাগত অর্ধ ঘণ্টা হাসিয়া ক্লাস্ত হইয়া যাইতাম। কখন এত রোদন করিতাম যে, নয়ন-জলে বস্ত্র ভিজিয়া যাইত। কখন কথায় কথায় হাসি এবং কথায় কথায় কান্না আসিত। এ ক্রন্দন বিরহ জনিত নহে। এই সময়ে আমরা সন্ন্যাসব্রত লইবার জন্ত পরমহংসদেবকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, “ইচ্ছা করিয়া কিছু হয় না এবং করিতেও নাই। ঈশ্বর কাহাকে কি করিবেন, তাহা তিনিই জানেন। বিশেষতঃ পুষ্করীতে যেমন মাছের ছানার কাঁকের নিম্নস্থিত ধাড়ি মাছটাকে মারিয়া ফেলিলে, অথ মাছ ছানাগুলিকে ধাইয়া ফেলে, সেই প্রকার তোমাদের সংসার ত্যাগ করাইলে, স্ত্রী পুত্রাদিয়া কোথায় যাইবে? ভগবান্ এখন এক প্রকার বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছেন, আবার তাঁহাকে নূতন ব্যবস্থা করিতে হইবে। সময় হইলে সকল

দিকে সুবিধা হইবে।” এ কথা আমরা শিরোধার্য্য জ্ঞান করিলাম। সহজে সংসার ছাড়িবে কে ? তখন আমরা আপনাদিগকে উন্নত মনে করিয়া লইয়াছিলাম। তখন আমরা বৈরাগ্যকে সার ধর্ম্ম জ্ঞান করিয়াছিলাম। অল্প কিছু হউক বা নাই হউক, লোকের নিকটে সম্মান পাইবার বিলক্ষণ সুবিধা। বৈরাগী হইয়া আপনার মাথা আপনি কিনিব। কিন্তু লোকে তাহার অল্প লালায়িত হইয়া বেড়াইবে। বিনা শারীরিক ক্রেশে, সুখ স্বচ্ছন্দে দিন যাপন হইয়া যাইবে। সকলের উপর সহজে একাধিপত্য স্থাপন করিবার বৈরাগী হওয়া ভিন্ন দ্বিতীয় পন্থা নাই। আমরা পুনরায় সন্ন্যাসী হইবার চেষ্টা করিলাম। মনে বড় সাধ হইল যে, লালাবাবুর মত অক্ষয় নামটা রাখিয়া যাই। কিন্তু হইবে কি ? পরমহংসদেব কহিলেন, “সংসার ছাড়িয়া যাইবে কোথায় ? সংসারের সহিত কেল্লার তুলনা হওয়া হয়। কেল্লার মধ্যে থাকিয়া যেমন শত্রুর সহিত যুদ্ধ করা সহজ, কারণ, তথায় রসদ ও গোলাগুলী অধিক পরিমাণে জমা করা থাকে। মাঠে যাইয়া যুদ্ধ করা তেমন নহে, তাহা দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া চলিতে পারে না। সেই প্রকার সংসারে সাংসারিক কার্য্য চারি আনা এবং অবশিষ্ট বারো আনা মনে ঈশ্বর সাধনা করিতে হয়। সংসারে বারো আনা বৈরাগ্য জন্মিলে, তখন সংসার ছাড়ার ক্ষতি হয় না। তাহা না করিলে ‘এক কোপীনকো আশ্তে’র ত্রায় হইতে হইবে।

“কোন অরণ্যে এক সাধু ছিলেন। তিনি ফলমূল ও কন্দাদি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন। কুটীরাদি না থাকায় বৃক্ষের নিয়দেশেই অবস্থান করিয়া বর্ষার জল, শীতের হিম এবং গ্রীষ্মের প্রচণ্ড সূর্য্যকর হইতে আপনাকে রক্ষা করিতেন। এই অরণ্যের সন্নিকটে লোকালয় ছিল। স্ততরাং, তত্ত্ব-জ্ঞান-লব্ধ ব্যক্তিরা সময়ে সময়ে তাঁহার নিকটে আসিয়া ভগবৎবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিষয়াসক্ত চিন্তে কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিয়া যাইতেন। এই সাধুকে মধ্যে মধ্যে জনসমাজে উপস্থিত হইতে হইত বলিয়া লজ্জাবরোধক কোপীন অবলম্বন করিতে হইয়াছিল।

“সাধু প্রাতঃকালে গাভ্রোথান পূর্ব্বক নদীতে অবগাহন করিয়া শুষ্ককোপীন ধারণ ও আর্দ্র কোপীন পরিবর্তন করিতেন এবং উহা শুষ্ক করিবার অল্প বৃক্ষের শাখায় রাখিতেন।

“কিছুদিন এইরূপে অতিবাহিত হইলে পর, সাধু একদা কোপীন পরি-

বর্তনকালীন দেখিলেন যে, ইন্দুরে উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটয়া ফেলিয়াছে । তিনি অগত্যা নূতন কোপীন পরিধান করিতে বাধ্য হইলেন । সাধু ততই নূতন কোপীন ব্যবহার করিতে লাগিলেন, ইন্দুর ততই নষ্ট করিতে লাগিল । সাধু ক্রমে কোপীনের জন্ত নিতান্ত চিন্তিত হইয়া পাঁচজনকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করায়, তাঁহারা বিড়াল পোষিবার জন্ত পরামর্শ দিল । সাধু তৎক্ষণাৎ গ্রাম হইতে একটা বিড়ালশাবক আনয়ন করিলেন এবং তৎপর দিবস হইতে তাঁহার কোপীন বিনষ্ট হওয়া স্থগিত হইয়া গেল । সাধুর আনন্দের সীমা রহিল না ।

“বিড়াল স্বভাবতঃ মৎস্তাদি এবং দুগ্ধ ব্যতীত আহার করিতে পারে না । অরণ্যে সাধুর নিকট যাঁইয়াও সে তাব পরিবর্তন করিতে পারে নাই । সুতরাং, সাধুর সহিত ফলমূল ভক্ষণ করিতে পারিত না । আহার ব্যতীত উহা ক্রমে জীর্ণ লীর্ণ হইতে লাগিল । সাধু, তখন কুঁড়ের জীব এবং তাঁহার উপকারী ক্তানে গ্রাম হইতে বিড়ালের জন্ত দুগ্ধ ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন ।

“কিয়দিবস পরে কোন ব্যক্তি বলিল যে, ‘সাধুজী ! আপনার প্রত্যহ দুগ্ধের প্রয়োজন । দুই এক দিবস ভিক্ষায় চলিতে পারে । বারো মাস কে আপনাকে ভিক্ষা দিবে ? আপনি একটা গাভী আনয়ন করুন, তাহাতে প্রচুর দুগ্ধ হইবে, আপনি এবং আপনার বিড়াল উভয়েই পরিতৃপ্ত রূপে দুগ্ধ পান করিতে পারিবেন ।’ সাধু এই পরামর্শ নিতান্ত অবস্থাসম্মত জ্ঞান করিয়া অবিলম্বে তাহাই করিলেন । সাধুকে আর দুগ্ধ ভিক্ষা করিতে হইল না ।

“কাল সহকারে সেই গাভীর বৎস হইতে লাগিল এবং উহাদের জন্ত বিচালী সংগ্রহ করা ক্রমে প্রয়োজন হইয়া উঠিল । তখন সাধু পুনরায় সকলের পরামর্শে পতিত ভ্রমিতে কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিলেন । তদ্বারা ধান, কলাই ও বিচালী অপৰ্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হইতে লাগিল । কৃষিকার্য্যের জন্ত কৃষক নিযুক্ত করিতে ও তাহাদের জমা খরচ ও ধানাদির হিসাব রাখিতে সদাই তাঁহাকে নিযুক্ত হইতে হইল । যখন ধান চাল সঞ্চিত হইয়া আসিল, তখন তাহা রক্ষার্থ গোলাবাড়ী ও বিচালী দ্বারা নিষ্কের ও ভৃত্য গবাদির গৃহ নির্মাণ করিয়া, তিনি প্রকৃত গৃহস্থের জায় মহাব্যস্ত হইয়া দিন যাপন করিতে লাগিলেন ।

“একদিন সাধু আপন গৃহ প্রান্ত্রে ভৃত্যাদি ও গ্রামবাসীদের সহিত

অশ্রান্ত বৈষয়িক কার্যে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, এমন সময়ে তাঁহার গুরু আসিয়া উপনীত হইলেন। তিনি সর্বাগ্রে বিম্বিত হইয়া সাধুর কোন ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘এই স্থানে একটা উদাসীন থাকিতেন, তিনি কোথায় গিয়াছেন বলিতে পার?’ গুরু এই কথা বলিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, হয় ত তাঁহারই ভ্রম হইয়া থাকিবে। তিনি ভুলিয়া অশ্র কোন স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ভৃত্য কোন উত্তর প্রদান করিতে পারিল না। পরে তিনি ঐ সাধুর বাটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সম্মুখে তাঁহার শিষ্যকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘বৎস! এ সকল কি?’ শিষ্য অপ্রতিভ হইয়া, অমনি গুরুর চরণে প্রণতি পূর্বক বলিলেন, ‘প্রভু! এক কোপীন কো আস্তে।’ এই কথা বলিয়া তাঁহার অবস্থাস্তর হইবার আনুপূর্বিক রুতাস্ত নিবেদন করিলেন এবং সেই সকল বিষয়াদি তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিয়া গুরুর পশ্চাদগামী হইলেন *।’

আমরা অগত্যা নিস্তক হইয়া রহিলাম। পাঠক পাঠিকাগণ! পরমহংস-

* তাৎপর্য।—সাংসারিক ব্যক্তির এইরূপে বন্ধনের উপর বন্ধন দ্বারা আপনাকে আপনি অজ্ঞাতসারে আবদ্ধ করিয়া রাখে। আত্মসংরক্ষক জ্ঞান-কোপীন অজ্ঞান-মুখিক কর্তৃক বিধ্বস্ত হওয়া নিবারণ হেতু যে সকল উপায় অবলম্বনের প্রণালী আছে, তাহাতে আশু উপকার হয় বটে, কিন্তু এতদ্বারা পরিশেষে সমধিক ক্লেশের কারণ হইয়া থাকে। তখন প্রকৃত উদ্দেশ্য বিলুপ্ত হইয়া বাহ্যিক কার্যেরই আড়ম্বর হইয়া পড়ে। যেমন, আত্মরক্ষা হেতু বিদ্যাশিক্ষা স্ত্রীলাভ এবং ধনোপার্জনাদির নানাবিধ বিধি আছে। সংসারক্ষেত্রে বাহাতে ভ্রমসঙ্কটে পতিত না হইয়া বিশুদ্ধ জ্ঞানোপার্জন করা যায়, তাহার লক্ষ্য বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজন। কিন্তু ইহা দ্বারা অহংভাবের এতদূর প্রাচুর্য হইয়া থাকে যে, অভিমানের কার্যেই সমস্ত সময়ান্তি বাহিত হইয়া যায়। চরিত্র রক্ষাই স্ত্রী সহবাসের বিশেষ উদ্দেশ্য, কিন্তু তাহাতে সন্তানাদি উৎপন্ন হইয়া নুতন চিন্তার স্রোত খুলিয়া দেয়, অর্থাৎ সন্তানের শারীরিক মঙ্গলামঙ্গল কামনা, তাক্সাদেক পরিণয় কার্যাদি দ্বারা কুটুম্বাদির সহিত সম্বন্ধ রক্ষা, সন্তানাদির সন্তান হইলে আনন্দে অভিভূত হওয়া ইত্যাদি। শরীর রক্ষার্থ ধনোপার্জন। ধনের দ্বারা যেরূপ অভিমানের প্রাবল্য হইয়া থাকে, সেরূপ আর কিছুতে হইতে পারেনা। ধনী ব্যক্তির যে প্রকার অশ্রায় কার্য করিয়া থাকেন, তাহা আর কাহারও অবিদিত নাই। মনুষ্যেরা এইরূপে আত্মবিশ্বস্ত হইয়া কার্যের হিলোলে নিরত ঘৃণিত হইয়া থাকে। যৎকালে তাহার একেবারে আত্মহারা হয়, তখন ভগবান গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়া জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দিয়া থাকেন।

এ স্থানে যদিও ভগবান পরিজ্ঞান করেন বটে, কিন্তু পূর্ব হইতে সতর্ক হইলে কর্মফলজনিত অশেষ দুঃখ ভোগ হইতে মুক্তিলাভ করিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা থাকে।

দৈবের কতদূর অন্তর্দৃষ্টি ছিল, এই বার তাহা বুঝিয়া লইবেন। আমরা সাধু হইয়াছি তাহার পরিচয় দিলাম। কিন্তু এই বার সাধুদিগের পরীক্ষার দিন উপস্থিত হইল। এ পর্য্যন্ত মনে বিলক্ষণ শান্তি রহিয়াছিল এবং পরমানন্দে দিন কাটাইতে ছিলাম। কি জানি কেন, মন একেবারে অশান্তি-সাগরে ডুবিয়া বুকের ভিতরটা শূন্য হইয়া পড়িল এবং মরুভূমি-প্রায় বোধ হইল। আমরা ভাবিয়া আর কুল পাইলাম না। পরমহংসদেবের নিকট পুনরায় দুঃখকাহিনীর দোকান খোলা হইল। তখন তিনি আর এক ভাব দেখাইলেন। তিনি কহিলেন, “আমি কি করিব, সকলই হরির ইচ্ছা।” আমরা আশ্চর্য হইয়া তাঁহাকে বলিলাম, “সে কি মহাশয়! আপনার আশায় এত দিন যাতায়াত করিতেছি, এখন এ প্রকার কথা বলিলে, আমরা কোথায় যাইব?” তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “আমি তোমাদের কিছু খাইও নি, লিইও নি। আমার দোষ কি? ইচ্ছা হয় আসিও, না হয় না আসিও। তোমরা যে সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী * করিয়াছ, তাহা লইয়া যাও।” এই নির্দাক্ষণ কথা তাঁহার প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া আমরা দণ্ডিত শূন্য বোধ করিলাম। একবার মনে হইল যে, পৃথিবী! তুমি বিদীর্ণ হইয়া আমাদের উদরস্থ করিয়া ফেল! আবার মনে হইল, না, নিকটে গঙ্গা আছেন, রজনীযোগে জোয়ারের সময়ে ডুবিয়া মরিব! এই স্থির করিয়া তাঁহার সম্মুখ হইতে স্থানান্তরে প্রস্থান করিলাম। তখন মনে হইল, মরিব কেন, একবার চেষ্টা করিয়া দেখি। পরমহংসদেব বলিয়াছেন যে, স্বপ্নসিদ্ধ ব্যক্তি সৌভাগ্যবান। আজ সেই মন্ত্রের বিক্রম পরীক্ষা করিব। শুনিয়াছি, ভগবান হইতে তাঁহার নাম বড়। তিনি যত রূপ ধারণ করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহা গিয়াছে ও যাইতেছে, কিন্তু নাম চিরকাল সমভাবে রহিয়াছে ও থাকিবে। এই ভাবিয়া পরমহংসদেবের গৃহের উত্তর দিকের বারাণ্ডার শয়ন করিয়া রহিলাম এবং মনে মনে সেই মন্ত্র জপ করিতে লাগিলাম। অতি গভীর রাত্রে পরমহংসদেব সুস্থান সেই দিকের দ্বার খুলিয়া আমাদের নিকটে আসিয়া উপবেশন করিলেন এবং ভক্ত সেবা করিবার আজ্ঞা দিয়া চলিয়া গেলেন। আবার কি বিপদ! ভক্ত সেবা করিবে কে? তাহাতে অর্ধব্যয় আছে। অর্ধব্যয় করিয়া ধর্ম করা—তখনও সে শক্তি হয় নাই। কিন্তু ইতিপূর্বে আমরা বৈরাগী লাল

* ভক্তেরা যখন পরমহংসদেবের নিকট থাকিতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁহাদের নিমিত্ত হসেন্স বাবু কিছু দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন।

বাবুর মত হইতে গিয়াছিলাম। অত অম্মরাগ, অত আত্মবিকার, গঙ্গায় ডুবিয়া মরিলুম এ সকল ভাব এক কথায় উড়িয়া গেল। ধন্য বৈরাগ্য! ধন্য তোমার লীলা! সে যাহা হউক, আমরা ইচ্ছা করিয়া সে সকল কথা ভুলিতে চেষ্টা করিলাম, ফলে ভুলিয়া যাইলাম। দিনকতক পরে বৈশাখি পূর্ণিমার দিন, পরমহংসদেব পূর্বের জায় আপন ইচ্ছায় আমাদের বাটীতে আসিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। কি করিব চিন্তা করিয়া অত ভক্তের বাটীতে যাহাতে তিনি সেই দিন গমন করিতে পারেন, তাহার বিধিগত চেষ্টা পাইতে লাগিলাম। বলিলাম যে, আমাদের বাটীতে স্থানান্তর, নিকটে গয়লাপাড়া, অতিশয় দুর্গন্ধ-যুক্ত স্থান, পরমহংসদেবের কষ্ট হইবে, ইত্যাকার সহস্র আপত্তি উত্থাপন করিলাম। পরমহংসদেব যে সময়ে ভক্ত সেবার কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন আমরা সেই সময়ে বলিলাম যে, “অর্থ দিবার কৰ্ত্তা যিনি, তিনিই দিবেন, আমরা ভূতাবিশেষ, দ্রব্যাদি কিমিয়া আনিয়া দিব।” এই সময়ে আমাদের অর্থোপার্জন্যের বিলক্ষণ সুবিধা হইয়াছিল এবং কয়েক দিনে শত শত মুদ্রা সংগ্রহ হইয়াছিল। পাষণ্ড আমরা, সেই অর্থগুলি একত্রিত করিয়া দ্বার নিকট লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম। তখন একবার মনে হয় নাই যে, এ প্রকার অর্থ আসিতেছে কেন? অর্থগুলি আপনারা আত্মসাৎ করিয়া অস্ত্রের স্বৰূপে পরমহংসদেবকে ফেলিবার প্রয়াস পাইয়া কৃতকার্য হইলাম। যদিও কোন ভক্ত সেই দিনে তাঁহার বাটীতে পরমহংসদেবকে লইয়া যাইতে স্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু অন্তরের সহিত নহে। সে যাহা হউক, যখন আমাদের মস্তকের বোঝা গেল, আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া রজনী যাপন করিলাম। প্রাতঃকালে শয্যাভ্যাগকালে পূর্বের যাবতীয় কথা একে একে স্মরণ হইতে লাগিল। অর্থ কেন আসিয়াছে, কেন পরমহংসদেব বৈশাখি পূর্ণিমার দিন আসিবেন বলিয়াছেন, ইহার ভাব যেন দেখিতে পাইলাম। তখন মনে হইল যে, এই আমরা বৈরাগ্য লইতে গিয়াছিলাম? শিক্! শিক্! এমন কীটানুকীট আমরা, যে প্রভুর অর্থ আত্মসাৎ করিবার সময় মনে একবার চিন্তা হইল না! আমরা হইব বৈরাগী! বাস্তবিক বৈরাগীর ভাবই বটে! আপন পর বিচার নাই, হাতে এলোই আমার। বলিহারী বৈরাগ্য ভাব, সাবাস বৈরাগী ঠাকুর! এই ঘটনায় বাস্তবিক আমাদের নিলজ্জা চক্ষু লজ্জা আসিয়াছিল। কেমন করিয়া পরমহংসদেবের নিকটে মুখ দেখাইব, কেমন করিয়া একথা অত ভক্তদিগকে বলিব, ভাবিয়া শ্রিয়মাণ হইয়াছিলাম। এবারে অতি সযত্নে হৃদয়ের সহিত তত্ত্বসেবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

যথাদিনে যথাসময়ে পরমহংসদেব শুভাগমন করিলেন এবং যথানিয়মে মহোৎসব কার্য্য সূচাক্রমে সম্পন্ন পূর্ব্বক আনন্দের হাট বাজার সংস্থাপন করিয়া যথাসময়ে দক্ষিণেথরে প্রত্যাগমন করিলেন ।

পরমহংসদেবের সহিত সাক্ষাৎ হইবার কিছুদিন পরে আমরা চৈতন্ত-চরিতামৃত পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম । যতই চৈতন্তচরিতামৃত পাঠ করি, ততই যেন পরমহংসদেবকে দেখিতে পাই । মনে হইতে লাগিল, এই ~~স্থান~~ যেন পরমহংসদেবের জীবনরত্নাস্ত্রবিশেষ । আমাদের মনে একটা নিতান্ত সন্দেহ জন্মিয়াছিল । সন্দেহ হইবারই কথা ; কথাটাত একটা কথার কথা নহে । একদিন পরমহংসদেব দক্ষিণেথরে রাত্রি যাপন করিতে আমাদের আজ্ঞা করেন । আমরা তাহা স্বীকার করিয়াছিলাম । ঠিক সন্ধ্যার সময়ে তাঁহার গৃহে আমরা বসিয়া আছি, তথায় পরমহংসদেব ব্যতীত আর কেহ ছিলেন না । তিনি অতি প্রশান্তভাবে কিয়ৎকাল বসিয়া থাকিয়া আমাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি দেখিতেছ ?” আমরা বলিলাম, “আপনাকে দেখিতেছি ।” পরমহংসদেব পুনরায় কহিলেন, “আমাকে কি মনে কর ?” আমরা বলিলাম, “আপনাকে শ্রীচৈতন্তদেব বলিয়া জ্ঞান হয় ।” পরমহংসদেব কিয়ৎকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিতে লাগিলেন, “বাম্ণী ঐ কথা বলতো বটে ।” তদবধি আমাদের মনে এক প্রকার কি অস্পষ্ট ভাব হইয়া রহিল, উহা বিশেষরূপে বুঝিতে পারিলাম না । কিন্তু সেদিনকার কথাটা নিতান্ত গুরুতর বলিয়া ধারণা হইয়াছিল । আমরা প্রতিদিন পরমহংসদেবের অমামুষ্য শক্তির অনেক কার্য্যই দেখিতাম, তাহা স্থানে স্থানে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে । আমরা যে দিন যাহা শ্রবণ করিব বলিয়া মনে করিয়া গিয়াছি, সেই দিন সেই কথাই শ্রবণ করিয়াছি । যে যেখানে যাহা করিত, তিনি সকল বিষয় জানিতে পারিতেন । তিনি জিলিপি দাঁড়িতে বড় ভালবাসিতেন । সেইজন্য আমরা একদিন শ্রামবাজারের মোড়ের দোকান হইতে জিলিপি খরিদ করিয়া দক্ষিণেথরে বাইতেছিলাম । পুলের দক্ষিণদিকে একটা চার পাঁচ বৎসরের ছেলে একখানি জিলিপির জন্ত গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল । আমরা প্রথমে তাহাকে ধমকাইয়া তাড়াইবার চেষ্টা করিলাম । সে গুনিল না । পরে ভক্তমালগ্রন্থের একটা গল্প আমাদের মনে হইল । “এক সাধু রুটী প্রস্তুত করিয়া ঘৃত আনয়ন করিতে গিয়াছিলেন । প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন যে, একটা কুকুর রুটীগুলি মুখে করিয়া লইয়া বাইতেছে । সাধু কুকুরের পশ্চাৎ

ধাবিত হইয়া কহিলেন, রাম, অপেক্ষা কর, কটীগুলি ঘি মাখাইয়া দি।” আমরা ভাবিলাম, এ ছোঁড়া বুকি আমাদের ছলনা করিতেছে। কি জানি, যদি ঈশ্বরের কোন প্রকার কৌতুক হয়, তাহা হইলে, আমাদের অপকার হইবে, ইত্যাকার চিন্তা করিয়া, তাহাকে একখানি জিলিপি ফেলিয়া দিলাম। এ কথা আর কেহ জানিল না। দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছিয়া আমরা নির্দিষ্ট স্থানে উহা সংস্থাপন পূর্বক সমস্ত দিবস আনন্দ করিয়া কাটাইলাম। অপরাহ্নকালে পরমহংসদেব কিঞ্চিৎ জল পান করিতে চাহিলেন, আমরা ব্যস্তমস্তে সেই জিলিপিগুলি প্রদান করিলাম। আশ্চর্য্য ব্যাপার, তিনি বাম হস্তে তাহা স্পর্শ করিয়া উজ্জ্বলিত করিয়া পূর্বক জিলিপি কয়েকখানি চূর্ণ করিলেন এবং মস্তক নাড়িয়া ভক্ষণ করিবার অনভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া হস্তধৌত করিয়া ফেলিলেন! এতদৃষ্টে আমাদের বন্ধুত্বের ভিতর যে কি হইতেছিল, তাহা প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। জিলিপিগুলি তৎক্ষণাৎ ফেলিয়া দেওয়া হইল। দুই চারি দিন পরে আমরা পুনরায় পরমহংসদেবের নিকটে গমন করিলে, তিনি কহিলেন, “দেখ, তোমরা আমার জন্ত যখন কোন সামগ্রী আনিবে, তাহার অগ্রভাগ কাহাকেও প্রদান করিও না। আমি ঠাকুরকে না দিয়া ভক্ষণ করিতে পারি না। উচ্ছিষ্ট দ্রব্য ঠাকুরকে কেমন করিয়া দিব?” এই প্রকার ঘটনা সর্বদাই হইত, সুতরাং তাঁহার প্রতি আমাদের অবতারের ভাবই জন্মিয়াছিল।

উল্লিখিত ভক্তসেবার পরদিন সন্ধ্যার সময় আমরা তাঁহার নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। কত উপদেশ দিলেন, কত কথাই বলিলেন। কথায় কথায় ত্রিাদশটা বাজিয়া গেল। সে দিন আকাশ মেঘাবৃত থাকায় অতিশয় অন্ধকার হইয়াছিল। দশটার পর আমরা বিদায় গ্রহণ পূর্বক বাহিরের বারাণ্ডায় আসিয়া পশ্চাৎ দিকে চাহিয়া দেখি যে, পরমহংসদেব আসিতেছেন, আমরা সম্মুখ ফিরিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি নিকটে আসিয়া কহিলেন, “কি চাও?” “কি চাও” কথা যেন বিদ্যুতের স্থায় অন্তর ভেদ করিয়া চলিয়া গেল। ভাবিয়া দেখিলাম, চাহিব কি? মনে করিলাম, এখন চাই। তখনই মনে হইল, ছি ছি কাঞ্চন লইব না। অর্থ কি, তা জানি। তবে কি লইব? সিদ্ধাই প্রার্থনা করি। না, তাহার পরিণাম অতিশয় ভয়ানক! তবে লইব কি? তখন মনে হইতে লাগিল, এই ত ভগবান্ প্রত্যক্ষ করিতেছি, এই ত আমাদেরই ইষ্টদেব বর প্রদান করিতে সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। কি লইব? তখন মনে হইতেছে যে, এখন যাহা

চাহিব তাহাই প্রাপ্ত হইব । কারণ, পরমহংসদেব আজ আমাদের প্রতি কল্পতরু হইয়াছেন । অত্যাধি যাহা কেহ পাইয়াছেন কি না জানি না : কত লোকে আসা যাওয়া করিতেছে, তাহারা হতাশের কথাই বলে, সাধন ভজনের কথাই বলে, ঈশ্বর লাভ করিতে হইবে বলিয়া কন্ঠ অধেষণ করিয়া বেড়ায়, আমি কিছু পাইয়াছি, আমায় সাধু রূপা করিয়াছেন, এ কথা কেহ বলে না, কাহার হৃদয়ে শান্তির কথা বাহির হয় না । এ কি নূতন কথা ? কেন আজ আমাদের নবতাব ? প্রভু “কি চাও” বলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, আমরা চাহিব কি ভাবিয়া দিশেহারা হইলাম । অতঃপর কহিলাম, “প্রভু ! চাহিব কি, তা’ জানি না ! অনেক ভাবিয়া দেখিলাম, আপনার নিকটে কি লইব, তাহা বুঝিতে পারিলাম না । কি লইব, আপনি বলিয়া দিন ।” তিনি তৎক্ষণাৎ কহিলেন, “মন্ত্ৰটী আমায় প্রত্যর্পণ কর, আর জপ তপের প্রয়োজন নাই ।” এই স্বর্গীয় কথায় প্রাণ, মাতিয়া উঠিল । কি শুনিলাম ! এ কি সত্য ? না কি স্বপ্ন দেখিতেছি ? আর কাল বিলম্ব না করিয়া তাঁহার চরণে মন্ত্ৰকাবনত করিয়া মনে মনে মন্ত্ৰটী পুষ্পাঞ্জলি দিলাম । তিনি ভাবাবেশে মন্ত্ৰকের ব্রহ্ম-তালুর উপরিভাগে দক্ষিণ চরণের বৃদ্ধ অঙ্গুলী সংস্পর্শ করিয়া কতক্ষণ রহিলেন, তাহা জ্ঞান ছিল না । যখন তাঁহার ভাবাবসান হইল, তিনি চরণ সরাইয়া লইলেন এবং আজ্ঞা করিলেন যে, “যদি কিছু দেখিবার ইচ্ছা থাকে, ত আমায় দেখ এবং যখন আসিবে এক পয়সার কোন দ্রব্য আনিবে ।” আমরা তদবধি শান্তির রাজ্য লাভ করিয়াছি । এখন একদিনও মনে হয় না যে, আর আমাদের কোন কার্য আছে । তিনি আমাদের সর্বস্ব ধন । যখন যে ভাবে, যে অবস্থায়, যে প্রকারে রাখেন, তাহাতেই পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকি । আমরা এই নিমিত্ত তাঁহাকে পতিতপাবন বলিতে বাধ্য হইয়াছি । তাঁহার নিকটে যাইবার সময় আমাদের যাহা প্রয়োজন ছিল, এক্ষণে তাহা পরিসমাপ্ত হইয়া গিয়াছে ।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, পরমহংসদেব আমাদের স্থায় শত শত পাষণ্ড-দিগকে পরিত্রাণ করিয়াছেন । এই শ্রেণীর অনেকের কথাই অনেকেই জানেন । আমরা তাঁহাদের নামোল্লেখ করিয়া ঘটনাপরম্পরা লিপিবদ্ধ করিবার মনস্থ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহারা সাধারণের নিকট নিজ নিজ পূর্ব পরিচয় প্রদান করিতে লজ্জিত এবং আপনাদিগকে এখনও পরমহংসদেব কর্তৃক বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন কি না, বুঝিতে না পারায়, সাধারণ সমক্ষে পরমহংসদেবের

নামের সহিত কোন প্রকার সংশ্রব রাখিতে চাহেন না। আমরা সেই সকল ব্যক্তিদিগের অভিপ্রায় স্পষ্ট বুঝিতে পারি নাই। তাঁহারা পরমহংসদেবের শিষ্য বলিয়া পরিচিত। যে কেহ তাঁহাদের শ্রদ্ধা করেন, তাহা পরমহংসদেবের সম্বন্ধ আছে বলিয়াই করিয়া থাকেন। কিন্তু সহসা তাঁহারা আমাদের নিকটে আসিয়া হস্ত বন্ধন করিয়া দেওয়ায় আমরা তাঁহাদের অভিপ্রায় স্থির করিতে পারিলাম না। হয়, তাঁহারা কিছু দিন পরে পরমহংসদেবকে উপেক্ষা করিয়া আপনাদিগকে সাধু মোহন্ত করিয়া তুলিবেন, না হয়, এক্ষণে পূর্বকাহিনী প্রকাশ করিলে পাছে সর্বসাধারণে তাঁহাদের পূর্বাভাস জ্ঞাত হইতে পারেন, সেই লজ্জায় এ প্রকার অবৈধাচরণ করিয়াছেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কোন কোন ভক্ত আমাদের এ প্রকার কথাও কহিয়াছেন যে, কাহারও পূর্বকার চরিত্র চিত্রিত করিলে, রাজদণ্ড পাইতে হইবে। আমরা রাজদণ্ডের ভয়ে যে তাঁহাদের নামোল্লেখ করিতে নিরন্ত হইয়াছি, তাহা নহে। এইরূপ তাঁহাদের হৃদয়ের ভাব, সে সকল লোকের বাস্তবিক পরমহংসদেবের নামের সহিত কোন সংশ্রব না থাকাই কর্তব্য। এই শ্রেণীর লোকেরা যে স্থানে থাকেন, সেই স্থানেই একটা বিব্রাট ঘটাইবার চেষ্টা পান। আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, যদি এই সকল ব্যক্তির কক্ষিৎ ঐশ্বরিক শক্তি লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে সেই দিন ইহাদের মুখেও হৃদয় ঠাকুরের ন্যায় কথা বাহির হইবে।

যে সকল ব্যক্তির তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, তাঁহারাও প্রত্যেকে পরমহংসদেবের রূপায় অল্প মনুষ্যমণ্ডলে মনুষ্য বলিয়া পরিচয় দিবার যোগ্য হইয়াছেন।

ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে যে, আমাদের ন্যায় শত শত পাষণ্ড পরমহংসদেবের রূপায় পরিত্রাণ পাইয়াছেন। এই সকল ব্যক্তিদিগের মধ্যে বাবু সুরেন্দ্রনাথ মিত্র এবং বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষের পরিবর্তন সম্বন্ধে কক্ষিৎ বর্ণনা করিয়া, পরমহংসদেবের মহিমা কতদূর বিস্তৃত, তাহার পরিচয় দেওয়া যাইবে। সুরেন্দ্র বাবু (সুরেশ বলিয়া পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছেন) একজন কৃতবিদ্য এবং কলিকাতার সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভব ব্যক্তি। ইনি সওদাগরী আফিসের প্রধান বাঙ্গালী কর্মচারী, স্ততরাং তাঁহার অর্থোপার্জন পক্ষে অসুবিধা ছিল না। সুরেন্দ্র বাবু বর্তমান বাঙ্গারের লোক ছিলেন। ধর্ম্য কর্মাদি কিরূপ করিতেন এবং সে সম্বন্ধে তাঁহার কিরূপ ভাব বা সংস্কার ছিল, তাহা সবিশেষ বলা যায়

না ; কিন্তু পরমহংসদেবের নিকট গমনকাল পর্য্যন্তও তিনি দীক্ষিত হন নাই । এই নিমিত্ত বোধ হয়, তাঁহার ধর্মভাব প্রবল ছিল না । হিন্দুসংস্কারাদি তিনি যদিও সমুদয় সমর্থন করিতেন না, কিন্তু তাঁহাকে অহিন্দু বলিয়া নির্দেশ করা যায় না । তবে ইংরাজী ঢংটা কিছু ছিল, তাহা বর্তমান কালের নিয়ম । সুরেন্দ্র বাবুর অল্প বিশেষ কোন গুণের পরিচয় আমরা পাই নাই বটে, কিন্তু তিনি যে একজন হৃদয়বান লোক, তাহার ভুল নাই । তিনি আমাদের মত নিরীশ্বরবাদী ছিলেন না, কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁহার যে কোনপ্রকার জ্ঞান লাভ হইয়াছিল, তাহাও আমরা বুঝিতে পারি নাই । তাঁহার নিকটে শ্রবণ করিয়াছি যে, একদিন মধ্যাহ্নকালে আহারান্তে বহির্বাটীতে তিনি দাঁড়াইয়াছিলেন, এমন সময়ে একটী কৃষ্ণবর্ণা, আলুলায়িতকেশা, রক্তবস্ত্রপরিধানা, ত্রিশূলহস্তা, জ্বালোককে রাজপথ দিয়া গমন করিতে দেখিলেন । ভৈরবী, সুরেন্দ্রকে দেখিয়া কহিলেন, “বাবা ! সব ফাঁকি, কেবল, সেই সত্য”, এই বলিয়া চলিয়া গেলেন । সেই ভৈরবীকে দেখিয়া সুরেন্দ্রের একটু সাময়িক ভাবান্তর হইয়াছিল । সুরেন্দ্র বাবুর এই সময়ে নিতান্ত মানসিক ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছিল । তাহার কারণ আমরা নির্দেশ করিতে পারিলাম না, কিন্তু তাহাতে তাঁহার প্রাণ সংশয় হইয়াছিল । এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত সুরেন্দ্র বাবুর কোন পরম বন্ধু পরমহংসদেবের নিকটে লইয়া গিয়াছিলেন । পরমহংসদেব সুরেন্দ্র বাবুকে দেখিবামাত্র, এমন ভাবে উপদেশ দিয়াছিলেন যে, সেই জ্ঞানালোক তাঁহার দীর্ঘকাল সঞ্চিত পূর্ব সংস্কার-ভিমিরপুঞ্জ এককালে বিদূরিত হইয়াছিল । সুরেন্দ্র বাবু সেই দিনে ভবসমুদ্রের মধ্যে কুল পাইলেন, জীবনের লক্ষ্য কি বুঝিলেন এবং গৃহ্যর হস্ত হইতে পরিজ্ঞান পাইলেন । পরমহংসদেব তাঁহাকে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটী উপদেশ তাঁহার হৃদয়ে মূলমন্ত্ররূপে কার্য্য করিয়াছিল । পরমহংসদেব কহিয়াছিলেন যে, “লোকে বাদরছানা হইতে চায় কেন ? বিড়ালছানা হইলে ত ভাল হয় । বাদরের স্বভাব এই যে, সে ইচ্ছা করিয়া তাহার মাতাকে জড়াইয়া ধরিলে, তবে সে তাহাকে স্থানান্তরে লইয়া যাইবে, কিন্তু বিড়ালছানার স্বভাব সেরূপ নহে । তাহার মাতা তাহাকে যে স্থানে রাখিয়া দেয়, সে সেই স্থানে পড়িয়া ম্যাও ম্যাও করিতে থাকে । বাদর ছানার স্বভাব জ্ঞান-প্রধান এবং বিড়ালছানার স্বভাব ভক্তি-প্রধান সাধকদিগের সহিত তুলনা করা যায় ।” সুরেন্দ্র বাবুর মন এই কথায় একেবারে মজিয়া গেল । তিনি তদবধি প্রত্যেক

রবিবারে দক্ষিণেশ্বরে না যাইলে স্থির থাকিতে পারিতেন না। কিন্তু পূর্ব সংস্কার সকলেরই সমান। সুরেন্দ্র বাবু, পরমহংসদেবের উপদেশে বিমোহিত এবং পরিবর্তিত হইয়াও, পূর্ব সংস্কারবশতঃ মধ্যে মধ্যে আপন কু-অভ্যাসের অনুরোধে তথা হইতে পাস কাটাইতে চেষ্টা করিতেন, কখন তাহাতে কৃতকার্যও হইতেন। কোন রবিবারে তিনি আফিসের কর্ণের ভাণ দেখাইয়া দক্ষিণেশ্বরে গমন করিলেন না। পরমহংসদেব তাহা শুনিলেন এবং ভাবাবেশে কহিতে লাগিলেন, “দিনকতক আমোদ আহ্লাদ করিবার সাধ আছে, করুক, পরে ওসব কিছুই থাকবে না। তখন একথার মর্শ্ব কেহই অনুধাবন করিতে পারিল না। পরদিন সুরেন্দ্র বাবু কোন ভক্তের নিকট আগমন পূর্বক পরমহংসদেবের নিকট কি কি কথা হইয়াছিল, জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি যত দূর বাহা স্মরণ রাখিয়াছিলেন, তৎসমুদয় কহিলেন। সুরেন্দ্র বাবু তখন আর কোন কথা ভাবিলেন না। পরের রবিবারে তিনি দক্ষিণেশ্বরে গমন করিলেন বটে, কিন্তু পরমহংসদেবের নিকটে না বসিয়া সকলের পশ্চাতে উপবেশন করিলেন। পরমহংসদেব সুরেন্দ্র বাবুর কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিত ভাব দেখিয়া বলিলেন, “চোরটির মত অমন করিয়া বসিলে যে? নিকটে আইস।” সুরেন্দ্র বাবু কি করেন, সম্মুখে যাইয়া বসিলেন। পরমহংসদেব সাধারণ উপদেশচ্ছলে কহিতে লাগিলেন, “দেখ, লোকে যখন কোথাও যায়, মাকে সঙ্গে লইয়া যায় না কেন? তাহা হইলে অনেক বিষয়ে, যাহা করিবার কোন সংস্কার ছিল না, তাহা হইতে রক্ষা পায়। পুরুষার্ধ সর্বদা প্রয়োজন।” সুরেন্দ্র বাবু, এই কথাগুলি তাঁহাকে কথিত হইতেছে বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। তিনি পুরুষার্থের কথা শ্রবণ করিয়া মনে মনে কহিতেছিলেন, ঐ পুরুষার্থের জালায় অস্থির হইয়াছি। পরমহংসদেব অমনি তাহা জানিতে পারিয়া রোষান্বিত ভাবে সুরেশচন্দ্রের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, “কুকুর শৃগালের পুরুষার্থকে পুরুষার্ধ বলে না। পুরুষার্ধ ছিল অর্জুনের—যখনই যাহা করিবেন বলিয়া মনে করিতেন, তখনই তিনি তাহা সম্পন্ন করিতে পারিতেন।” সুরেন্দ্র বাবু এই কথা শ্রবণ করিয়া অবাক হইয়া পড়িলেন এবং মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, “প্রভু! আর বাড়াবাড়ি করিবেন না। আপনার নিকটে আর গোপন করিব কি? মনের কথা টানিয়া বাহির করিলেন, কোথায় কি লুকাইয়া করিলাম, তাহা যদি দেখিতে পাইবেন, তবে আর যাইব কোথায়? ঠাকুর! আপনি জানিতে পারিয়াছেন, আর কেন? আর কিছু ভাবিবেন

না, এখনই এই ভক্তমণ্ডলী সকলে জানিতে পারিবে।” পরমহংসদেব নিরন্তর হইলেন। সুরেন্দ্র বাবু তদবধি তাঁহার পূর্বের যে সকল কু-অভ্যাস ছিল, তাহা ক্রমে পরিত্যাগ করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন।

পরমহংসদেবের শক্তির প্রভাবে সুরেন্দ্রবাবু কিছু দিনের মধ্যে একজন ভক্তশ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বাটীতে পরমহংসদেব সর্বদাই আসিতেন এবং ভক্তগণ লইয়া মহা আনন্দ করিয়া যাইতেন। সুরেন্দ্র বাবুর পূর্ব ঐকৃতি প্রায় পরিবর্তন হইয়া আসিল। তিনি অতিশয় ভক্তি সহকারে প্রত্যহ তাঁহার ইষ্টদেবী কালীর পূজা করিতে লাগিলেন এবং দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের নিকটে যে সকল ভক্ত থাকিতেন, তাঁহাদের জন্ত যে সকল ব্যয় হইত, তাহা এবং পরমহংসদেব সম্বন্ধীয় নানা কার্য্যে অর্থব্যয় সহ করিতেন। সুরেন্দ্র বাবু মুক্তহস্তপুরুষ হইয়া উঠিলেন।

সুরেন্দ্র বাবু সর্বপ্রকারে পরিবর্তিত হইলেন বস্তু, কিন্তু তাঁহার পান-দোষটী কোন মতে যাইল না। এই পান-দোষের নিমিত্ত ভক্তগণ সর্বদাই দুঃখিত ছিলেন। একদা মহাষ্টমীর দিন নৌকাযোগে দক্ষিণেশ্বরে যাইবার সময় কোন ভক্ত সুরা পরিত্যাগ করিতে অস্বরোধ করায়, সুরেন্দ্র বাবু কহিয়াছিলেন যে, তিনি ইচ্ছা করিয়া কিছু করিতে পারিবেন না—তাহা তাঁহার সাধ্যাতীত। পরমহংসদেব যে প্রকার আদেশ করিবেন, সেইরূপ করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। তিনি তাঁহার সঙ্গীকে আরও কহিয়াছিলেন যে, তুমি একথা তাঁহার নিকট উত্থাপন করিও না। তিনি আপনি যাহা বলিবেন, তাহাই গ্রাহ্য করিব। সঙ্গের ভক্তটী চিন্তিত হইলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন, যতপি পরমহংসদেব কোন কথা না বলেন, তাহা হইলে সকল কার্য্যই ভ্রষ্ট হইয়া যাইবে। এই ভাবিয়া পরমহংসদেবকে স্মরণ করিতে করিতে দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া পৌঁছিলেন। তাঁহার উভয়ে মন্দির-উদ্যান প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, পরমহংসদেব ভাবাবেশে বকুলতলার ঘাটের নিকটে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, স্মৃতরাং তখন তাঁহার সহিত কোন কথাই হইল না। কিয়ৎকাল পরে তিনি আপন গৃহাভিযুগ্মে যাত্রা করিলেন। সুরেন্দ্র বাবু ও তাঁহার সঙ্গী পশ্চাত্তর্জী হইয়া গৃহমধ্যে আসিয়া উপবেশন করিলেন। পরমহংসদেব তখনও নয়নোন্মীলিত করেন নাই; কিন্তু সুরেন্দ্র বাবুর প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “ও সুরেন্দ্র! খাব ব’লে ধাবে কেন? কুণ্ডলিনীকে দিবার নিমিত্ত অতি অল্প পরিমাণে কারণ-স্বরূপ পান করিবে।

সাবধান ! পা না টলে এবং মন না টলে । প্রথমে ‘কারণ’ অবলম্বন পূর্বক আনন্দ লাভ করিতে হয়, যাহাকে কারণানন্দ কহে ; তদনন্তর আপনি আনন্দ আসিয়া থাকে, তাহাকে ভজনানন্দ কহে ।” সুরেন্দ্র বাবু ও তাঁহার সঙ্গী অবাক হইয়া রহিলেন । আক্ষেপের বিষয়, সুরেন্দ্র বাবু এই দৈববাণীবৎ উপদেশ, যাহা কাহার ভাগ্যে কেহ কখন ঘটিতে দেখে নাই, শুভাদৃষ্টগুণে প্রাপ্ত হইয়াও তদনুযায়ী কার্য্য করিতে পারেন নাই । কেন যে তিনি এই দৈববাণী উপেক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার কারণ নির্দেশ করিতে আমরা অসমর্থ । বোধ হয় তাঁহার পূর্জাজ্ঞিত পাশ্চাত্য সংস্কার এই বিভ্রাট ঘটাইয়াছিল । কিন্তু পরমহংসদেবের শক্তির কি মহিমা, সুরা সেবন করিয়াও, সুরেন্দ্র বাবু একদিন অল্প কথা কহিতেন না ! সে সময়ে তাঁহার যেন ভক্তিজ্যোত খুলিয়া যাইত ! তাঁহার বালকবৎ মা মা শব্দে পাষণ্ডের হৃদয়েও প্রেমের সঞ্চার হইত ! সে সময়ে তাঁহাকে দেখিলে অকপট, সরল এবং ভক্তির মূর্তি বলিয়া জ্ঞান হইত । এই নিমিত্ত সুরা সেবন করিয়াও সুরেন্দ্র বাবুর আধ্যাত্মিক উন্নতির হানি হয় নাই । তিনি পরমহংসদেবের সর্ব-ধর্ম-সমর্থন করা ভাব বুঝিয়া একখানি ছবি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন । সেই ছবিতে শিবের মন্দির ও গির্জার সম্মুখে গৌরানন্দেব ও ঈশা উভয়ে উভয়ের হস্ত ধারণ পূর্বক নৃত্য করিতেছেন । সপ্তে সকল সম্প্রদায়ের একটা করিয়া ভক্ত আছেন । খোল, করতাল ও শিঙ্গা বাজিতেছে । পরমহংসদেব কেশব বাবুকে তাহা দেখাইয়া দিতেছেন । এই চিত্রখানি প্রস্তুত করিবার দুইটা ভাব ছিল । প্রথম, এই ভাবটা পরমহংসদেবের নিজের সাধনের ফল-স্বরূপ এবং দ্বিতীয়, উহা কেশব বাবু পরমহংসদেবের নিকট হইতে পাইয়াছেন । কেশব বাবুর অন্তরে যাহাই থাকুক, নববিধান ভাবটা যে পরমহংসদেবের ভাবের বিকৃত, তাহা সুরেন্দ্র বাবুও বুঝিয়াছিলেন এবং এই নিমিত্ত ছবিখানি কেশব বাবুকে দেখাইতে পাঠাইয়াছিলেন । কেশব বাবু ছবিখানি দেখিয়া সুরেন্দ্র বাবুকে এই বলিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন, “যাহা হইতে এই ছবির ভাব বাহির হইয়াছে, তিনি ধন্য !” সুরেন্দ্র বাবু এই মর্মে আর একটি যত্ন নির্মাণ করাইয়াছিলেন । ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের চিহ্নবিশেষ যে সকল যন্ত্র আছে, যথা, বৈষ্ণবদের খুন্টি, ব্রীষ্টানদের ক্রস্, মুসলমানদের পঞ্জা ইত্যাদি লইয়া একস্থানে মিলাইয়াছিলেন । কেশব বাবু ঐ যন্ত্রটা লইয়া একবার নগর কীর্তনে বাহির হইয়াছিলেন । সুরেন্দ্র বাবু পরমহংসদেবকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতেন ।

সুরেন্দ্র বাবু একজন নিতান্ত সহজ ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি ইদানীং কহিতেন যে, যে দিন তাঁহাকে প্রথমে পরমহংসদেবের নিকটে গমন করিবার নিমিত্ত তাঁহার বন্ধু প্রস্তাব করেন, সেই দিন তিনি পরমহংস নাম শুনিয়া কহিয়াছিলেন, “দেখ, তোমরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা কর ভালই, আমার কেন আর সে স্থানে লইয়া যাইবে? আমি ‘হংস মধ্যে বকো যথা’ ঢের দেখিয়াছি। তিনি যত্বপি বাজে কথা কহেন, তাহা হইলে আমি তাঁহার কান মলিয়া দি।।” সুরেন্দ্র বাবু শেষে এই কথা কহিয়া রোদন পূর্বক বলিতেন, “অবশেষে তাঁহার নিকটে আমি নাক কাণ মলা পাইয়া আসিলাম।”

বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের ইতিবৃত্ত অতি সুন্দর। তিনি সর্বপ্রথমে ধার্মিক ছিলেন। হিন্দুধর্ম্মে বিশেষ আস্থা ছিল কি না, জানি না, থাকিবার কথা নহে। তিনি কিন্তু সর্বদা আদি ব্রাহ্মসমাজে উপাসনাদিতে যোগ দিতেন। একদা উৎসবের দিন, প্রথমে বেচারাম বাবু এবং পরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পূর্বদেশীয় একজন প্রচারক মন্দিরে উপাসনা কার্যা করিয়াছিলেন। পরদিন কেশব বাবুর বাটীতে বক্তৃতা দি সম্বন্ধে আন্দোলন হইতেছিল। কেশব বাবু কহিলেন, “বেচারাম বাবু কেমন বলিলেন?” একজন উত্তর করিলেন, “আহা! তাঁহার যেমন বলিবার কায়দা, তেমনি শব্দ বিত্বাস করিবার ক্ষমতা!” এই কথা শুনিয়া কেশব বাবু পুনরায় বলিলেন, “বাপ্পাল্টা কেমন বলিল।” গিরিশ বাবু তথায় উপস্থিত ছিলেন: তিনি এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া মৰ্ম্মাঘাত পাইলেন এবং ভাবিলেন, “এ কি! ধর্ম্মের ভিতর এত কপটতা! বাপ্পাল্টা—ইহাদের ভ্রাতৃত্ব কেবল মুখের কথা মাত্র।” এই বলিয়া একেবারে কালাপাহাড়বিশেষ হইয়া দাড়াইলেন। শুনিয়াছি, সাধু দেখিলেই তাহার চিমটে কাড়িয়া লইয়া গ্রহণ করিতেন। বাটীতে দুর্গা ঠাকুর আনা হইয়াছিল, তাহা টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত তিনি ঈশ্বর মানিতেন না। তাঁহার মন হইতে ঈশ্বর শব্দটী দূর করিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন। এই প্রকার প্রবাদ আছে যে, কোন সময়ে বরাকরের সন্নিহিত পঞ্চকুট পাহাড়ের দুর্গম স্থানে পতিত হইয়া ভয়ে ঈশ্বর শব্দটী তাঁহার মুখ হইতে বহির্গত হইয়াছিল। তেজীয়ান্ গিরিশ বাবু আপনাকে দিক্কার দিয়া কহিয়াছিলেন, “কি? ভয়ে ঈশ্বর বলিলাম! কখন বলিব না। যদি কখন প্রেমে বলিতে পারি, তবে তাঁহার নাম গ্রহণ করিব।”

গিরিশ বাবুর চৈতন্য-লীলা যখন অভিনয় হয়, পরমহংসদেব তাহা

দেখিতে গিয়াছিলেন । সেই দিন গিরিশ বাবুর অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইয়াছিল । পরমহংসদেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হওয়ার মধ্যে মধ্যে উভয়েরই যাতায়াত হইত । কিন্তু গিরিশ বাবু যাহাই থাকুন, তিনি যে একজন অতি বিচক্ষণ এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই । তিনি জানিতেন যে, যিনি গুরু, তিনি ব্রহ্মা, তিনি বিষ্ণু এবং তিনিই মহেশ্বর । পরমহংসদেবকে তিনি অসাধারণ ব্যক্তি বলিয়া বুঝিতে পারিয়াও, তাঁহার চিত্ত বোধ হয় পরীক্ষা করিতে চাহিয়াছিল । পরমহংসদেব একদিন থিয়েটারে অভিনয় দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন, অভিনয়ান্তে গিরিশ বাবু, পরমহংসদেবের নিকট আগমন পূর্বক, কথায় কথায় তাঁহাকে এ প্রকার কটু বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন যে, তাহা লেখা পড়ায় প্রকাশ করা যায় না । বরং ভগাই মাধাই কর্তৃক নিত্য-নন্দের কলসীর কাণার আঘাত সহস্র গুণে ভাল ছিল, কিন্তু গিরিশ বাবুর সেই দিনের গালাগালি তুলনা নাই । কারণ একবার প্রহার করিলে তাহার যন্ত্রণা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না, কিন্তু কবির মুখের খেঁড়ু যে কি প্রকার মর্মে মর্মে ঘাইয়া বিদ্ধ হয়, তাহা বর্ণনা করা অপেক্ষা অনুমান করিয়া লওয়া কর্তব্য । এই গালাগালিতে উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া-ছিলেন । কিন্তু পরমহংসদেবের অপূর্ণ মানসিক ভাব দেখিয়া সকলেই মনের আবেগ সঞ্চরণ করিয়াছিলেন । তিনি পূর্বে যেমন হাসিতেছিলেন, এখনও তেমনি হাসিতে লাগিলেন । হাসিতে হাসিতে যথা সময়ে দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া যাইলেন ।

এই সমাচার যখন ভক্তদিগের নিকটে প্রচারিত হইল, সকলেই দুঃখিত হইলেন এবং তাহা না হইবেন কেন ? দোষী ব্যক্তিকে অতিরিক্ত কটু বলিলে লোকের প্রাণে আঘাত লাগিয়া থাকে । সর্বগুণাত্ম্যধারী, নিরপরাধী পরম-হংসদেবের সহিত সে প্রকার ব্যবহার যে নিতান্ত ধর্ম, নীতি এবং লোক-বহির্ভূত কার্য্য বলিয়া ধারণা না হইবে, তাহার হেতু নাই ।

অতঃপর পরমহংসদেব একদিন অগ্নাশ্র ভক্তদিগের সহিত বসিয়া আছেন, এমন সময়ে আমরা যাইয়া উপস্থিত হইলাম । আমরা যাইবামাত্র তিনি কহিলেন, “গিরিশ আমায় গাল দিয়াছে ।” আমরা কহিলাম, “কি করিবেন ?” তিনি পুনরায় কহিলেন, “আমায় যদি মারে ?” আমরা কহিলাম, “মার খাইবেন ।” তিনি কহিলেন, “মার খাইতে হইবে ?” আমরা বলিলাম, “গিরিশের অপরাধ কি ? কালীয় সর্পের বিষে রাধাল বালকগণের মৃত্যু

হইলে, শ্রীকৃষ্ণ কালীয়েয় যথাবিহিত শান্তি প্রদান পূর্বক কহিয়াছিলেন, ‘তুমি কি জন্তু বিষ উদ্বীর্ণ কর?’ কালীয় সাহুনে কহিয়াছিল, ‘প্রভু! যাহাকে অমৃত দিয়াছেন, সে তাহাই দিতে পারে, কিন্তু আমায় ঠাকুর বিষ দিয়াছেন, আমি অমৃত কোথায় পাইব? গিরিশের ভিতরে যাহা ছিল, যে সকল পদার্থ দ্বারা তাহার হৃদয়ভাণ্ডার পরিপূর্ণ ছিল, সেই কালকূটসম বাক্যগুলি ফেলিয়া দিবার আর স্থান কোথায়? উহা যথায় নিক্ষিপ্ত হইত, তথায় বিপরীত কার্য হইত, সন্দেহ নাই। আমাদের বলিলে, হয়ত, এতক্ষণ তাঁহার নামে রাজদ্বারে অভিযোগ করা হইত, এই সকল বুদ্ধি, প্রভু! আপনি নিজে অঞ্জলি পাতিয়া লইয়া আসিয়াছেন।” সাধে কি বলি পতিতপাবন দয়াময়! অমনি তাঁহার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইল, তাঁহার অক্ষিষয়ে জল আসিল এবং তখনই গিরিশের বাটীতে গমন করিবার নিমিত্ত উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কোন কোন ভক্ত সেই দুই প্রহরের সূর্যোজ্জ্বলে তাঁহার ক্রেশ হইবে বলিয়া আপত্তি করিলেন, কিন্তু তিনি তাহা না শুনিয়া সেই দণ্ডে শকটারোহণে গিরিশের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এদিকে গিরিশ তাঁহার নিজ কীর্তি স্মরণ করিয়া আপনাকে আপনি সহস্র লাঞ্ছনা করিতেছিলেন। তিনি কেমন করিয়া ভক্তসমাজে মুখ দেখাইবেন, ভাবিতেছিলেন। সে ভাবনা দূরীকৃত হইল। পরমহংসদেব এমন ভাবে উপদেশ দিতে লাগিলেন এবং ভক্ত সহ হরিনাম সঙ্কীৰ্ত্তন করিলেন যে, গিরিশ বাবুর মনে যে সকল দুঃখ এবং লজ্জা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা পরিষ্কার হইয়া গেল। সেই গিরিশ আজ পরমহংসদেবের পরাক্রমে পরাজিত হইলেন।

গিরিশ বাবুর অণু কোন প্রকার চরিত্র দোষ ছিল কি না, তাহা প্রকাশ নাই, কিন্তু মদে সিদ্ধ ছিলেন, এ কথা বলা বাহুল্য। কেবল মদ কেন, আবগারী মহল তাঁহার ইজারা ছিল বলিলে কি বেশী বলা হইবে? মদ ছাড়াইবার জন্ত কোন ভক্ত পরমহংসদেবের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন, তিনি এই কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, “তোমার এত মাথা ব্যথা কিসের? সে মদ ছাড়ুক, আর নাই ছাড়ুক, যে তাহার কর্তা, সে বুঝিবে। বিশেষতঃ, ওরা শূর ভক্ত, মদে দোষ হইবে না।” ভক্ত আর কি বলিবেন, চুপ করিয়া রহিলেন।

পরমহংসদেব কর্তৃক গিরিশ বাবুর ক্রমে সুখ্যাতি বিস্তার হইতে লাগিল। তিনি এই কথা শুনিয়া বড়ই বিরক্ত হইতেন এবং কহিতেন, “ঠাকুর! কথায়

কিছু হবে না। আমি ঢের কথা জানি, কার্য্য চাই। যে আমি, তাহাই আছি।” এই বলিয়া একদিন সন্ধ্যার পর মদের বোতল খুলিয়া বসিলেন। দুই একজন বন্ধুও জুটিল। তাহারা দুই চারি গ্লাস মদ খাইয়া কাৎ হইয়া পড়িল; কিন্তু গিরিশের সে বিষয়ে মনোযোগের ক্রটি হইল না। বোতলটা নিঃশেষিত হইলে একটী উল্কার উঠিয়া সমুদায় নেশা কমিয়া গেল। দ্বিতীয় বোতল খোলা হইল। তাহাও যথাসময়ে ফুরাইলে নেশা হইল না। পরে তৃতীয় বোতল ঐরূপে যখন নেশার উৎপাদন করিতে অসমর্থ হইল এবং ওদিকে জলে উদরস্থলী ফুলিয়া উঠিল দেখিয়া বিরক্ত হইয়া সেদিন হইতে গিরিশ বাবু আর মদ খাইতেন না। গিরিশ বাবুর একাগ্রতা শক্তি অতিশয় প্রবল। তিনি যাহা করিবেন বলিয়া মনে করেন, তাহা হইতে কেহ তাঁহাকে মতান্তর করিতে পারিত না। কিন্তু কু-সংস্কার বা কু-অভ্যাস কেহ কাহার কথায় পরিত্যাগ করিতে পারে না, পরমহংসদেব তাহা বিলক্ষণ জানিতেন। তন্নিমিত্ত তিনি গিরিশ বাবুকে সুরা সেবন করিতে নিষেধ করেন নাই।

কয়েকদিন পরে জনৈক অভিনেত্রীর পীড়া দেখিতে গিয়া গিরিশ বাবু তথায় ছইসকী সুরা পান করিতে আরম্ভ করেন। সেদিন তাঁহার অপরিমিত পরিমাণে নেশা হওয়ায়, তথায় তাঁহাকে অজ্ঞানাবস্থায় রজনী যাপন করিতে হইয়াছিল। বেঙ্গাবাটীতে রজনী যাপন করা গিরিশ বাবুর জীবনে এই প্রথম ঘটনা। প্রাতঃকালে কিঞ্চিৎ চৈতন্য লাভ করিয়া তাঁহার অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। বারনারীর গৃহে রজনী যাপন হইয়াছে জানিয়া, বড়ই মর্ম্মাহত হইয়া, বাটীতে না গিয়া একখানি গাড়ী ভাড়া করিলেন এবং সঙ্গে এক শিশি মদ লইয়া দক্ষিণেগ্নরে শুভযাত্রা করিলেন। দক্ষিণেগ্নরে পৌঁছিয়া তিনি উর্দ্ধ্বাসে পরমহংসদেবের নিকট চলিয়া গিয়া তাঁহার চরণ দুইটী বক্ষে স্থাপনপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। ‘অন্তর্ধামী’ পরমহংসদেব তাঁহার অন্তরের ভাব বুঝিলেন, কিন্তু তখন কিছু প্রকাশ করিলেন না।

গিরিশ বাবু গৃহে প্রবেশ করিবার পর পরমহংসদেব, অস্ত্র ভক্তের দ্বারা গাড়ী হইতে মদের শিশি ও গিরিশের চাদর এবং জুতা আনাইয়া রাখিয়াছিলেন। গিরিশের ধোতাবারীর সময় উপস্থিত হইলে মনে হইল যে, গাড়ীতে মদ ছিল; গাড়ী তখন চলিয়া গিয়াছে। গিরিশ কি হইবে ভাবিতেছেন, পরমহংসদেব তখন সেই মদ বাহির করিয়া দিতে কহিলেন। গিরিশ আনন্দে তাহা ঢুক্ ঢুক্ করিয়া পান করিতে লাগিলেন। সেদিন জন্মোৎসব বন্ধের

জ্ঞাত তথায় অনেক লোকের সমাগম হইয়াছিল, গিরিশের মদ খাওয়া সকলে দেখিয়া আসিল ।

এই ঘটনায় গিরিশ বাবু লজ্জিত হইয়া মদ খাওয়া এক প্রকার ছাড়িয়া দিয়াছিলেন । সে দিন পরমহংসদেব গিরিশের নিকটে যে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, সেই সত্য-পাশ হইতে উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত, গিরিশের পরিত্রাণের ভার আপনি লইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, “যে কয়েকদিন সংসারে আছি, সে কয়েক দিন শীঘ্র শীঘ্র খেয়ে নে পরে নে”, ইত্যাদি ।

গিরিশ বাবুর ভক্তির তুলনা নাই । পরমহংসদেব তাঁহাকে বীরভক্ত, শূরভক্ত বলিয়া ডাকিতেন । গিরিশকে পাইলে তিনি যে কি আনন্দিত হইতেন, তাহা যাহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিয়াছেন । তিনি বলিতেন যে, গিরিশের জ্ঞায় বুদ্ধিমান ব্যক্তি আর দ্বিতীয় দেখেন নাই । পূর্কো-ল্লিখিত মথুর বাবুর বারো আনা বুদ্ধি ছিল এবং গিরিশের ষোল আনার উপরে চারি ছয় আনা বলিতেন ।

একদিন দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের বাটীতে পরমহংসদেব কতকগুলি ভক্ত সহিত একত্রিত হইয়াছিলেন । তথায় গিরিশ বাবুও উপস্থিত ছিলেন । পরমহংসদেবের ভাবাবেশ হইল । গিরিশ বাবু সেই সময় মনে মনে কি প্রার্থনা করিতেছিলেন, তাহা প্রকাশ নাই ; কিন্তু পরমহংসদেব কিঞ্চিৎ জোর করিয়া কহিলেন, “ও গিরিশ ! ভাব্চ কি ? এর পর তোমাকে দেখিয়া সকলে অবাক হইবে ।” যদিও এইরূপে বার বার গিরিশ বাবুর আকাজক্ষা মিটিতে লাগিল, তাঁহার মনে বোধ হয় তখনও কিছু কিছু সন্দেহ ছিল । কিন্তু তাহা অচিরাৎ দূর হইয়াছিল । একদিন অধরলাল সেনের বাটীতে পরমহংসদেব কয়েকটি ভক্ত সমভিব্যাহারে আগমন করিয়াছিলেন । ইহাদের মধ্যে একজনের নিকট সুরা ছিল । পরমহংসদেব তাহা জ্ঞানিতেন । অধর বাবুর বাটীতে প্রবেশ করিবার সময় সেই ভক্তটি সুরার পাত্রটি গাড়ীর ভিতরে লুকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিল । পরমহংসদেব তাহাকে নিষেধ করেন এবং বলেন যে, গাড়োয়ান ধাইয়া ফেলিবে ; সুতরাং বোতলটি সঙ্গে কার্পড়ের ভিতর লুকান রহিল । সেই দিন তথায় চণ্ডীর গীত হইয়াছিল, তজ্জন্ত অনেকের সমাগম হয় । ইতিমধ্যে সেই বোতলটি সভাস্থলে বাহির হইয়া পড়িল ও সুরার গন্ধে দিক্ পরিব্যাপ্ত হইল । অনেকে কহিল যে, পরমহংসদেবের যে নেশার মত হয়, তাহা এই জ্ঞাত ; লুকিয়ে লুকিয়ে মত্তপান হইয়া থাকে । কেহ বলিল, তিনি

তাত্ত্বিক, তাহাতে দোষ নাই। পরে একটা হলস্থল পড়িয়া গেল। যখন অনেকের জানাজানি হইল, তাহারা সকলে পরীক্ষা করিতে আসিয়া দেখিল যে, মদের লেশমাত্র নাই, উহাতে ডি. গুপ্তের ঔষধের গন্ধ বাহির হইতেছে। এই কথা গিরিশ বাবু ওনিয়া বলিয়াছিলেন যে, এই উনবিংশ শতাব্দীতে এক অদ্ভুত বুজুরুকী হইতেছে। মদের দোষ কি? বেশ ত অমন গুরুর আমরা ঠিক চেলা হইতে পারি। বোতল উৎসর্গ করিয়া গুরুকে খাওয়াইব এবং সকলে প্রসাদ পাইব। এইরূপ চিন্তা করিয়া মদের বোতল খুলিয়া কার্য্য আরম্ভ হইল। দুই চারি ম্যাস সেবনের পর, সেই সুরার বোতলটী ডি. গুপ্তের ঔষধে পরিণত হইয়াছিল। তদনন্তর গিরিশ বাবুর অকপট বিশ্বাস বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অতঃপর তাঁহাকে একদিন পরমহংসদেব কহিলেন যে, “আর কিছু করিতে পার, আর নাই পার, প্রত্যহ একবার ঈশ্বরকে ডাকিও। তুমি বলিবে, তাহা যদি না পারি? একবার না হয় সন্ধ্যার পর একটা প্রণাম করিও। তুমি বলিবে, তাহাও যদি সুবিধা না হয়। ভাল, আমায় বকলুমা দিয়া যাও।” গিরিশ বাবুর মনের আকাঙ্ক্ষা সেইক্ষণ হইতে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আজকাল গিরিশ বাবুকে দেখিলে বাস্তবিক অবাক হইতে হয়। পাঁচ বৎসর পূর্বে গিরিশকে যে ভাবে দেখা গিয়াছে, আজ আর তাঁহাকে তেমন দেখা যাইতেছে না।

গিরিশ বাবুর আর কোন সাধন ভজন নাই। তাঁহার মনে বিলক্ষণ শাস্তি বিরাজ করিতেছে। তিনি এখন যে প্রকার তত্ত্বজানী হইয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত বুদ্ধদেব চরিত, বিধুমঙ্গল, নসিরাম এবং রূপসনাতনাদি গ্রন্থে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। আমরা জানি, এই সকল পুস্তকের দ্বারা অনেকের ধর্ম্মের কপাট উদ্ঘাটন হইয়াছে।

অগ্গান্ত যে সকল ব্যক্তি ভক্ত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের জীবনে বিশেষ বিশেষ ঘটনা আছে, তাহা এখানে সন্নিবেশিত করা দুঃসাধ্য। তাঁহারা প্রত্যেকে ত্রিতাপে জলিয়া পুড়িয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন; পরমহংসদেবের চরণছায়ায় উপবেশন করিয়া সকলেই মুক্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ ।

পরমহংসদেবের অনেকগুলি স্ত্রীলোক ভক্ত ছিলেন । তাঁহাদের কি ভাব ছিল এবং পরমহংসদেব কর্তৃক কি ভাবেই বা তাঁহার পরিবর্তিত হইয়াছিলেন, তাহা কাহারও জ্ঞাত হইবার উপায় নাই । তাঁহারা কেহ সন্ন্যাসিনী এবং কেহ পূর্ববাসিনী । যে সকল স্ত্রীলোক যাইতেন, তাঁহাদের মধ্যে বাবু মনোমোহন মিত্রের জননী সর্বাপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর বলিয়া পরমহংসদেব কহিয়াছিলেন । তিনি যতদিন সধবা ছিলেন, তাঁহার ণায় পতিপরায়ণা স্ত্রী এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে দেখিতে পাওয়া অতি দুর্লভ । বৈধব্য দশায় পতিত হইয়া যে কয়েকদিন জীবিত ছিলেন, তিনি প্রায় পাগলিনীর ণায় দিন যাপন করিতেন । বাম হস্তে লৌহ এবং ললাটে সিন্দূর ত্যাগ ভিন্ন অণ্ড বৈধব্য লক্ষণ তাঁহার বিশেষ কিছু ছিল না, অর্থাৎ তিনি লাল পেড়ে ধুতি পরিধান এবং স্বর্ণ বলয় হস্তে ধারণ করিতেন । আহারে সম্পূর্ণ সন্ন্যাসিনীর ভাব ছিল । তিনি হিন্দু বিধবা হইয়া বালা ও লালপেড়ে ধুতি ব্যবহার করিতেন বলিয়া অনেকে অনেক কথাই কহিত, কিন্তু তিনি সে সকল কথায় কর্ণপাত করিতেন না । একদিন পরমহংসদেবের সমক্ষে অণ্ডা স্ত্রীলোক বসিয়া আছেন, প্রসঙ্গক্রমে স্ত্রীলোকদিগের ধর্ম কর্মের কথা উঠিল । পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন, স্ত্রীজাতিদিগের পতিই একমাত্র ধর্ম, ইহা শাস্ত্রের অভিপ্রায় । পতিতে শাস্ত দাস্তাদি সকল রস আছে । পতি জীবিত অথবা মরিয়া যাইলেও, সে ভাব থাকা উচিত । অনেকে পতির জীবদ্দশার পর শ্রীকৃষ্ণকে পতি জ্ঞান করিয়া থাকে । তিনি তদনন্তর একটী গল্প বলিয়াছিলেন । “কোন রাজমহিষী স্বর্ণালঙ্কার ধারণ করিতেন না, তিনি সধবার ভাব রক্ষার জন্ত রুলি পরিতেন । কত লোকে কত কি বলিত, কিন্তু তিনি আপনার মতের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতেন না । কালসহকারে রাজার মৃত্যু হইল । রাণী তাড়াতাড়ি রুলিগুলি ভাঙ্গিয়া সোনার বালা পরিলেন । লোকে অবাক্ হইয়া রহিল । একদিন একটী প্রতিবাসিনী তাঁহাকে এ প্রকার অলঙ্কার পরিবার হেতু জিজ্ঞাসা করায় তিনি কহিলেন, এত দিন আমার পতি নখর ছিলেন, তাই নখর পদার্থের লক্ষণ রাখিয়াছিলাম । এখন আমার পতি অক্ষয়, অমর এবং অজর, সেই জন্য অক্ষয় সোণার

বালা পরিয়াছি।” পরমহংসদেব কহিতে লাগিলেন, “এঁর বালা পরা সেইরূপ। ভিতরকার ভাব অতি উচ্চ এবং সুন্দর। লোকের কথায় কি কেহ ভাব পরিবর্তন করিতে পারে? যে ভাব পরিবর্তন করিতে পারে, তাহার তখনও প্রাণে সে ভাব হয় নাই বলিতে হইবে।” মনোমোহন বাবুর মাতার উচ্চভাব সত্ত্বে একটি দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইতেছে। তাঁহার তৃতীয় জামাতা পরমহংসদেবের উপাসক হওয়ায় পাড়ার স্ত্রীলোকেরা আক্ষেপ করিত। তিনি এই কথায় বলিতেন, “আমার কি এমন সৌভাগ্য হইবে যে, আমার জামাই সন্ন্যাসী হইয়া সাধু সেবায় জীবন উৎসর্গ করিবে?”

গৌরদাসী (গৌরী মা বলিয়া পরিচিত) নাম্নি আর একটি ব্রাহ্মণের কন্যা পরমহংসদেবের বিশেষ অনুরূপ হইত। পাত্রী ছিলেন। বালিকাবস্থা উত্তীর্ণ হইবার পর হইতেই তাঁহার হৃদয়ে পরমার্থতত্ত্ব বিষয়ের সুক্ষ ভাব সঞ্চারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। তিনি পতি-গৃহে পূজা ও সঙ্কীৰ্ত্তনাদি দ্বারা দিনযাপন করিতেন। বিষয়াসক্ত লবুচেতা ব্যক্তির কে আপন স্ত্রীকে ইচ্ছা করিয়া সন্ন্যাসিনী সাজাইতে চাহেন? তাঁহার প্রতি পতির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পড়িল। তিনি একদিন নিশিথকালে একবস্ত্রে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া দেশ দেশান্তর পরিভ্রমণ পূৰ্ব্বক ত্রিপাট নবদ্বীপে জনৈক বৈষ্ণবের নিকট দীক্ষিত হইয়া গৌরদাসী নাম প্রাপ্ত হইলেন। বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, তিনি বলরাম বাবুর বাটীতে এবং কখন তাঁহাদের রন্দাবনের কুঞ্জে বাস করিতেন। এই সময়ে তিনি পরমহংসদেবের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। তিনি পরমহংসদেবকে গৌরদাসী বলিয়া চিনিলেন। একদিন তাঁহার মনে মনে সাধ হইয়াছিল যে, প্রভু যেরূপে নবদ্বীপে ভক্ত লইয়া ভাবে মাতামাতি করিয়াছিলেন, আমায় সেইরূপ একবার দেখাইলে জীবন ধারণ সার্থক জ্ঞান করি, কিন্তু প্রকাশ করিয়া কিছুই বলেন নাই। অন্তর্ধামী তত্ত্ববৎসল পরমহংসদেব ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিতে কখন বিলম্ব করিতেন না।

একদা কতকগুলি ভক্ত একত্রিত হইলেন। মধ্যাহ্নকালে গৌরীমাতা স্বয়ং অন্নব্যাঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া পরমহংসদেবকে পরিবেশন করিলে পর, ভক্তপ্রবর কেশরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত পরমহংসদেব তাঁহার পরিচয় করিয়া দিলেন। কেশর বাবু তাঁহাকে বিনয় সহকারে মাতৃ সোধোদন পূৰ্ব্বক প্রণাম করিলেন, তিনিও কেশর বাবুকে প্রণাম করিলেন। উভয়ে উভয়কে প্রণাম করনান্তর একবার পরস্পর চারি চক্ষে দেখাদেখি হইল এবং উভয়ের

নয়নধারায় বন্ধঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল । পরমহংসদেব তখন দুই একগ্রাস ভোজন করিয়াছিলেন । তিনি গৌরীমাতা এবং কেদার বাবুর প্রেমাবেশ দেখিয়া আপনি মাতিয়া আহার পরিত্যাগ পূর্বক উঠিয়া দাঁড়াইলেন । অত্যাচ্ছন্ন ভক্তগণ সকলেই একেবারে উন্মত্তপ্রায় হইয়া পড়িলেন । তাবের বগা আসিল । কাহার বন্ধঃস্থলে হু হু করিয়া আনন্দবায়ু উখিত হইয়া উচ্চ হাতের ঘোর ঘটা উপস্থিত করিয়া দিল, কেহ সংজ্ঞাশূন্য হইয়া কাহার গায়ে ঢলিয়া পড়িল, কেহ উন্মাদের ছায় নৃত্য করিতে লাগিল, কেহ নয়ন মুদ্রিয়া গদগদস্বরে “জয় রামকৃষ্ণের জয়” বলিয়া মাতালের ছায় ঢলিতে লাগিল, কেহ এই দেখিয়া শুনিয়া ভয়ে তথা হইতে পলায়ন পূর্বক ধু ধু করিয়া কাঁপিতে লাগিল । গৌরীমাতা প্রেমাবেশে বিচুড়ী প্রসাদ ভক্তদিগের মুখে অর্পণ করিবেন বলিয়া চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না । তাঁহার হাতের অন্ন গাতেই রহিল, তিনি জড়বৎ হইয়া পড়িলেন । চতুর্দিকে লোক দাঁড়াইয়া গেল । সকলেই অবাক্ । কিয়ৎকাল এইরূপে অতিবাহিত হইলে, পরমহংসদেব সকলের বন্ধে হস্তার্পণ করিয়া সহজ ভাবে আনিয়া দিলেন । গৌরী মা অতিশয় ভক্তিপরায়ণা ছিলেন । পরমহংসদেবের ভক্তদিগের প্রতি তাঁহার বাৎসল্যভাব ছিল । তিনি সর্বদা মাল্পো ও অত্যাচ্ছন্ন পক্কান দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া দক্ষিণেঘরে লইয়া যাইতেন । ভক্তেরা উদর পূর্ণ করিয়া সেই সকল মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিতেন ।

যে সময়ে দক্ষিণেঘরে স্ত্রীলোকেরা যাতায়াত আরম্ভ করিলেন, তাহার কিছু দিন পূর্বে ত্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী (পরমহংসদেবের স্ত্রী) সেবা করিবার অভিপ্রায়ে আসিয়াছিলেন । পরমহংসদেব কখন কখন তাঁহাকে নিজ গৃহে প্রবেশ করিতে দিতেন এবং কখন নিষেধ করিতেন । সেই সময়ে মাতা ঠাকুরাণী একদিন পরমহংসদেবকে ভাবাবেশে দেখিয়া মন পরীক্ষার জ্ঞা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “আপনি বলুন দেখি, আমি কে ?” পরমহংসদেব অতিশয় আনন্দিত হইয়া কহিয়াছিলেন, “তুমি আমার আনন্দময়ী মা ।” মাতা সেই কথা শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন, “ও কথা বলিতে নাই ।” পরমহংসদেব কহিলেন, “আমি জানি, একরূপে মা আনন্দময়ী এই দেহ প্রসব করিয়াছেন, একরূপে মা আনন্দময়ী কালীরূপে কালী ধরে আছেন, আর একরূপে মা আনন্দময়ী আমার সেবা করিতেছে ।” মাতার চক্ষে জলধারা বহিয়া পড়িল । তিনি তদবধি আর সে প্রকার কথা মুখে আনেন নাই । তাঁহার নম্র প্রকৃতি ও উদার

স্বভাবের জ্ঞান সকল জ্ঞানীলোকেই বণীভূত ছিলেন। পরমহংসদেবের নিকট সর্বদা জ্ঞানীলোকেরা অগ্রসর হইতে পারিতেন না, তাঁহারা মাতার নিকট আশ্রয় পাইতেন।

আমরা একটা ভৈরবীকে দেখিয়াছি, তিনি কিছুদিন দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া পরমহংসদেবের সহিত নানা প্রকার রঙ্গরসের কথা বলিতেন। তাঁহার হস্তে ত্রিশূল ও ললাটে সিন্দুরের প্রলেপ এবং তিনি গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকিতেন। পরমহংসদেবের সহিত যে সকল কথা কহিতেন, তাহা আমরা এক বিন্দু বিসর্গ বুঝিতে পারি নাই। সহজ বাঙ্গালা কথায় কথা কহিতেন, কিন্তু তাঁহার মাথামুণ্ড স্থির করিতে আমাদের মস্তক বিবর্ণিত হইয়া গিয়াছে। এই ভৈরবী ভিক্ষা করিয়া খাবার আনিয়া পরমহংসদেবকে খাওয়াইতেন।

আর একটা ভক্ত জ্ঞানীলোকের কথা উল্লেখ না করিয়া এ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করিতে পারিলাম না। * পটলডাঙ্গার গোবিন্দ দত্তের কামারহাটীর ঠাকুর-বাড়ীতে একটা প্রাচীণা অত্মাপি আছেন। * তিনি পরমহংসদেবকে বড়ই ভালবাসিতেন। তাঁহার বাৎসল্যভাবপ্রধান প্রকৃতি ছিল। তিনি ভিন্নমিত্ত পরমহংসদেবকে আহ্বার করাইতে ভালবাসিতেন। তত্ত্বকথার বড় একটা এলাকা রাখিতেন না। পরমহংসদেব সম্বন্ধে অতি অল্প কথার তাঁহার নিকট শুনা গিয়াছে। তিনি বলিতেন যে, “পরমহংসদেব একটা শিশুর মত আকার ধারণ পূর্বক হামাগুড়ী দিয়া আমার অঞ্চল ধরিয়া খাবার চায়; না দিলে, আঁচল ছাড়িয়া দেয় না।” ভগবান্ ভক্তের মনোবাঞ্ছা কিরূপে পূর্ণ করিয়া থাকেন, তাহা কাহার সাধ্য, বলিতে পারে? ভক্ত ভগবানের লীলা অতি অপূর্ণ এবং লোকের গবেষণার অতীত বিষয়। যেমন, শ্রী পুরুষের লীলা ভুক্তভোগী না হইয়া অহুমান দ্বারা তাহা কাহারও স্থির নির্ণয় হইতে পারে না ও কখন কখন কালে হইবার নহে, সেইপ্রকার ভক্তবৎসল দয়াময় হরি, ভক্তের প্রাণের কতদূর আকাঙ্ক্ষা কিরূপে পরিপূর্ণ করিয়া থাকেন, তত্ত্বই সে কথা প্রাণে প্রাণে বুঝিতে পারেন। ভক্তির রস ভক্তেই পান করিতে সক্ষম, ভক্তের মহিমা ভক্তেই বুঝিয়া থাকেন, অভক্তের তাহা অধিকার নাই। সেই জ্ঞান, গায়ের জোরে, উচ্চ মস্তিষ্কের উত্তেজনায়, আপনার বিষয়াত্মক বুদ্ধি ও বিচার প্রভাবে ভক্তকাহিনী পর্যালোচনা করিতে যাইলে নিশ্চয় সর্বতোভাবে কু-ফল ফলিয়া থাকে। এই জ্ঞানীলোকটা “গোপালের মা” বলিয়া পরিচিতা ছিলেন।

ইতিপূর্বে আভাসে কথিত হইয়াছে যে, পরমহংসদেবের ভক্তদিগের মধ্যে অনেকেই সন্ন্যাসী তাঁহার নিকটে গমন করিতেন। স্মৃতরাং পরমহংসদেব সেই সকল ভক্তদিগের বাটীতে আসিলে, অন্তঃপুরে বাইরা আহাতি করিতেন। তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত কুটুম্বদিগের মহিলাগণ আসিয়া জুটিতেন। তাঁহাদের মধ্যে সকলকে ভক্তিভক্তি দেখা যাইত না, কিন্তু অনেকেই পরমহংসদেবের কৃপা লাভের জন্য লালায়িত হইতেন। এই রূপে ক্রমশঃ ত্রীলোক সংখ্যাও দিন দিন বাড়িয়া গিয়াছিল। পুরুষদিগের মধ্যে বিষয়ীরা যেমন আত্মাভিমান পরিপূর্ণ, তাঁহাদের বাজারের শাক, মাছ কিম্বা বাটীর চাকর চাকরাণী যেমন খুসীর বিষয়, নিজ নিজ ইচ্ছার সম্পূর্ণ অধীন, তাঁহারা মনে করেন, ধর্মটাও তজ্রপ। ত্রীলোকদিগের মধ্যে এই শ্রেণীর সংখ্যা প্রত্যেক পরিবারে শতকরা অষ্টদশই জনেরও কিছু অধিক হইবার সম্ভাবনা। আমরা দেখিতাম যে, এই ত্রীলোকেরা পরমহংসদেবকে দেখিয়া তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ বিকৃত-নাসোত্তলন-ভঙ্গিতে কহিতেন, “ওমা! ইনি আবার সাধু! জটা নাই, গায়ে ভস্ম নাই, গেরুয়া বসন নাই, একখানা বাঘছাল সঙ্গে নাই, এ কোন্ দিশি সাধু! কালে কালে কতই দেখ্‌বো” এই বলিয়া অভিমানের চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা দেখাইতেন। পরমহংসদেব এমনই সূচত্বর ছিলেন যে, তিনি বাছিয়া বাছিয়া ভক্ত করিতেন। যে বাটীতে উপরোক্ত প্রকার স্বভাববিশিষ্ট ত্রী কিম্বা পুরুষ অধিক থাকিত, তিনি সেই বাটীতে প্রবেশ করিতেন এবং দর্পহারী পরমহংসদেব তাঁহাদের গর্ষ ধর্ম করিয়া ঈশ্বরানুরাগ বুদ্ধি করিয়া দিতেন। যে পুরুষ কিম্বা যে ত্রী আত্মাভিमानে পরমহংসদেবকে প্রগ্রাহ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই আবার তাঁহার জন্য পাগল পাগলিনীপ্রায় হইয়া গিয়াছেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

ক্রমে পরমহংসদেবের একটা রীতিমত সম্প্রদায় হইয়া উঠিল। এই সম্প্রদায় সম্প্রদায় বলিলে যে প্রকার বুঝায়, সে রূপ নহে। সম্প্রদায়ে এক মতে এবং এক ভাবে সকলেই পরিচালিত হইয়া থাকে, কিন্তু পরমহংসদেবের নিকট তাহা ছিল না। পূর্বে স্থানে স্থানে বলা হইয়াছে যে, তাঁহার নিকট সকল সম্প্রদায়ের লোকজন যাতায়াত করিতেন এবং তাঁহারা সকলে পরমহংসদেবকে

তঁাহাদের স্ব স্ব সম্প্রদায়ের সিদ্ধপুরুষ বলিয়া জানিতেন। এই ব্যক্তিগণ সকলে একত্রিত হইলে জনাকীর্ণ হইয়া পড়িত। পরমহংসদেব তঁাহাদের মধ্যস্থলে থাকিলে অপূর্ণ সৌন্দর্য্য দেখাইত। তিনি যাহা উপদেশ দিতেন, কার্য্যে তাহাই দেখাইতে পারিতেন। তিনি বলিতেন, এক ঈশ্বর, ভাব অনন্ত। এ স্থানে সেই ভাবের কার্য্যাই হইত। এই নানাবিধ ভাবের ভক্তেরা কোন কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন নাই। তঁাহারা আপন স্বার্থ চরিতার্থ করিবার জন্য আসিতেন এবং তাহা পূর্ণ হইয়া যাইলে প্রস্থান করিতেন। কার্য্যকারী ভক্তদিগের মধ্যে ভক্তবীর সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, বলরাম বসু, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, হরিশ্চন্দ্র মুক্তফী, দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার, গিরিশ্চন্দ্র ঘোষ, অভুলকৃষ্ণ ঘোষ, মনোমোহন মিত্র, কালিদাস মুখোপাধ্যায়, নবগোপাল ঘোষ, কালীপদ ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ভক্তপ্রার্থী মহাত্মারা সকলে মিলিত হইয়া পরমহংসদেবের আবির্ভাব উপলক্ষে মহোৎসব কার্য্যটি আরম্ভ করিলেন। ভক্তবীর সুরেন্দ্র এই মহোৎসবের প্রস্তাবকর্তা এবং প্রথম বৎসর তিনি নিজ ব্যয়ে তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া সকলের তত্ত্বাভোগ করিয়া দিয়াছিলেন। পর বৎসর হইতে অষ্টম সাধারণ ব্যয়ে আবির্ভাব মহোৎসব সমাধা হইয়া আসিতেছে। জন্মোৎসবের দিন পরমহংসদেবের ভক্ত ও অন্তান্ত যে কোন ব্যক্তি তঁাহাকে শ্রদ্ধা করিতেন, তঁাহাদের প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করা হইত। নিমন্ত্রিত ব্যক্তি ব্যতীত কত রকমের ভক্ত আসিয়া উপস্থিত হইতেন। প্রাতঃকাল হইতে ভক্তদিগের সমাগম আরম্ভ হইত। ত্রৈলোক্য বাবু এবং তঁাহার কর্ম্মচারীরা এ বিষয়ে বিশেষ সহায়তা (না করাই আশ্চর্য্যের বিষয়) করিতেন। যে সকল ব্যক্তির তথায় গমন করিতেন, তঁাহারা এই উপলক্ষ ব্যতীত কখনই কালে সে প্রদেশে যাইতেন কি না সন্দেহ। দশটার পরে পরমহংসদেব স্নানাদি করিতেন, পরে কীর্ত্তন আরম্ভ হইত। এই কীর্ত্তনে যে কি আনন্দ হইত, তাহা বর্ণনা করিবার যদ্যপি প্রভু কর্তৃক কেহ শক্তি লাভ করেন, তিনি ব্যতীত আর কাহার শক্তি নাই; এক্ষেত্রে আমরা তাহা প্রকাশ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিব, যদ্যপি তদ্বারা পাঠক পাঠিকারা তাহার কিঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হইতে পারেন। কীর্ত্তনের রস অক্ষরে (অঁকরে) বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পরমহংসদেব মধ্যে মধ্যে অক্ষর দিয়া গানটিকে মাতাইয়া আপনি মাতিয়া উঠিতেন। তিনি মাতিলে আর কাহার রক্ষা থাকিত না। ভক্তেরাও বিহ্বল হইতেন। এই মাতান

ভাবটীর বাস্তবিক সংক্রামকতাশক্তি ছিল। এক জনের হইলে আর এক জনকে আক্রমণ করিবেই, তাহার সন্দেহ নাই। ফলে, সেই স্থানের উপস্থিত ব্যক্তিরা কাষ্ঠ পুত্তলের স্থায় হই। করিয়া দাড়াইয়া থাকিত। পরমহংসদেবের এ অবস্থায় জ্ঞান থাকিত না, তাহা স্থানান্তরেও বলা গিয়াছে। এই সময় উপস্থিত হইবার দৃষ্ট বিশেষ ভক্তেরা অপেক্ষা করিতেন। সেই সময়ে তাঁহাকে মনের সাধে সাজান হইত। জনৈক স্ত্রীলোক ভক্ত তাঁহার বস্ত্রখানি চাঁপা ফুলের রং করিয়া দিতেন। আহা! সেই বস্ত্র পরিধান করাইয়া দিলে তাঁহার কি অপূর্ণ সৌন্দর্য বাহির হইত! গৌরী মা পুষ্পের মালা ও চন্দন আনিয়া দিতেন। যখন সেই মালা গলদেশে শোভা পাইত, যখন ঋত চন্দনের বিম্ব সকল চরণ এবং ললাটে প্রকাশিত হইত, তখন তাঁহাকে দর্শন করিয়া নয়ন এবং মনের আকাজ্জ্বা মিটিত না। আহা! সে রূপের তুলনা কি আছে? সে রূপ উপমারিহিত। সে রূপে যাহার নয়ন একবার ধাবিত হইয়াছে, সে আর প্রত্যগগমন করিতে পারে নাই। যেন রূপের জালে নয়ন-বিহঙ্গ আবদ্ধ হইয়া পড়িত। সে রূপ দেখিলে, আর অপরূপ বলিয়া জগতে দ্বিতীয় বস্তু স্বীকার করা যায় না। তখন মনে হইত, দেখিবার বস্তু বুঝি এত দিনের পর দেখা গেল। যাহা আমরা দেখি, সুন্দর মনোহর বলিয়া দেখি, তাহা সে রূপের নিকট কি সুন্দর বা মনোহর? তুলনা করিব কি? সে রূপ অরূপময়। চাঁদের তুলনা চাঁদ, সূর্যের তুলনা সূর্য, স্বর্ণের তুলনা স্বর্ণ, তেমনি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সে রূপের তুলনা তাঁহারই রূপ— তাঁহার তুলনা তাঁহারই নিকট। রূপ দেখিয়া মন ভুলিল, আপনাকে আপনি ভুল হইল, সকলে রামকৃষ্ণময় হইয়া পড়িল। জয় ধ্বনিতে দিক্ কম্পিত হইতে লাগিল, প্রাণের উৎসাহহৃৎক ভাব যেন হৃদয় ভেদ করিয়া বহির্গত হইতে লাগিল। কেহ উর্দ্ধবাহ হইয়া, কেহ করতালী দিয়া, কেহ ত্রিভঙ্গ ঠামে এবং লম্বে বক্ষে নৃত্য করিতে লাগিলেন। নৃত্য করিতে করিতে কেহ প্রেমে বিহ্বল হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন, কেহ ভক্তের গায়ে ঢলিয়া পড়িলেন, কেহ আনন্দে অশ্রু বরিষণ করিতে লাগিলেন, কেহ হাসিতে হাসিতে যেন শ্বাস বায়ু পর্য্যন্ত প্রশ্বাস করিয়া ফেলিলেন এবং কেহ শুভিত হইয়া রহিলেন। ক্রমে সকলে অর্ধ মৃতপ্রায় হইয়া আসিলেন। আর বাক্য সরে না, ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাসে কাশি আসিয়া স্বরভঙ্গ করিতে লাগিল, সকলের গলদবর্ষ ছুটিল, খুলির হস্ত ফুলিয়া উঠিল,

সুতরাং সঙ্গীর্ভনের বিরাগ হইল। শান্তি শান্তি প্রশান্তি আসিয়া সকলকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

পরমহংসদেব ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইলেন। অমনি গলার মালা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিলেন, বস্ত্রান্তর্ভাগের দ্বারা ললাটের চন্দন মুছিয়া ফেলিলেন, কিন্তু চরণের চন্দন কখন মুছিতে পারিতেন না। ঠাকুর! ভক্ত-দিগের নিকট আপনার চতুরাঙ্গি চলিতে পারে না। স্বচ্ছন্দে মালা ছিঁড়িলেন, কপালের চন্দন মুছিলেন; এই বার মুছিয়া ফেলুন? অপেক্ষা কিসের? উহাতেও ত রজোগুণের প্রকাশ পাইতেছে; লোক দেখিতে পাইতেছে যে, ভক্তেরা পূজা করিয়াছে—মুছিয়া ফেলুন? বলিয়া রসিক ভক্ত-দিগের মনে ইত্যাকার আনন্দোচ্ছ্বাস হইতে লাগিল। তিনি চরণের চন্দন মুছিতে পারিলেন না! পারিবেন কেন? চরণ তাঁহার নয়, তিনি যাহাকে বাহা দিয়াছেন, তাহাড়ে তাঁহার অধিকার কি? ভক্তেরা চরণ পাইয়াছে, সে চরণ তাহাদের হৃদয়ের ধন, সুতরাং তাহার শোভা বিনষ্ট করিতে পারিলেন না।

তিনি তদনন্তর ভক্তদিগের সহিত একত্রে ভোজন করিয়া অশেষ প্রীতি লাভ করিতেন, কিন্তু এরূপ স্থানে তিনি বর্ণানুরূপ ব্যবস্থা করিতে কহিতেন। যে সকল ভোজ্য সামগ্রী প্রস্তুত হইত, তাহার অগ্রভাগ কেহ পাইত না, অথবা কোন দেবদেবীকে নিবেদন করিয়াও দেওয়া হইত না। সমুদায় দ্রব্যগুলি পরমহংসদেবের গৃহে একত্রিত করিয়া তাঁহাকে দেখান হইত এবং সমস্ত দ্রব্যের অগ্রভাগ তাঁহাকেই প্রদান করা হইত। ভক্তেরা এই প্রকার ভোগের ব্যবস্থা করিতেন।

আজ সে দিন আর নাই! আজ সে রাম নাই, সে অযোধ্যাও নাই! সেই ভক্তগণ আছেন, সেই দক্ষিণেশ্বর, কালীমন্দির ও পঞ্চবটী আছে, সেই আবির্ভাব মহোৎসবও প্রতি বৎসর হইতেছে, কিন্তু সে ভাব কোথায়? সে আনন্দ কোথায়? সে প্রেমের বজ্রা কোথায়? সে সকল ফুরাইয়াছে, এ জীবনের মত ফুরাইয়াছে। আর সে দিন আসিবে না, আর তেমন করিয়া বস্ত্র পরিধান করাইয়া মনের সাধ মিটিবে না! আর সে সচন্দন চরণযুগল দেখিতে পাইব না, আর সে শ্রীমুখের মধুর নাম শ্রবণবিবরে ঢালিয়া মানব জন্ম সার্থক করিতে পাইব না! কালের শ্রোতে সকলই চলিয়া গিয়াছে, কেবল স্মৃতিমাত্র এক্ষণে মৃতপ্রায় দেহকে জীবিত করিয়া রাখিয়াছে।

পরমহংসদেব ধনৌদিগকে বড় পছন্দ করিতেন না, তিনি কাকাল ব্যক্তিদিগের প্রতি নিতান্ত প্রসন্ন ছিলেন। একদা আবির্ভাব মহোৎসবের দিন কোন একটা জীলোক চারিটা রসগোল্লা লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি মাতা-ঠাকুরাণীর নিকট বাইয়া তাহা প্রদান করেন। তথায় অনেকগুলি ভক্ত-স্ত্রী উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা তন্মুখে কহিলেন যে, “বাছা! ঠাকুর এখন ভক্তদিগের সহিত মাতিয়াছেন, কেমন করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইবেন, বিশেষতঃ তাঁহার এখন ভোজন হইয়া গিয়াছে, এখন ত আর কিছু খাইবেন না? খাইলে অসুখ হইবে।” এই কথা ভক্তের প্রাণে যে কি গুরুতর শেলবৎ বিদ্ধ হইয়াছিল, তাহা ভক্ত ব্যতীত কেহ বুঝিতে সক্ষম হইবেন না। তাঁহার চক্ষে জল আসিল এবং মনে হইল, “ঠাকুর! তুমি ত অনাধনাধ! তোমার ভক্তেরা বড়লোক, তাহারা অনেক অর্থ-ব্যয় করিয়া মহোৎসব করিতেছে, তুমি আনন্দ করিতেছ। আমি দীনহীনা কাকালিনী। অনেক ক্ষেত্রে আমি চারিটা পয়সা সংস্থান করিয়াছি। কি করিব আমার শক্তি নাই, আমি বুঝিলাম, তুমি কাকালের ঠাকুর নও।” যিনি তাঁহাকে ডাকিতে জানেন, যিনি হৃদয়তন্ত্রী টানিতে শিখিয়াছেন, যিনি তাঁহার ডাক-নাম শুনিয়াছেন, তাঁহার ডাকের প্রত্যুত্তর না দিয়া পলাইবার উপায় নাই। পরমহংসদেব তৎক্ষণাৎ আসিয়া রসগোল্লা ভক্ষণ করিয়া যাইলেন। হায় প্রভু! আমাদের এমন অভোজন করিলেন কেন? আমাদের আপনার সেই নাম, যে নামে ডাকিলে আপনি শুনিতে পান, আপনি কথা ক’ন, আপনি আসিয়া ভক্ত-প্রদত্ত মিষ্টান্ন ভক্ষণ করেন, তাহা আমাদের দিলেন না! তাহা হইলে, আমরা যখন তখন আপনার সহিত প্রাণ ভরিয়া, আকাজকা মিটাইয়া, কথা কহিয়া লইতাম। কি জানি কেন তাহা দেন নাই। ভাল বুঝিয়াছেন যাহা, তাহাই করিয়াছেন, তাহাতে আর আমাদের বক্তব্য কি থাকিতে পারে?

আর একদিন শশী-নামক একটা কুমার ভক্ত (শশী সাক্ষাৎ হুম্মানের মূর্তি! অমন সেবা, বলিতে কি বোধ হয় স্বয়ং লক্ষ্মীও জানেন না!) পরমহংসদেবের জন্য এক পয়সার বরফ চাদরের প্রান্তভাগে বাঁধিয়া কলিকাতা হইতে দক্ষিণে-দিকে লইয়া গিয়াছিল। এক পয়সার বরফ দুই প্রহরের সূর্য্যোভাপে চাদরের খুঁটে বাধা, প্রায় সাড়ে তিন ক্রোশ পথ, বালক লইয়া গেল! যেমন বরফ প্রায় তেমনি ছিল। পরমহংসদেব সেই বরফ পাইয়া অপরিমিত আনন্দিত হইয়াছিলেন। ভগবান্ ভক্তের বাসনা এইরূপে রক্ষা করিয়া থাকেন।

আর একদিন বাবু কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, বরদাকান্ত শিরোমণি ও অপর দুই একটা ভক্ত একত্রিত হইয়া উদ্ভানে ভোজনের নিমিত্ত পঞ্চবটীর নিম্নে অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিতেছিলেন। ভক্তেরা নিতান্ত স্বার্থপর জাতি, আপনাদের উদ্দেশ্য সাধন হইলেই হইল। যাহার নিকট যাইয়া বর্ণায়মান সংসার-কুলাল-চক্রের বিভীষিকা হইতে অব্যাহতি পাইলেন, যাহার রূপায় কালের বিকট দর্শনাঘাত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন, তাঁহার সমক্ষে অন্ন প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ করিবেন বলিয়া স্থির নিশ্চয় করিলেন, কিন্তু সেই মহা-পুরুষকে তাহা প্রদান করিয়া প্রসাদ ভক্ষণ করিতে হইবে, এ বুদ্ধি কাহারও ঘটে আইসে নাই। তাই ত বলি, এমন অবস্থা না হইলে রামকৃষ্ণের জন্ম হইবে কেন? পরমহংসদেব রানাদি করিয়া পঞ্চবটীতে যাইবামাত্র সকলে সসব্যস্ত হইলেন। তিনি প্রথমে কি কি পাক হইয়াছে সংবাদ লইলেন। পরে খিচুড়ির কথা শুনিয়া বলিলেন, “তাইত, বড় গরম, আমায় তোমরা অন্ন প্রস্তুত করিয়া দাও, আহার করিব।” লজ্জায় সকলের মাথা হেঁট হইল, কাছার মুখে আর কথা নাই। সকলে চতুর্দিক ধুময় দেখিলেন। পরমহংসদেব কহিলেন, “দেখ, আমার ঘরে যে সন্দেশের হাঁড়ি আছে, তাহাতে ভাত রাখিতে পার?” ভক্তদিগের নিকটে চাউল ছিল, কিন্তু হাঁড়ি ছিল না, তাই তাঁহারা চিন্তা করিতেছিলেন। অমনি কোন ভক্ত সেই হাঁড়ি আনিয়া দিলেন এবং শিরোমণি মহাশয় অন্ন প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। কি বিভ্রাট! সে হাঁড়িতে সন্দেশ ও চিনি থাকিত, তাহাতে অগ্নির সংস্পর্শ হইবামাত্র অমনি ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল এবং ফৌস্ ফৌস্ শব্দ হইতে লাগিল। “যেমন কর্ম তেমন ফল। আজ বিষম পরীক্ষার দিন। যদি প্রভুর আহার না হয়, আজ বুঝিব যে, আমাদের অন্ন চিরদিনের মত উঠিয়াছে। সম্মুখে ভাগিরথী, মা দেখিও! যদি প্রভুর অন্ন ভোজন না হয়, তাহা হইলে এ মুখ যেন, লোকালয়ে আর না দেখাইতে হয়। মাগো! তুমি এই পাপিষ্ঠদিগের জন্ত একটু স্থান দিও মা!” বলিয়া কথকের মনে মনে বিকার হইতে লাগিল। যতই ফৌস্ ফৌস্ শব্দ হইতে লাগিল, কথকের শরীর হইতে যেন একসের পরিমাণে শোণিত বহির্গত হইয়া যাইতেছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে ভাত ফুটিতে আরম্ভ হইল। বেলাও তখন প্রায় দুই প্রহর। একে হাওয়ার উত্তনের তাপ বাহির হইয়া যাইতেছে, তাহাতে হাঁড়ির জল বাহির হইয়া ফৌস্ ফৌস্ করিতেছে, তাহাতে আবার পরমহংসদেবের আহারের সময় অতীত হইয়া যাইতেছে, কি হইবে ভাবিয়া

কথকের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইল । শিরোমণির কথকতার ব্যবসা আছে । তিনি ভাবিলেন, “হায় ! ঠাকুর ! এমন করিয়া আমায় শাস্তি না দিয়া পূৰ্ণ হইতে বিদায় করিয়া দিয়া কথকদিগের জায় মূর্তিমান্ কলির রূপবিশেষ করিয়া রাখিলে আমার সহস্র গুণে ভাল হইত । আমি অপবিত্র, হরিনামব্যবসায়ী, আপনি ছেনে শুনে কেন এ কলঙ্কসাগরে নিমগ্ন করিলেন । আমার কলঙ্ক হউক, তাহাতে আমি ভীত নহি । কলঙ্কের পসরা যখন মস্তকে লইয়াছি, তখন কলঙ্কে অন্ন ভয় কি ? কিন্তু আমা কর্তৃক যে আজ আপনার আহার হইল না, এই মনস্তাপ যে আর রাখিবার স্থান নাই । কলঙ্কভঞ্জন হরি ! লজ্জানিবারণ মধুসূদন ! আজ রক্ষা কর—এই বিপদ-সাগর থেকে উদ্ধার কর ।” এইরূপে সকলেই বিমর্ষ হইয়া এক দৃষ্টিতে অন্নের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া অপেক্ষা করিতেছেন ।

পরমহংসদেব কহিলেন, “ভাত হইয়াছে কি ?” “সৰ্ব্বনাশ উপস্থিত ! অরে বজ্র ! তুই এখন কোথায় ? মস্তকে পতিত হইয়া আমাদের, অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিয়া দে, যেন আর একেবারে উত্তর দিবার শক্তি না থাকে ।” আবার বলিলেন, “এত দেরি হ’লে কেন ?” “প্রভু ! আর না—আর এই ক্ষুদ্র আহার আপনার তাড়না সহ করিতে পারে না । আমরা ত দোষ করিয়াছি । প্রভু ! আমরা নির্দোষী ছিলাম কবে যে, আজ আমাদের পরীক্ষা করিতেছেন ? ক্ষমা করুন, যাহা হয় একটা করিয়া দিন, আমরা নিশ্চিন্ত হই ।” এই বলিয়া তখন সকলে হতাশ হইয়া পড়িলেন । তিনি আবার কহিলেন, “এতক্ষণে হয় ত হইয়াছে ।” এই কথায় ভক্তদিগের প্রাণ উড়িয়া গেল । শিরোমণি কি করিবে কাঁপিতে কাঁপিতে একটা অন্ন টিপিয়া দেখিলেন যে, অন্নগুলি সুসিদ্ধ হইয়াছে । তিনি অতি সাবধানে হাঁড়ি হইতে যখন পাত্রোত্তরে অন্নগুলি ঢালিলেন, হাঁড়িটার তলা ফুটিফাটার জায় চারি-চির হইয়া গিয়াছে । তদ্বারা সমুদায় জল নির্গত হইয়া যাওয়ায়, অন্নগুলি যেন শোলায় জায় লঘু বলিয়া দৃষ্ট হইল ।

পরমহংসদেবের আনন্দের সীমা রহিল না । শিরোমণিকে কহিতে লাগিলেন, “তোমার আক্লত ভক্তিতে এই ভাঙ্গা হাঁড়িতে রাখিতে পারিয়াছে ; তাহা না হইলে কখনই হইত না ।” শিরোমণি মনে করিলেন, আর কথায় কাজ নাই, আক্লত ভক্তি থাকে থাকুক, আর না থাকে নাই থাকুক, কিন্তু এমন পরীক্ষায় আর কখন ফেলিবেন না । আমাদের যদি পরীক্ষা দিবার শক্তি থাকিত, তাহা হইলে আপনি কি জল আসিয়াছেন ? যাহারা পরীক্ষা দিতে পারে, তাহারা ত আপন জোরে চলিয়া যায় । শক্তিবিশীন আমরা

আপনার শরণাগত, এই বুঝিয়াছি। আশীর্বাদ করুন, যেন এই বুদ্ধি দৃঢ় হইয়া যায়।

পরমহংসদেব এইরূপে দক্ষিণেধরে বসিয়া নানাবিধ ভক্ত * লইয়া বিহার করিতেছিলেন। আনন্দের আর অবধি ছিল না। নিত্য নব নব ভাব, নব নব রস ও নব নব উপদেশে মন প্রাণ দেহ যেন পুলকে আর্দ্র হইয়া থাকিত। তখন প্রত্যেক ভক্তের মনে যে কি অপার আনন্দ নিরবচ্ছিন্নভাবে অবস্থিতি করিত, তাহা এখন স্মরণ করিলে স্বপ্নবৎ জ্ঞান হইয়া থাকে। তখন সমস্ত দিন কিরূপে যে অতিবাহিত হইয়া যাইত, তাহা বুঝা যাইত না। প্রত্যেক রবিবারে এবং ছুটীর দিন লোকে লোকারণ্য হইত। পরমহংসদেব সকলকে মাতাইয়া তুলিতেন। এতদ্বিত্ত পরমহংসদেবকে নিভুতে পাইয়া ছোটো প্রাণের কথা কহিতে অনেকেই অবসর অবশেষ করিতেন। তাঁহারা অন্ত বারে আসিয়া কার্য সাধন করিয়া যাইতেন। এমক সময়ে একদিন সন্ধ্যার সময় পরমহংসদেব ভাবাবেশে বলিয়াছিলেন, “এখান হে আসিবে, কেমন করিয়া ঈশ্বর দর্শন ও জ্ঞান ভক্তি পাইব বলিয়া যে আসিবে, তাহারই মনোরথ পূর্ণ হইবে।”

একদিন অপরাহ্নে আমরা তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত গমন করিয়াছিলাম। পরমহংসদেব একাকী বসিয়াছিলেন, প্রণাম করিয়া আমরা উপবেশন করিলে, তিনি কহিলেন, “দেখ আমি মা’কে কহিতেছিলাম যে, আর আমি লোকের সহিত কথা কহিতে পারি না। গিরিশ, বিজয়, কেদার, মহেন্দ্র এবং —(আর একটা শিষ্যের নাম + উল্লেখ করিয়া), এদের একটু শক্তি দে। ইহারা উপদেশ দিয়া প্রস্তুত করিবে, আমি একবার স্পর্শ করিয়া দিব।” আমরা আশ্চর্য হইয়া রহিলাম। তখন আমরা তাঁহার এপ্রকার কথার তাৎপর্য

* একথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, যদিও সকল মতের ব্যক্তির তাঁহার নিকট উপদেশাদি লইতেন, কিন্তু ইহাদের সহিত পরমহংসদেবের মোটের উপর জীবিত ভাব দেখা যাইত। এক শ্রেণীর ব্যক্তির পরমহংসদেবকে গুরু এবং ঈশ্বর বলিতেন। পরমহংসদেব ইহাদের অনেকেই পদিত্রাণের জন্য বকদ্দমা লইয়াছেন বা নিজে দায়ী হইয়াছেন। এই ভক্তদিগকে আমরা বিশেষ ভক্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। দ্বিতীয় শ্রেণীর ভক্তেরা পরমহংসদেব হইতে কোন প্রকার প্রাচীন মতের দীক্ষা লইয়াছেন। এই নিমিত্ত তাঁহার সহিত গুরু শিষ্য সম্বন্ধ মাত্র। তৃতীয় শ্রেণীর ভক্তেরা অপর (যথা কুলগুরু ইত্যাদি) কর্তৃক দীক্ষিত হইয়া আপন অভীষ্ট পুরণের নিমিত্ত পরমহংসদেবের সহায়তা লইয়াছেন, তাঁহাদের সহিত পরমহংসদেবের উপগুরু সম্বন্ধ।

† রাম—গ্রন্থকার শেবক রামচন্দ্র।

কিছুই বুঝিতে পারিলাম না । তিনি যে আমাদের অকূলে নিষ্কেপ করিয়া গলাইবার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন, তাহা কে জানিত ?

ইহার কিছু দিন পরে তিনি গলদেশে বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন । প্রথম কয়েক দিন সে বিষয়ে কিছুই মনোযোগ করা হইল না । ক্রমে বেদনা বৃদ্ধি হওয়ায় গলাধঃকরণ করা অতিশয় ক্লেশকর হইয়া পড়িল । কঠিন দ্রব্য আহার করিতে অপারক হইলেন এবং তরল পদার্থ দ্বারা জীবন রক্ষা করিতে লাগিলেন । এই বেদনা ক্রমে গণ্ডমালায় পরিণত হইল । ইহাদের মধ্যে একটি বিচি ফ্রীত ও প্রদাহযুক্ত হইয়া পাকিয়া উঠিল এবং গলনালিতে ফাটিয়া উহা হইতে পুঞ্জ নির্গত হইতে লাগিল । চিকিৎসার নিমিত্ত প্রথমে ডাক্তার রাখালদাস ঘোষ কিয়দ্দিবস যাতায়াত করিয়াছিলেন । তিনি অক্লতকাৰ্য্য হইলে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার দীর্ঘকাল চিকিৎসা করিয়া বিশেষরূপে উপকার করিতে পারিলেন না । রোগের বৃদ্ধি এবং তাঁহার শারীরিক দৌর্বল্য হওয়ায় ভক্তেরা বড়ই চিন্তিত হইলেন । তাঁহার শরীর দুর্বল হইতেছিল, তথাপি কীৰ্ত্তন করা অথবা উপদেশাদি দেওয়া একদিনও বন্ধ করেন নাই । যে দিন অতিশয় মাতামাতি হইত, সেইদিন রোগের যন্ত্রণাও অত্যন্ত বৃদ্ধি হইত, তজ্জগৎ অশেষ প্রকার ক্লেশ পাইতেন । কিন্তু পরক্ষণেই তাহা ভুলিয়া গিয়া পূর্বের স্থায় আনন্দ করিতেন ।

যত দিন ঘাইতে লাগিল, ব্যাধিও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া, তাঁহার শরীর একেবারে যারপরনাই অসুস্থ হইয়া আসিল । সময়ে সময়ে এত অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব হইত যে, পর দিবস অতি ক্লেশে শয্যা ত্যাগ করিতেন । কিছুতেই ব্যাধির উপশম না হওয়ায় আমরা কালীপদ, গিরিশ ও দেবেশ্বরের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলাম যে, একজন বচদর্শী ইংরাজ-ডাক্তারের দ্বারা ব্যাধি নিরূপণ করা কর্তব্য । এই স্থিষ্টি করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে আমরা দক্ষিণেশ্বরে গমন করিয়া দেখিলাম যে, পরমহংসদেব অতি বিষন্নভাবে একাকী বসিয়া আছেন । সেদিনকার স্থায় অমন হৃদয়বিদারক ভাব ইতিপূর্বে কখনও দেখা যায় নাই । আমরা আনন্দময়ের বিরস বদন দেখিয়া চতুর্দিক শূন্য বোধ করিলাম । কি বলিয়া সম্ভাষণ করিব, তাবিয়া অস্থির হইলাম । চলিত সামাজিক কথা, “কেমন আছেন,” তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বলিতে পারিলাম না । কিন্তু তিনি আপনি কহিলেন, গতকল্য প্রায় এক পোয়া রক্ত উঠিয়াছিল । সে সময়টী শ্রাবণ মাসের শেষ, সর্বদাই বৃষ্টি হইতেছিল এবং

গঙ্গার জল বৃদ্ধি হওয়ায় বাগানের উপরেও জল উঠিয়াছিল। তাঁহার একে গল-
নালীর পীড়া, তাহাতে অমন বধা, একতলা আর্দ্র স্থান, তাঁহার পক্ষে নিতান্ত
অস্বাস্থ্যকর জ্ঞান করিয়া আমরা নিতান্ত কাতর হইয়া বলিলাম, “যত্নপি অসু-
মতি করেন, তাহা হইলে একটা কথা বলি।” তিনি মন্তক নাড়িয়া আদেশ
করিলেন। আমরা কহিলাম য়ে, “দিন কতক কলিকাতায় যাইয়া যত্নপি অব-
স্থিতি করেন, তাহা হইলে ইংরাজ ডাক্তার দ্বারা আপনার চিকিৎসা করান যায়।
এরূপ প্রকারে আর সময় নষ্ট করা উচিত হইতেছে না বলিয়া বোধ হইতেছে।
হায়! কি অন্ততক্ষেণেই সেই কথা আমাদের মুখ হইতে বাহির হইয়াছিল।
আমরা যদি তাহা না বলিতাম, হয় ত তাঁহার দক্ষিণেশ্বর পরিত্যাগ করা হইত
না। আমরা অগ্র পশ্চাৎ না বুঝিয়া মনের আবেগে একটা কথা বাহির করিয়া
পরিণামে এত যন্ত্রণা, এত মর্শ্মাঘাত পাইতেছি এবং যন্ত্রণা পাইয়াও তাহার
বিরাম হইতেছে না। অথবা কি বলিতে কি বলিয়াছি, ইহা তাঁহার ইচ্ছা।
তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত তাঁহার আসন পরিবর্তন করা কি একজন ভৃত্যের কর্ম ?
কখন নহে। এ প্রস্তাবে তিনি মহা আনন্দিত হইয়া বাগবাজার এবং গঙ্গার
সন্নিহিত একটা বাড়ী ভাড়া লইবার জন্ত আঞ্জা দিলেন এবং তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র
রামলালকে ডাকাইয়া তখন পঞ্জিকা দেখিতে বলিলেন। শনিবার বেলা
তিনটার পর দিন স্থির হইল। সে দিন বৃহস্পতিবার, সূত্ররাং মধ্যে একটা
দিন রহিল। আমরা তৎক্ষণাৎ তথা হইতে কলিকাতাভিমুখে প্রত্যাগমন
করিয়া বাগবাজারের রাজার ঘাটের পূর্ব গলির ভিতরে একটা নূতন দ্বিতল
বাড়ী ভাড়া লইলাম। পরমহংসদেব শনিবার প্রাতঃকালেই কলিকাতায়
আসিয়া পৌঁছিলেন। তিনি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে গমন পূর্বক কহিয়াছিলেন,
“আমাকে কি এরা গঙ্গাষাত্রা করিয়াছে? এ বাটীতে আমি থাকিতে পারি
না।” কি কারণে তিনি যে এ কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আমরা জানি না।
তিনি তখনই বলরাম বাবুর বাটীতে আসিয়া অবস্থিতি করিলেন।

পরমহংসদেব কলিকাতায় আসিয়াছেন, এই কথা প্রচার হইয়া গেল।
তাহাতে লোকের সমাগম ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। বলরাম বাবুর বাটী
যেন উৎসবক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইল। এখানে আসিয়া তিনি ইংরাজ ডাক্তার
দেখাইতে আপত্তি করিলেন; সূত্ররাং প্রতাপ বাবুই ঔষধ বিধান করিতে
লাগিলেন। পরমহংসদেবের শরীর বালকের অপেক্ষাও দুর্বল ছিল, তন্নিমিত্ত
হোমিওপ্যাথিক একটা দানা সেবন করিলেও তাঁহার শরীর বিকৃত হইয়া

মাইত। প্রতাপ বাবুকে বিশেষ সাবধানে ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হইত। বলরাম বাবুর বাটীতে এক পক্ষের অধিক বাস করিবার সুবিধা হইল না। তিনি তন্নিবন্ধন গ্রামপুকুরের শিবু ভট্টাচার্য্যের বাটীতে আসন পরিবর্তন করিয়াছিলেন। এই স্থানে আসিয়া রোগ কিঞ্চিৎ দৃষ্টি হইল। প্রতাপ বাবুর অনুরোধে, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়কে আনয়ন করিবার জন্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়কে প্রেরণ করা হয়। ডাক্তার সরকার পরমহংসদেবকে মথুর বাবুর সময় হইতে জানিতেন এবং এই ব্যাধির চিকিৎসার জন্ত একদা তাঁহার শাখারিটোলার বাটীতে পরমহংসদেবকে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। ডাক্তার সরকারকে প্রতাপ বাবু পরামর্শের জন্ত আনাইয়াছেন, এই ভাবেই ডাকা হয় এবং তাঁহার ষোল টাকা দর্শনীও সংস্থান করিয়া রাখা হইয়াছিল। পরমহংসদেবকে দেখিয়া ডাক্তার সরকার কহিলেন, “তুমি যে এখানে?” চিকিৎসার জন্ত এরা এখানে আনিয়াছে বলিয়া, পরমহংসদেব উত্তর করিলেন। ডাক্তার সরকার পূর্বেই তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন। এবারেও অতি বহু সহকারে লক্ষণাদি দ্বারা রোগ নিরূপণ করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিলেন। তাঁহাকে সেই সময় দর্শনীর টাকা দেওয়া হইল। তিনি টাকা না লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ বাটী কাহার?” মহেন্দ্র বাবু কহিলেন, “পরমহংসদেবের ভক্তেরা ভাড়া লইয়াছে।” ডাক্তার সরকার ভক্তের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন এবং বলিলেন, “ওঁর আবার ভক্ত কি?” ডাক্তার সরকার তখনও পর্য্যন্ত জানিতেন যে, ইনি মথুর বাবুর পরমহংস অর্থাৎ বড়লোকের নানাপ্রকার সখের জিনিস থাকে, মথুর বাবুর পরমহংসও সেই ভাবে বলা হইয়াছিল। কিন্তু অল্প তিনি নূতন কথা শুনিলেন। মথুর বাবুর পরমহংস আর এক্ষণে এক স্থানে সীমাবদ্ধ নহেন। অতঃপর তিনি অতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ভক্তদিগের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। গুপ্ত মহাশয়ও তাহা ব্যক্ত করিলেন। ডাক্তার সরকারের পূর্ণ সংস্কার দূরীভূত হইয়া আরও উৎসাহবদ্ধ হইয়া গেল। তিনি যদিও একজন ঈশ্বর বিশ্বাসী ব্যক্তি বটেন, কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রাদি ও দেবদেবী এবং সাধু মহাত্মাদিগের অদ্বুত শক্তি আদৌ বিশ্বাস করিতেন না এবং বোধ হয় আজও করেন না। বর্তমান শতাব্দীর যে প্রকার পরিমার্জিত ধর্ম্মভাব অর্থাৎ জীবের হিতসাধন করা, তাহা ডাক্তার সরকারের ধারণা ছিল এবং আছে। সে যাহা হউক, তিনি গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি ব্যক্তিদিগের নাম শুনিয়া বাস্তবিক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। পরমহংসদেব

কর্তৃক গিরিশ প্রভৃতির পরিবর্তন হইয়াছে শুনিয়া, যারপরনাই বিমোহিত হইয়া কহিলেন, “ইহা অপেক্ষা হিতসাধন আর কি হইতে পারে ? একটা ব্যক্তিকে কুপহ হইতে সুপথে আনিতে পারিলে, একজনের দায়িত্ব দূর হইতে পারে। পরমহংসদেব সাধারণের হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি। অতএব আমি টাকা লইব না।” মহেন্দ্র বাবু বিশেষ অনুরোধ করিয়া বলিলেন, “পরমহংসদেবের ভক্তেরা ধনী না হইলেও কেহ অক্ষম নহেন। তাঁহারা অর্থব্যয় করিবার জ্ঞানই তাঁহাকে কলিকাতায় আনিয়াছেন। আপনি সে জ্ঞান কিছু মনে না করিয়া টাকা গ্রহণ করুন।” ডাক্তার সরকার হাসিয়া কহিলেন, “আমাকে সেই পাঁচজনের মধ্যে পরিগণিত করিয়া লউন। আমি বিশেষ যত্ন পূর্বক চিকিৎসা করিব। যতবার প্রয়োজন হইবে, আমি আপনি আসিব। আপনারা মনে করিবেন না যে, আপনাদের সম্বন্ধ করিতে আসিব, আমার নিজের প্রয়োজন আছে, জানিবেন।” পরদিন ডাক্তার সরকার সন্ধ্যার সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেদিন তথায় লোকারণ্য হইয়াছিল এবং গিরিশ বাবু প্রভৃতি যাবতীয় ভক্তগণও উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তার সরকারের সহিত গিরিশ বাবুর পরিচয় হইল এবং নানাবিধ বিচারাদি হইতে লাগিল। গিরিশ বাবু এবং অন্যান্য ভক্তদিগের সহিত আলাপ করিয়া ডাক্তার সরকার যথেষ্ট আনন্দিত হইয়াছিলেন। সেদিন ডাক্তার সরকার প্রায় দুই তিন ঘণ্টা তথায় বসিয়াছিলেন।

ডাক্তার সরকার প্রত্যহ দুই প্রহরের পর পরমহংসদেবকে দেখিতে আসিতেন। ব্যাধি সম্বন্ধে কথা কহিয়া ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন এবং গিরিশ বাবুর সহিত নানাবিধ তর্ক বিতর্ক করিয়া কোন দিন সন্ধ্যার পর চলিয়া যাইতেন। এই বিচারের সারাংশ এই স্থানে প্রদত্ত হইতেছে।

ডাক্তার সরকারের মত এই যে, মনুষ্য গুরু হইতে পারে না ; কেহ কাহার চরণ ধূলি লইতে পারে না ; ভাব, সমাধি, মস্তিস্কের বিকার ; সাকার রূপাদি বা অবতার কখন হইতে পারে না এবং ঈশ্বর অসীম, তিনি কদাচ সীমাবিশিষ্ট নহেন। ইত্যাকার গুরুতর বিষয়গুলি লইয়া বিচার হইয়াছিল। যেদিন এই সকল কথা হইল, তাহার পরদিন সন্ধ্যার সময় ডাক্তার সরকার প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত ছিলেন। এমন সময়ে ভাবের কথা উঠিল। ভাব অর্থে ঈশ্বরের নামে যে অচেতনাবস্থা উপস্থিত হয়, আবার সেই নামে যাহা বিদূরিত হইয়া থাকে। ডাক্তার সরকার এপ্রকার ভাব কখন দেখেন নাই। বলিতে বলিতে

একজন অচৈতন্য হইলেন। ডাক্তার সরকার তাহাকে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছেন, এমন সময় আর একটা ভক্ত ঢলিয়া পড়িলেন। তাঁহাকে দেখিতেছেন, তৃতীয় ব্যক্তির ভাব হইল। এইরূপে এক সময়ে কয়েকটা ব্যক্তি ভাবাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। ডাক্তার সরকার বিমুগ্ধ হইয়া কোন কারণ নির্দেশ করিতে পারিলেন না। ঐশ্বরিক শক্তির রত্নান্ত নৈসর্গিক তদ্ব্যপেক্ষি পাওয়া যাইত, তাহা হইলে ভাবনা কি থাকিত? যাহা হউক, ডাক্তার সরকার বোধ হয় সে ঘটনার কিছুই বুঝিতে পারেন নাই।

চরণধূলি গ্রহণ করা সম্বন্ধে গিরিশ বাবুর সহিত তাঁহার নানাবিধ তর্ক বিতর্ক হইয়াছিল। সে তর্কে ডাক্তার সরকার এতদূর উৎসাহিত হইয়াছিলেন যে, তিনি পরমহংসদেবের চরণধূলি লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পরমহংসদেবের প্রতি ডাক্তার সরকারের দিন দিন শ্রদ্ধা ও ভক্তি বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং একদিন বলিয়াছিলেন যে, “এতদিনের পর আমি হৃদয়গ্রাহী বন্ধু পাইয়াছি।” আর একটা ভক্তের সহিত ডাক্তার সরকারের অনন্ত এবং খণ্ড সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিচার হইয়াছিল। ভক্ত কহিয়াছিলেন, “পৃথিবীতে কোন্ বস্তু খণ্ড বা সীমাবিশিষ্ট এবং কোন্ বস্তু অখণ্ড বা অসীম, তাহা স্থির করা যায় না। একটা বালুকা কণা—মূল দৃষ্টিতে খণ্ড পদার্থ বলা যায় বটে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই অবস্থাটা উহার স্বভাবসিদ্ধ নহে। ভূবায়ুর গুরুত্ব এবং উত্তাপের ভারতম্যে পদার্থেরা রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। বিশেষতঃ, বালুকাকণা যাহা আমাদের দৃষ্টিতে খণ্ড বলিয়া বোধ হইতেছে, উহা অণুবীক্ষণে প্রকাণ্ড দেখাইবে। বালুকাকণা একটা পদার্থ নহে, উহা দ্বিবিধ পদার্থের সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপ পদার্থদিগের পরমাণুরাই সংযোগ ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে। পরমাণু কণাটাও আত্মমানিক এবং অবস্থার কণা। বস্তুতঃ, পরমাণুর আয়তন কি, কেহ বলিতে পারেন না এবং বলিবারও অবিকার নাই। যতপি পরমাণুর স্থির না হয়, তাহা হইলে তাহার সমষ্টি লইয়া বাক্যবিতণ্ডা করা কর্তব্য নহে। ফলে, সকল বস্তুই অসীম বলিতে হইবে।” ডাক্তার সরকার কোন উত্তর দেন নাই।

একদিন পরমহংসদেব ডাক্তার সরকারের পুত্রটিকে দেখিতে চাহিয়াছিলেন। ডাক্তার সরকার পরদিন তাহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া গিয়াছিলেন। পুত্রটী যাইবামাত্র পরমহংসদেব তাহার হস্তধারণ পূর্বক স্বতন্ত্র গৃহমধ্যে প্রবেশ

করিয়। কহিয়াছিলেন, “বাবা! আমি তোমার জ্ঞান এখানে আসিয়াছি।” এই বলিয়া তাহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন ।

শ্রামপুকুরে অবস্থানকালীন ডাক্তার সরকার ব্যতীত অত্যাশ্চর্য্য কয়েকজন ডাক্তার এবং কয়েকটি কবিরাজ তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু কাহারও দ্বারা রোগের উপশম হইল না। কখন দশ দিন ভাল থাকিতেন এবং কখন রোগ এত অধিক বাড়িয়া উঠিত যে, তাঁহার দেহের সুস্থতা বিষয়ে আর কোন আশা ভরসা থাকিত না। এই স্থানে তাঁহার সেবা করিবার নিমিত্ত কয়েকটি ভক্ত এবং একটি ব্রাহ্মণ কন্যা আসিয়া জুটিয়াছিলেন। এই স্ত্রীলোকটি ভক্তিমতী বটে, কিন্তু তাঁহার কিঞ্চিৎ তমোগুণাধিক্য-বশতঃ সেবাকার্য্যে বিশেষ ক্রটি হইতে আরম্ভ হইল। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী এ পর্য্যন্ত দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন। আমরা পরমহংসদেবের চরণ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বৃত্ত করিয়া মাতামাঠাকুরাণীকে শ্রামপুকুরের বাটীতে আনয়ন করিয়াছিলাম।

পরমহংসদেব সর্ব্বদাই ভক্তগণ বেষ্টিত হইয়া থাকিতেন। ভক্তেরা তাঁহাকে কথ। কহিতে নিবেদন করিতেন, কিন্তু তিনি তাহা শুনিতেন না। এই স্থানে ভক্ত ব্যতীত বিস্তর ভদ্রলোকের সমাগম হইত।

এইরূপে শ্রামপুকুরের বাটীতে তিন মাস অতিবাহিত করেন। চিকিৎসায় উপকার হউক, আর নাই হউক, প্রচারকার্য্যই বিশিষ্টরূপে হইত। দিব্যরাত্র নৃত্য, গীত, দৈবরাশিচিন্তায় কাটিয়া যাইত। এই স্থানে প্রত্যহই অদ্ভুত ঘটনা দেখা যাইত, সে সকল লিপিবদ্ধ করিতে যাইলে, একজনের জীবনে সংকুলান হইতে পারে না। অত্যাশ্চর্য্য ঘটনার মধ্যে কালীপূজার দিনের ব্যাপার এই স্থানে বর্ণিত হইতেছে।

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়কে তিনি গুপ্তভাবে কহিয়াছিলেন যে, “কালীপূজার দিনটি বিশেষ দিন। সে দিনে মাতার পূজা হওয়া উচিত।” গুপ্ত মহাশয় কালীপদ ঘোষের নিকট তাহা ব্যক্ত করেন। কালীপদ গিরিশ বাবুর দলস্থ একজন ব্যক্তি, পরমহংসদেব কর্তৃক পরিবর্তিত হইয়াছিলেন। কালীপদ তদবধি একজন প্রধান ভক্ত মধ্যে পরিগণিত। পরমহংসদেবের প্রতি তাঁহার ভক্তি অমূল্যকরণীয়। তিনি পরমহংসদেবের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। কালীপদ এই কথা শুনিয়া কালীপূজার রীতিমত আয়োজন করিয়া দিলেন। দীপমালায় বাটী আলোকিত করিলেন এবং সন্ধ্যার পর ধূপ, দীপ, ফুল, বিজ্ঞপত্র,

গঙ্গাজল এবং হৃদ্বি, লুচি ও মিষ্টান্নাদি পরমহংসদেবের সম্মুখে সাজাইয়া দিলেন। চতুর্দিকে লোকারণ্য। পরমহংসদেবের দুই পাশে দুইটী মোমের বাতি জ্বালাইয়া দেওয়া হইল। সকলের সংস্কার ছিল যে, পরমহংসদেব নিজে পূজা করিবেন, কিন্তু কোন প্রতিমা আনয়ন করা হয় নাই। কিছুকাল স্থির ভাবে সকলে উপবেশন করিয়া রহিল। অতঃপর কোন ভক্তের মনে উদয় হইল যে, “উনি পূজা করিবেন কি, আমরা তাঁকে পূজা করিব?” এই ভাবিয়া তিনি গিরিশ বাবুকে সে কথা বলিলেন। গিরিশ একেবারে উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, “বলেন কি? আমাদের পূজা গ্রহণ করিবেন বলিয়া অপেক্ষা করিতেছেন?” তিনি “জয় রামকৃষ্ণ” বলিয়া পুষ্পাদি গ্রহণ পূর্বক পরমহংসদেবের পাদপদ্মে অর্পণ করিলেন। পরমহংসদেব আনন্দময়ীর ভাবে সমাধি হইয়া যাইলেন। তাঁহার সেই নব ভাবে সকলেই বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। “জয় রামকৃষ্ণ” ধ্বনিতে দিক্‌সমূহ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। নৃত্যের ঘটায় সেই বাটীর ছাদ অসহ বোধ করিয়া থাম থাম শব্দে আত্মদ্রুত প্রকাশ করিতে লাগিল। এই সময়ে একটী ভক্ত পরমহংসদেবের ভাবাবসান হইতে দেখিয়া হৃদ্বির পাত্রটী সম্মুখে উত্তোলন করিয়া ধরিলেন। পরমহংসদেব তাহা ভক্ষণ করিলেন। তদনন্তর সকল প্রকার মিষ্টান্ন ও তাম্বুলাদি ভক্ষণ করিয়া ভক্তদিগকে অপার আনন্দ প্রদান করিয়াছিলেন। এই মহাপ্রসাদ লইয়া যে সেদিন কি আনন্দোৎসব হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা লেখনীর অধিকার-বহির্ভূত। সেবকমণ্ডলীর দ্বারা এই উৎসবটী অত্যাধিক কাকুড়গাছীর সমাধিমান্দরে যথানিয়মে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

ক্রমে ব্যাধি বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। অঙ্গের মণ্ডল গলাধঃকরণ হওয়া হৃদয় হইতে লাগিল। স্বরভঙ্গের লক্ষণ প্রকাশ পাইল এবং শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িল। কোন চিকিৎসাই ফলদায়িনী হইল না। ডাক্তার সরকারের পরামর্শে কলিকাতার বাহিরে বায়ু পরিবর্তনের নিমিত্ত চেষ্টা হইতে লাগিল। পরমহংসদেবের শারীরিক অবস্থা অতি ভয়ানক হইয়া পড়িয়াছিল, উঠিয়া এক পদ চলিবার শক্তি ছিল না এবং উঠিলে ক্ষতস্থানে বেদনা উপস্থিত হইত। কিন্তু স্থান পরিবর্তন করা অনিবার্য হইয়াছিল। বাটীওয়ালারাও সেই সময় বাটী ছাড়িয়া দিবার জন্ত বড় বিরক্ত করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু করা যায় কি? কোন্ বাটীতে যাইবেন, জিজ্ঞাসা করিলেও বলিবেন না। পরমহংসদেবের অভিমত হইবে, এমন বাটী কোথায়, তাহা কেহ জানে না। এইরূপ

নানাবিধ ভাবিয়া তাঁহার জনৈক সেবক ক্লতাঙ্গলিপুটে কহিলেন, “প্রভু! কোন্ দিকে বাটী অনুসন্ধান করা যাইবে।” পরমহংসদেব দ্বিধা হাসিয়া কহিলেন, “আমি কি জানি?” সেবক সে সময়ে কিঞ্চিৎ বিমর্ষ হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, “প্রভু! আমাদের সহিত এখন আপনার এই ভাব! বলে দিন কোন্ দিকে যাইব। অনর্থক ঘুরাইয়া মারিবেন না।” সেবক প্রকাশে বলিলেন, “কাশীপুর বরাহনগর অঞ্চলে আবেষণ করিব?” তিনি ইঙ্গিতে আজ্ঞা দিলেন। আজ্ঞা পাইবামাত্র তৎক্ষণাৎ সেই সেবক তথায় যাত্রা করিলেন এবং মহিম চরুবর্তী নামক তাঁহার জনৈক ভক্তের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করায় তিনি একটী সুরহং উদ্ভানের অনুসন্ধান বলিয়া দিলেন। পরে উদ্ভানস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ৮০ টাকা মাসিক ভাড়া ধার্য হইয়া তিন মাসের জন্য ঐ উদ্ভানটী আবদ্ধ করা হইল। যে দিবস বাড়ী ভাড়া হইল, সেই দিবসই পরমহংসদেব তথায় গমন করিয়াছিলেন। স্থান পরিবর্তন করায় তাঁহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ উপকার হইয়াছিল। গলার ক্ষত আরোগ্যপ্রায় হইয়া বিশেষ বল পাইয়াছিলেন। তিনি উপর হইতে নামিয়া উদ্ভানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। ডাক্তার সরকার একদিন তাঁহাকে দেখিতে গিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং উদ্ভানের চারিদিক ভ্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের কি ছুরদৃষ্ট! পীড়া পুনরায় প্রবলবেগে আক্রমণ করিল। এবার বহুবাজারনিবাসী রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয় চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। তিনি ক্রমাগত তিন চারি মাস ঔষধ প্রয়োগ করিয়া কোন ফল দর্শাইতে পারিলেন না। রাজেন্দ্র বাবু নিরস্ত হইলে বুদ্ধ নবীন পালকে আহ্বান করিয়া হইল। নবীন পালের ঔষধ ক্রমাগত কিছুদিন চলিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে অস্ত্রাঙ্গ ডাক্তারেরাও আসিয়া দেখিতেন। যখন দেখা গেল যে, কাহার দ্বারা কোন প্রকার উৎকার হইতেছে না, তখন পরমহংসদেবের সম্মতিক্রমে কলিকাতা মেডিকেল কলেজের সর্বপ্রধান ডাক্তার কোটস সাহেবকে একবার দেখান হয়। তিনি তাঁহার অবস্থা দেখিয়া চিকিৎসাতীত বলিয়া ব্যক্ত করেন।

যদিও এতগুলি ইংরাজী চিকিৎসক এবং কবিরাজ মহাশয়েরা তাঁহাকে দেখিলেন, কিন্তু রোগটী কি, তাহা প্রকৃতপক্ষে কেহ স্থির করিতে পারিলেন না। কেহ কণ্ঠরোগ বলিলেন, কেহ গণ্ডমালা এবং কেহ ক্যান্সার বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন। মধ্যে মধ্যে ঐ অন্তর্কৃত গুরু হইয়া স্কোটল্যান্ডের ধারণ

করিত, তাহাতে তিনি অত্যন্ত ক্লেশ বোধ করিতেন। এমন কি কখন কখন এই স্ফোটক এত বিস্তীর্ণ হইত যে, তদ্বারা খাসক্লেশ উপস্থিত হইত। যতদিন উহা বিদীর্ণ হইয়া না যাইত, ততদিন আর কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারিতেন না। সে সময়ে আহার বন্ধ হইয়া যাইত। একপোয়া দুগ্ধ সেবন করাইলে এক ছটাক উদরস্থ হইত এবং অবশিষ্টাংশ বাহির হইয়া পড়িত। এমন হৃদ্রবং লাল নির্গত হইত যে, সে সময় কোন দ্রব্য ভক্ষণ করিতে পারিতেন না। কিয়দিন পরে এই স্ফোটক বহির্দিকে ফাটিয়া পূঁজ বহির্গত হইত। তাহাতে সাময়িক কিঞ্চিৎ সুস্থতা বোধ করিতেন বটে, কিন্তু রোগের বিক্রম কিছুই কমিত না। এই নিদারুণ রোগের যন্ত্রণা তিনি হাস্তাননে সহ করিতেন। একদিন বিমর্ষ অথবা চিন্তিত হন নাই। যখনই যে গিয়াছে, তাহারই সহিত ঐধ্বনিক বাক্যলাপ করিয়াছেন। লোকে ব্যাধির বিভীষিকা দেখাইলে, তিনি হাসিয়া উঠিতেন এবং বলিতেন, “দেহ জানে, দুঃখ জানে, মন তুমি আনন্দে থাক।” কোন কোন ব্যক্তির নিকট তিনি রোগের কথা কহিয়া চিন্তাকুল হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা তাঁহার মনোগত ভাব ছিল না।

শশধর তর্কচূড়ামণি পরমহংসদেবকে কতবার অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, সমাধির সময় ক্ষত স্থানে কিঞ্চিৎ লক্ষ্য করিলে তৎক্ষণাৎ উহা আরোগ্য হইয়া যাইবে। পরমহংসদেব সে কথা অগ্রাহ করিয়া বলিয়াছিলেন, “সমাধি করিয়া রোগ আরোগ্য করিতে হইবে? এ অতি রহস্যের কথা।”

পরমহংসদেব যৎকালে দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন, তিনি একদিন কহিয়াছিলেন যে, “আমি যখন যাইব, সেই সময়ে প্রেমভাণ্ড ভাঙ্গিয়া দিয়া চলিয়া যাইব।” এই কথা আমাদের শ্রবণ করা ছিল। ১৮৮৩ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখ উপস্থিত হইল। সে সময়ে তিনি অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ সুস্থ ছিলেন। ছুটির দিন বলিয়া সে দিন ঐ উজানে অনেক লোকের আগমন হইয়াছিল।

পূর্ব সপ্তাহে তাঁহার কোন সেবক হরিশ মুস্তফীর পরিজ্ঞানের জ্ঞাত পরমহংসদেবের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সে দিবস তিনি কোন উত্তর দেন নাই। ১লা জানুয়ারির দিন হরিশ বাবু পরমহংসদেবের নিকটে গমন করিবারাত্র তাঁহাকে কৃতার্থ করেন। হরিশ আনন্দে উন্মত্তের

তায় অগ্রপূর্ণ লোচনে নিয়ে আসিয়া উপরোক্ত সেবককে কহিলেন, “ভাই রে! আমার আনন্দ যে ধরে না! এ কি ব্যাপার! জীবনে এমন ঘটনা একদিনও দেখি নাই।” সেবকের চক্ষুও জল আসিল। তিনি কহিলেন, “ভাই, প্রভুর অপূৰ্ণ মহিমা!”

সকল ভক্তগণ একত্রে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে পরমহংসদেব দেবেন্দ্রকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। দেবেন্দ্র ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, “পরমহংসদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, রাম যে আমায় অবতার বলে, এ কথাটা তোমরা স্থির কর দেখি? কেশবকে তাহার শিষ্যেরা অবতার বলিত।” তিনি কেন যে এ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার কারণ কে বলিতে পারে? সে ক্ষেত্রে কেহ তাহার মীমাংসা করিতে পারেন নাই। অপরাহ্নকালে ভক্তেরা বাগানে বেড়াইতেছেন। এমন সময়ে দেখিলেন যে, পরমহংসদেব সেইদিকে আসিতেছেন। ভক্তেরা সকলে আগ্রহের সহিত তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সেইদিনকার ক্লেশের কথা স্মরণ হইলে আমরা এখনও আশ্চর্য্য হইয়া থাকি। তাঁহার সর্বশরীর বদ্রারত এবং মস্তকে সবুজ বনাতের কাণ-ঢাকা টুপি ছিল, কেবল মুখমণ্ডলের জ্যোতিতে দিম্বাগুল আলোকিত হইয়া ছিল। মুখের যে অত শোভা হইতে পারে, তাহা কাহারও জ্ঞান ছিল না। সেই রূপ আর একদিন ইতিপূর্বে নবগোপাল ঘোষের বাটীতে সঙ্কীৰ্ত্তনের সময় দেখা গিয়াছিল। নিকটে আসিয়া দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন পূৰ্ব্বক কহিলেন, “আমি আর কি তোমাদের বলিব? আশীর্বাদ করি, তোমাদের সকলের চৈতন্য হউক।” এই বলিতে বলিতে তাঁহার ভাবাবেশ হইল। ভক্তেরা পুষ্পচয়ন পূৰ্ব্বক, “জয় রামকৃষ্ণ!” বলিয়া তাঁহার চরণে অঞ্জলি প্রদান করিতে লাগিলেন এবং কেহ কেহ পুষ্পগুলি উদ্ধে নিক্ষেপ করায়, যেন পুষ্প-বৃষ্টির তায় দেখাইতে লাগিল। সকলেই আনন্দে পরিপূর্ণ হইলেন। পরমহংসদেব কিঞ্চিৎ ভাবাবসান করিয়া অক্ষয়কুমার সেনের বক্ষে হস্তার্পণ করিলেন। তাঁহার শরীর হইতে যেন প্রেমের বিদ্যুৎ সঞ্চালিত হইল। অক্ষয় বাবু বিভোর হইয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। তৎপরে নবগোপাল ঘোষ, তাঁহার পর উপেন্দ্রনাথ মজুমদার, তাঁহার পর রামলাল চট্টোপাধ্যায়, তাঁহার পর অভুলকৃষ্ণ ঘোষ, তাঁহার পর গাঙ্গুলী ইত্যাদি কয়েক জনের পরিভ্রাণ হইলে, হরমোহন মিত্রকে সম্মুখে আনয়ন করা হইল। তিনি হরমোহনকে স্পর্শ করিয়া বলিলেন, “তোমার আজ থাক!”

(ইতিপূর্বে হরমোহনের নিমিত্ত আর একবার পরমহংসদেবের নিকট রূপা প্রার্থনা করা হইয়াছিল ; কিন্তু সেবারেও তিনি “এখন থাক” বলিয়াছিলেন ।) এই বলিয়া তিনি গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন । ভক্তদিগের সে দিন আনন্দের আর অবধি ছিল না, কিন্তু হায় ! কে জানিত যে, এই তাঁহার শেষ অভিনয় ! কে জানিত যে, আর আমাদের প্রেমদাতা রামকৃষ্ণ প্রেম বিতরণ করিবেন না ! তখন আমরা ছন্দাংশেও জানিতে পারি নাই, অথবা একথা মনে উদয় হয় নাই যে, এই সেই পূর্বকথিত প্রেমভাণ্ড ভঙ্গ করিবার দিন আসিল ! তখনও আমরা আভাসেও জানিতে পারি নাই যে, পরমহংসদেব লীলা-রহস্য পরিসমাপ্ত করিয়া আনিলেন । মনের কত আশা, কত ভরসা, কত হবে, কত দেখবো, সে সকল যে এক কথায় সম্পূর্ণ করিয়া দিবেন, তাহা কেহ আমরা স্বপ্নেও দেখিতে পাই নাই, কখন কল্পনায়ও ভাবি নাই । আমরা আনন্দ করিয়া লইলাম, আমাদের স্বার্থ চরিতার্থ হইল, শান্তি আসিয়া সকলকে অধিকার করিল, সে দিনকার রঙ্গ-ভূমির যবনিকা পড়িয়া গেল ।

তাহার পর আর তাঁহাকে সেরূপ অবস্থায় দেখা যায় নাই, রোগের ক্রম ক্রমাগত বৃদ্ধিই হইতে লাগিল । কথিত হইয়াছে যে, আহাৰ কমিয়া গিয়াছিল ; সুতরাং ক্রমশঃ দেহের মাংস বসা শোষিত হইয়া কেবল চন্দ্রাচ্ছাদিত অস্থি ক'খানি অবশিষ্ট ছিল মাত্র । এক এক দিনের শোণিত শ্রাবের কথা মনে হইলে অত্মাপি অঙ্গ শিহরিয়া উঠে । এত শোণিত বহির্গত হইত, কিন্তু তথাপি সে সময়ে তিনি কখন বিমর্ষযুক্ত হইতেন না, বরং কত রহস্য করিতেন ।

এই সময়ে পূর্বোন্নিখিত সন্ন্যাসী ভক্তদিগের মধ্যে রাখাল, যোগেন, শশী, বাবুরাম, লাটু, শরৎ এবং গোপাল প্রভৃতি কয়েক জন সেবাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন । সকলেই প্রাণপণে সেবা করিয়াছেন । তাহার বিরুদ্ধে কে কহিবে ? তাঁহাদের সেবাই ধ্যান, সেবাই জ্ঞান, মনু প্রাণ যেন সেবা-তেই নিমগ্ন ছিল । তাঁহারা সংসার-সুখ একদিকে কাকবিষ্ঠাবৎ জ্ঞান করিয়া, অপরদিকে প্রভুর সেবাই সংসারের একমাত্র কর্তব্য মনে করিয়া আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন । কিন্তু শরীর সেবা তুলনারহিত এবং অনুকরণীয় । যতপি সেবা বলিয়া সংসারে কোন কথা থাকে, তাহা হইলে শরীর তাহা জানিত । যতপি কাহাকেও সেবাত বলিয়া কহা যায়, তাহা হইলে

শশীকেই সর্বাঙ্গগণ্য বলিয়া কহা যাইবে। যত্নপি অহেতুকী ভক্তি কেহ দেখিতে চাহেন, তাহা হইলে তিনি শশীকে তাহার আদর্শ দেখিবেন। শশীর গুণই সব, দোষ নাই। তবে মনুষ্য নির্দোষী হইতে পারে না, এইটী প্রবাদ আছে। শশী, বিনা বিচারে, বিনা বাক্বিতণ্ডায়, স্বার্থপক্ষে দৃষ্টি না রাখিয়া, একমনে পরমহংসদেবের সেবা করিত। ইহাকে যত্নপি দোষ কহা যায়, এইটী তাহার দোষ ছিল। হুম্মানের দাস্ত-ভক্তি আমরা শ্রবণ করিয়াছি; শশী দাস্ত-ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে। অমন ভক্তচুড়ামণি আমরা পরমহংসদেবের একটী ভক্তকেও দেখি নাই। একথা আমরা অতিরঞ্জিত করিয়া বলিতেছি না। যে কেহ পরমহংসদেবের নিকট গিয়াছেন, সকলেই একটা স্বার্থের সম্বন্ধ রাখিয়াছিলেন। কিসে পরিত্রাণ হইব, কিসে সাধন ভজন হইবে, কিসে যোগমার্গে পরিভ্রমণ করিতে সক্ষম হইব, এইরূপ একটা না একটা ভাব সকলেরই ছিল। শশীর সৈ সকল কিছুই ছিল না। সে আত্ম-নিবেদন করিয়া নিষ্কাম ধর্ম প্রভুসেবা করিতে শিখিয়াছিল; তাহা জীবনে সাধন করিয়া নিজে কৃতার্থ হইয়াছে এবং যে কেহ শশীর এই দাস্ত-ভক্তির উপাখ্যান শ্রবণ করিবে, তাহারও সেই ভক্তি লাভ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। শশী! তুই তাই ধন্ত! তুই ষথার্থ সেবা শিক্ষা করিয়াছিলি! পৃথিবীর সারধর্ম—সারাৎসার কর্ম—গুরুসেবা! যদি দেখিবার কিছু থাকে, তাহা শ্রীগুরুর শ্রীপাদপদ্ম! যত্নপি করিবার কিছু থাকে, তাহা শ্রীগুরুর শ্রীচরণ বন্দনা, এবং যত্নপি শ্রবণ করিবার কিছু থাকে, তাহা শ্রীগুরুর গুণ-গাথা! শশী! তুই তা করিয়াছিস! প্রাণ তরিয়া, আকাজ্জ। মিঠাইয়া করিয়াছিস! কখন মনে হয়, তুই বুঝি জন্মান্তরে সেবা করিবি বলিয়া পঞ্চ-তপা করিয়াছিলি, অথবা গলা কাটিয়া শোণিত দান করিয়াছিলি, তাই প্রভু তোর জন্ত উৎকট ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া সেবা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত তোর নিকট জড়বৎ শয়ন করিয়াছিলেন। তুই তাই মানব দেহ ধারণ করিয়া প্রকৃত কর্তব্য কর্ম বুঝিয়াছিলি, তুই সেই নিমিত্ত প্রভুর বিশেষ রূপাপাত্র। তাঁহার দয়াতে তুই আজ সেবক-মণ্ডলীর শিরোমণি। প্রভু যেমন আমাদের গুরু—গুরু বলিয়া মনে স্পর্ক হয়, তেমনি তুই তাঁহার সেবক। পরিচয় দিবার যোগ্য পাত্র, তুই অধিতীয়।

মাতা ঠাকুরাণী যদিও নিকটে ছিলেন, কিন্তু সেবার জন্ত তাঁহাকে ব্যস্ত হইতে হইত না। শশী সকল দিকে দৃষ্টি রাখিত। অগ্নাগ্ন সন্ন্যাসীভক্তেরা পরমহংসদেবের সেবায় আত্ম-বিসর্জন দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের

জপ-তপ করিবার বড় বাসনা হইয়াছিল । কখন কৌপীন পরিয়া চিম্‌টে লইয়া গাত্রে ভদ্র মাখিয়া সন্ন্যাসী সাজিতেন, কখন ধূনি জ্বালাইয়া অগ্নির উত্তাপ সম্ভোগ করিতেন, কখন উপবাসাদি নিয়ম করিয়া দিন যাপন করিতেন । শরীর এ সকল কিছুই ছিল না ।

পরমহংসদেব নাকি কয়েকটা সন্ন্যাসী ভক্তকে ভিক্ষা করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন, তাঁহারা সেইজন্ত মধ্যে মধ্যে ভিক্ষা করিতে যাইতেন । তিনি সন্ন্যাসী ভক্তদিগের কথা গৃহী ভক্তদিগকে বলিতেন না এবং গৃহী ভক্তদিগের কথা সন্ন্যাসীদিগকে বলিতেন না । কিন্তু কখন কখন উভয় পক্ষের নিকট উভয় পক্ষের দোষ বলিয়া দিতেন । তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে শাসন করিতেন । এইরূপে এই উভয় শ্রেণীদিগের মধ্যে কিঞ্চিৎ বৈরীভাব ছিল ।

এই কাশিপুরের উদ্ভানে পরমহংসদেব আট মাস অস্থিতি করিয়াছিলেন । তথাকার যাবতীয় বায় গৃহী ভক্তেরা সরবরাহ করিতেন ।

পরমহংসদেবের অবস্থা দিন দিন পরিবর্তন হইতে লাগিল । যখন আহার কমিয়া গেল, যখন উষ্ণশক্তি রহিত হইল, যখন একেবারে স্বরভঙ্গ হইয়া গেল, তখন অনেকেই হতাশ হইয়া পড়িলেন । অনেকেই মনে করিলেন যে, আর রক্ষা নাই । চেষ্টার কটা কিছুই হইল না, ডাক্তারি, কবিরাজি, অববোধ, টোটকা প্রভৃতি সকলেরই সাহায্য লাওয়া হইয়াছিল, কিন্তু কিছুই হইল না । কোন কোন ভক্ত স্ত্রীলোক তারকনাথের সোমবার করিতেন এবং নারায়ণের চরণে তুলসী দিতেন, কোন ভক্ত তারকনাথের চরণামৃত ও বিশ্বপত্নাদি আনাইয়া ধারণ করাইলেন এবং কেহ হত্যা দিয়াছিলেন, কিন্তু সকলই বিফল হইয়া গেল, স্মৃতরাং সকলের আশা ভরসা আর কিরূপে থাকিতে পারিবে ? পরমহংসদেবের নিকটে কতবার ভক্তেরা কাঁদিয়া বলিয়াছিলেন যে, “আপনি নিজে না আরোগ্য হইলে, কেহ ব্যাধির শান্তিবিধান করিতে পারিবে না ।” তিনি হাসিয়া কহিয়াছিলেন, “শরীরটা কাগজের খাঁচা, আর গলায় একটা ছিদ্র হইয়াছে, দেখিতে পাই । ইহার জন্ত আবার করিব কি ?” এইরূপে সকল কথা উড়াইয়া দিতেন । ক্রমে শ্রাবণ মাস অতীতপ্রায় হইল । ৩১শে শ্রাবণ পূর্ণিমা রবিবার । প্রাতঃকালে তিনি কোন ভক্তকে ডাকাইয়া পঞ্জিকা দেখিতে কহিলেন । ৩১শে শ্রাবণের সকল বিবরণ শ্রবণ করিয়া যেই ১লা ভাদ্র মাসটা তাঁহার কর্ণগোচর হইল, অমনি তাহাকে চূপ করিতে কহিলেন ।

সেইদিন কেমন একরকম হইয়া উঠিয়াছিলেন। অপরাহ্নের কিঞ্চিৎ পরে নবীন পাল ডাক্তার পুনরায় উপস্থিত হইলেন। পরমহংসদেব কহিলেন, “আজ আমার বড় ক্লেশ হইতেছে, দুইটা পার্শ্ব যেন জলিয়া উঠিতেছে।” এই বলিয়া হস্ত প্রসারণ করিয়া দিলেন। নাড়ী দেখিয়া ডাক্তারের চক্ষু স্থির হইল। পরমহংসদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, “উপায় কি ?” ডাক্তার কি বলিবেন ভাবিয়া অজ্ঞান হইলেন, কোন উত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না। পরমহংসদেব পুনরায় কহিলেন, “কিছুতেই কিছু হইতেছে না। রোগ দুঃসাধ্য হইয়াছে ?” ডাক্তার, “তাই ত,” বলিয়া অধোবদন হইলেন। পরমহংসদেব দেবেন্দ্রকে সম্ভাষণ পূর্বক ভূড়ি দিয়া কহিলেন, “এরা এতদিন পরে বলে কি ? রোগ আরোগ্য হইবে বলিয়া আমায় চিকিৎসা করাইতে আনিয়াছে। যদি রোগই না সারে, তবে রুধা কেন এ যন্ত্রণা ?” তিনি রোগের কথা কিস্বা ডাক্তারের কথা আর যুখে আনিলেন না। “অন্তঃপর তিনি কহিতে লাগিলেন, “দেখ, আমার হাঁড়ি হাঁড়ি ডাল ভাত খাইতে ইচ্ছা হইতেছে।” দেবেন্দ্র ছেলে ভুলাইবার মত কত কি বলিল, কিন্তু তাঁকে ভুলাবে কে ?

সে রাত্রে হুজি ও হুগ্ধ অপর দিনের অপেক্ষা সহজে গলাধঃকরণ করিতে পারিয়াছিলেন এবং স্নুখে প্রায় রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত নিদ্রিত ছিলেন। ১টার পূর্বে উঠিয়া বসিলেন এবং হুজি ভক্ষণ করিলেন। হুজি ভক্ষণান্তর, ১টা ৬ মিনিটের সময় তিনি সহসা সমাধিস্থ হইয়া যাইলেন। ভক্তদিগের প্রাণ পূর্ব হইতে কেমন বিকৃত হইয়াছিল। তাঁহার সমাধিস্থ হওয়ায় সকলেরই আতঙ্গ হইল। তাঁহাদের প্রাণ হ হ করিতে লাগিল এবং যেন সে গৃহ শূন্য বোধ হইল।

অমন পূর্ণিমার রাত্রি, বিশেষতঃ সেইদিন পাইকপাড়ার কাশিপুরের ঠাকুর-বাড়ী হইতে কাঙ্গালী বিদায় হইতেছিল, তজ্জন্ম ঐ স্থান দিয়া সমস্ত রাত্রি লোকজন যাতায়াত করিতেছিল, কিন্তু ভক্তদিগের হতাশ-বিভীষিকা আসিতে লাগিল। তাঁহারা নিশ্চয় মহা-সমাধি বলিয়া জ্ঞান করিলেন। সে রাত্রে আকাশে নানাবিধ পরিবর্তন ও চন্দ্রমণ্ডল দেখা গিয়াছিল। এই বিষম সমাচার রজনীযোগেই অধিকাংশ স্থানে প্রেরিত হইয়াছিল এবং সেবকগণ সকলেই তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

এদিকে কাল রাত্রি বিদায় হইল। ১লা ভাদ্রের প্রাতঃ সমীরণ, রামকৃষ্ণ মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন, এই বার্তা ঘরে ঘরে কাণে কাণে প্রদান করিল। যে সংবাদ কেহ প্রত্যাশা করেন নাই, যে সংবাদ পাইবার জন্ম কেহ প্রস্তুত

ছিলেন না, আজ সেই অভাবনীয়, অচিন্তনীয় সংবাদ আসিয়া উপস্থিত হইল।
হায় রে ! এ ত সংবাদ নহে, এ যে বজ্রাঘাত, বজ্রাঘাত অপেক্ষাও কঠিন।
বজ্রাঘাতে প্রাণ যায়, তাহাতে যন্ত্রণা সহ করিতে হয় না ; এর আঘাত
বজ্রের ত্রায়, কিন্তু প্রাণ বহির্গত না হওয়ায় যন্ত্রণার বিরাম হয় না। যেমন
তাঁহার সহিত নিত্য নব নব আনন্দ সন্তোগ হইয়াছিল, এখন তেমনি নব নব
বিরহ-জ্বালা সমুখিত হইয়া দেহ দাহ করিতে লাগিল। যখনই মনে হয় যে,
তিনি আর নাই, আর তাঁহার আদরপূর্ণ অমিয়বৎ কথা শুনিতে পাইব না,
নিকটে যাইলে আর তিনি তেমন করিয়া বসিতে বলিবেন না, বিষয়সম্ভাপে
উত্তপ্ত হইয়া যাইলে আর তিনি শান্তি-বারি প্রদান করিবেন না, আর তিনি
আমাদের লইয়া সংকীৰ্ত্তনে মাতিবেন না, আর তাঁহার অপূৰ্ণ নৃত্য দেখিতে
পাইব না, আর তাঁহার বদন-বিনিঃসৃত হরিনামধ্বনি শুনিতে পাইব না,
তখনই হৃদয়নিহিত দারুণ বহ্নিজ্বালা আরও প্রবল প্রতাপে জ্বলিয়া উঠে !
হায় হায় ! আমাদের কি হইল ! কেন এমন সর্বনাশ হইল ! আর কাহার
কাছে যাইব, কোথায় গিয়া প্রাণ শীতল করিব ! এই উনবিংশ শতাব্দীর
হিল্লোলে পড়িয়া পথহারা হইয়া যাহার চরণরূপায় স্থির হইতে পারিয়াছিলাম,
আজ তিনি কোথায় ? আমাদের অকূলে ফেলিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন ?
কুলবালা—যাহাদের কখন চন্দ্র সূর্য্য দেখিতে পায় নাই, তাহারা পর্যাস্ত
কূলের মন্তকে পদাঘাত করিয়া জন্মের মত সেই রামকৃষ্ণমूर्তি দর্শনের
জগ্ন রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইল ! আর ভয় নাই, আর লজ্জা নাই, এখন
কুলমানে যেন জ্বালালি দিয়া রামকৃষ্ণ গুণসাগরে লক্ষ প্রদান করিল। কোন
সেবিকা, প্রভুকে শেষ দেখা দেখিয়া আসিবার জগ্ন তাঁহার স্বামীর অনুমতি
চাহিয়াছিলেন। তাঁহার স্বামী কোন উত্তর করিতে পারেন নাই। কি
বলিবেন ? একদিন যে সহধর্ম্মিণীকে, স্বামী যাহা স্বীকে কদাপি প্রদান
করিতে সমর্থ হয় না, এমন অমূল্য রত্ন, রত্নের বিনিময়ে যে রত্ন লাভ হয় না,
হইবার নহে, তাহাও দিয়াছিলেন, অতঃপাশ্বে কি দেখাইতে লইয়া
যাইবেন ? এই ভাবিয়া উত্তর দিলেন না। আর যদিই তাঁহাকে দেখিবার
সাধ হইয়া থাকে, এ জন্মে ত আর সে রূপ দেখিতে পাইবে না, আজ সেই
রূপ চিরদিনের জগ্ন পক্ষীকৃত করা হইবে, কিন্তু যাইলেও ত দেখিতে
পাইবে না, ভক্তেরা তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিয়া আছে, এই ভাবিয়া নিরুত্তর
ছিলেন। যাহার প্রাণ উচাটন হয়, যাহার প্রাণ যে কার্য্যে ধাবিত হয়,

মন কি তাহার গতিরোধ করিতে পারে? সেবিকা শুনিল না—সে যথাসময়ে আপনি যাইয়া উপস্থিত হইল ।

✽ নেপাল রাজ-প্রতিনিধি বিশ্বনাথ উপাধ্যায় এই হৃদয়ভেদী সংবাদ প্রাপ্ত হইবামাত্র প্রাতঃকালেই তথায় উপস্থিত হইলেন । তিনি দেখিলেন যে, যদিও তাঁহার সর্কশরীর কষ্টকিত ও কঠিন হইয়াছে এবং চক্ষু স্থির হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তখনও পর্য্যাপ্ত তাঁহার মেরুদণ্ড উচ্চ রহিয়াছে । তিনি এই লক্ষণ দ্বারা মহা-সমাধি বা মৃত্যু কহিলেন না । তাঁহার এই কথা শ্রবণ পূর্কক ডাক্তার সরকারকে আহ্বান করা হইয়াছিল । তিনি আসিয়া মৃত্যু স্থির করিলেন । এক্ষণে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল । ভক্তেরা তখন দিশেহারা পথিকের গায় দিগ্বিদিক্জ্ঞানবিবর্জিত বাতুলপ্রায়, তাঁহারা এই ভব-জলধির মধ্যস্থলে দেহ-তরীর কর্ণধারবিহীন হইয়া শ্রোতের আকর্ষণে ইতস্ততঃ বিঘূর্ণিত হইতেছিলেন, তাঁহাদের জীবন মরণের একমাত্র সহায়, সম্পত্তি, সম্বল, জ্ঞান, বুদ্ধি, বল, গুরু, শাস্ত্র, বন্ধুর অভাব জ্ঞাৎ কিংকর্তব্যবিমূঢ়প্রায় হইয়াছিলেন, তাঁহাদের হৃদয়ের পূর্ণ শশধর সহসা কালমেঘারত হইয়া সর্কতোভাবে তমসাচ্ছন্ন করিয়াছিল, স্মৃতরাং তাঁহাদের দ্বারা এ গুরুতর বিষয় মীমাংসা হওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিল । এমন কি, অনেকে তাঁহাকে কি দেখিব, কেমন করিয়া দেখিব ভাবিয়া নিকটেই যাইতে পারিলেন না । তাঁহারা এই বিপদকাহিনী সাধারণকে বিজ্ঞাপন করিলেন । যেখানে যে কেহ ছিলেন, সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন । লোকে লোকারণ্য হইল । তৎকালে কয়েকটা সন্ন্যাসী আসিয়াছিলেন, তাঁহারা পরমহংসদেবের মহা-সমাধি সাব্যস্ত করিয়া যান । তাঁহাদের কথাই বিশেষ প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করা হইলেও দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা হইয়াছিল ।

পরদিন পাঁচ ঘটিকার সময় দ্বিতল, গৃহ হইতে মহা-সমাধিস্থ মহাপুরুষের শরীর বাহিরে আনয়ন পূর্কক এক বিস্তীর্ণ পর্য্যাক্ষোপরে উপবেশন করাইয়া আর্দ্র বস্ত্রে অঙ্গ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হইল । তদনন্তর পীতাম্বর পরিধান করাইয়া খেত চন্দন দ্বারা সর্ক শরীর আবৃত করা হইল । শরীর অসুস্থ ছিল বলিয়া আজ বর্ষাধিক কাল চন্দন দেওয়া হয় নাই, অত্ন মনের সাধে জন্মের মত চন্দন পরান হইল । গলদেশে ফুলের মালা, মস্তকে ফুলের চূড়া, কটিদেশে ফুলের বেড়া, চরণে ফুলের নূপুর । প্রভু আমার আজ যেন ফুল শয্যায় শয়ন করিয়াছেন! পালঙ্কখানি ফুলের মালায় স্নশোভিত করিলে, ভক্তমণ্ডলী

সহ ফটোগ্রাফ লওয়া হইল। প্রভুর সে দিনের শোভা কত হইয়াছিল, তাহা যিনি দেখিয়াছেন, তিনি তাহার পক্ষপাতী হইয়াছেন। এমন সময় ভক্তবীর অরেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বাটী হইতে পুষ্প ও বিষ্ণুপত্র লইয়া গিয়াছিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি সরোদনে কহিলেন, “গুরুদেব! আজ আপনাকে এই অবস্থায় দেখিতে হইল! আর বলিব কি? সকল আশা ভরসা আপনার সহিত বুঝি শেষ হইল! এ পাপিষ্ঠের এই শেষ পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করুন” বলিয়া তাঁহার চরণে পুষ্প বিষ্ণুপত্রাদি প্রদান করিলেন।

বেলা ছয়টার পর যুদ্ধ করতাল সহকারে হরিনাম সংকীৰ্ত্তন পূৰ্ব্বক তাঁহাকে জাহ্নবীতটে আনা হইল। পথিমধ্যে হাহাকার রবে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। এই সময় রষ্টিধারা পতিত হওয়ায় অসুস্থ হইয়াছিলেন যেন, বাহাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া রামকৃষ্ণদেব পতিতপাবনরূপে জন্মিয়াছিলেন, তাঁহার অকালে দেহত্যাগে সেই অগতিদিগের গতি হইবে না-ভাবিয়া স্বর্গের দেবদেবীগণ নয়নধারা দ্বারা তাঁহাদের মনোদুঃখ জানাইতেছিলেন।

সন্ধ্যার পূর্বাঙ্কে চিতা প্রস্তুত হয় এবং রামকৃষ্ণের দেহ তত্পরি সংস্থাপন পূৰ্ব্বক অগ্নি সংস্থার করা হইয়াছিল। ত্রৈলোক্যনাথ সাগাল সেই ক্ষেত্রে তৎকালোপযুক্ত গান করিয়াছিলেন। এক ঘণ্টার মধ্যে চিতা সকার্য সাধন করিয়া লইল। যখন চিতানল পূর্ণ প্রভাবে জ্বলিতেছিল, সেই সময় ঠিক চিতার উপর পুষ্প রষ্টি হইয়াছিল। এক ঘণ্টার মধ্যে রামকৃষ্ণমূর্তি পক্ষীকৃত করিয়া তাঁহার চিতাবশিষ্ট অস্থিপুঞ্জ একটা তাম্রের পাত্রে রক্ষা পূৰ্ব্বক কাশিপুরের ঘাটে অবগাহনাদি কার্য্য সমাধা করিবার নিমিত্ত সকল ভক্তেরা শূণ্ঠ মনে ও শূণ্ঠ প্রাণে সমাগত হইতে লাগিলেন। পথিমধ্যে এক অভাবনীয় বিদ্রাট উপস্থিত হইল। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক ভক্তটির পায়ে কাল-ভুজঙ্গ দংশন করিল। সর্পাঘাতে উপেন বসিয়া পড়িল। তাহার পায়ে উপরিভাগে বন্ধন দেওয়া হইল এবং ক্ষত স্থানটী উত্তপ্ত লৌহ শল্যুকা দ্বারা দগ্ধ করান হইল; প্রভুর মহিমায় উপেনের আর কোন ক্রেশ হয় নাই। সেই ক্ষত স্থানটী প্রায় ৪৫ মাস নীলবর্ণ ও ক্ষীত হইয়াছিল।

রামকৃষ্ণের লীলা ফুরাইল। যাহাকে লইয়া আমরা গত কয়েক বৎসর হইতে আনন্দ-রঙ্গভূমির অভিনয় করিতেছিলাম, আজ তাহার যবনিকা পতিত হইল। আমাদের ত্রায় পাপীদিগের সহবাস কি পুণ্যময়ের অধিক দিন ভাল

লাগে ? যাহাদের সহবাস সহোদরও কামনা করিয়া পরিত্যাগ করে, সে সহ-বাস তিনি বলিয়া এত দিন করিতে পারিয়াছিলেন। স্নাতরাং, আমরা তাঁহাকে কৌশল করিয়া তাড়াইয়া দিলাম। সমুদ্র-মন্ডনের হলাহল শিব পান করিয়া আপনি নীলকণ্ঠ হইয়াছিলেন। পরমহংসদেবও আমাদের পাপ-বিষ ধারণ করিয়া সেই বিষের অসহ জ্বালা আপনি সহ করিলেন। পরে যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহা দ্বারা তাঁহার দেহ ভস্মীভূত করিয়া নিরস্ত হইলাম। কৰ্ম ভিন্ন কৰ্ম্ম শূন্য কাটে না। পাপের প্রায়শ্চিত্ত চাই। কিন্তু এতগুলো জুয়াচোর, লম্পট, বিশ্বাসঘাতক, বিনা সাধনে, বিনা কৰ্ম্মে, পরিত্রাণ পাইল কি রূপে ? তিনি বার বার বলিয়াছেন যে, তোমাদের সকলের পাপ ভার গ্রহণ করিয়া আমি অমৃত্যুতা ভোগ করিতেছি। হায় প্রভু ! আমরা না বুঝিয়া পাপের ভার দিয়াছি। আমরা যদি জানিতাম যে, আমাদের জন্ত আপনি এত ক্লেশ পাইবেন, তাহা হইলে হয় ত জ্ঞানেন্দ্রের সহিত সে দুঃখ আমরা সহ করিতাম। কিন্তু আমরা স্বার্থপর, একথা পূর্বে স্বকর্ণে শুনিয়াও তখন চेतন হয় নাই, তখন উহা প্রভুর রহস্য বলিয়াই জ্ঞান ছিল। যে দিন রাত্রে অ্যাসেটিক অ্যাসিড সেবন করিয়া শোণিত বমন করিয়া আমাদের গ্রীবা ধারণ পূর্বক বলিয়াছিলেন, “এত রক্ত বাহির হইতেছে, তথাপি প্রাণ যাইতেছে না কেন ?” আমরা পাশ্চ বর্বর, স্বচ্ছন্দে কহিয়াছিলাম, “যাওয়া উচিত ছিল।” এখন সে রহস্য কোথায় ? এখন সেই কথা স্মরণ হইয়া আপনার শিরোদেশে আপনি করাঘাত করিতেছি। এখন মনে হইতেছে যে, কি সর্বনাশই করিয়াছি ! কেন তখন গর্দভের গায় অমন বুদ্ধি হইয়াছিল। আরে পামর মন ! তোর কথা শুনে এমন বিবাদের দিনও হাসি পায়। তুই গর্দভ ব্যতীত মনুষ্য ছিলি কবে ? প্রভুর চরণধূলিম্পর্শে মনুষ্যপদবাচ্য হইতে পারিয়াছি, এখন কি সে কথা মনে নাই ?

রামকৃষ্ণ বিসর্জন দিয়া কেহ পুতনীয়ে অবগাহন করিলেন এবং কেহ আপনাকে পবিত্র জ্ঞানে কানীপুরের উদ্ভানে অস্থিপূর্ণ পাত্রটী রাখিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিলেন।

অস্থিপুঞ্জ সপ্তাহ কাল কানীপুরের উদ্ভানে রহিল। প্রত্যহ রীতিমত পূজা ও ভোগরাগাদি হইত। জন্মাষ্টমীর দিন অস্থিগুলি কাঁড়গাছির ঘোগোড়ানে যথানিয়মে সমাহিত হইয়া তিরোভাব-মহোৎসব কার্য্য মহা সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। তদবধি এই স্থানে নিত্য পূজার ব্যবস্থা

হইয়াছে । প্রতি বৎসর এই স্থানে দুইটী মহোৎসব হইয়া থাকে । কালী পূজার দিন পরমহংসদেব যেরূপে পূজা করাইয়াছিলেন, অবিকল সেইরূপে তাঁহার পূজা করা হয় এবং তিরোভাব উপলক্ষে জন্মাষ্টমীর পূর্বে এক সপ্তাহ বিশেষ ভোগরাগ এবং সঙ্কীৰ্ত্তনাদি হইয়া শেষ দিনে নগর কীর্ত্তনাদি হইয়া তাঁহার শেষ দিনের আজ্ঞা, “হাঁড়ি হাঁড়ি ডাল ভাত” ভোগ দেওয়া হয় এবং তাহা উপস্থিত, নিমন্ত্রিত এবং অভ্যাগত ব্যক্তিদিগকে বিতরণ করা হইয়া থাকে । এতদ্ব্যতীত গুরুপক্ষীয় ফাল্গুনী দ্বিতীয়া, বিজয়া, ১লা জাম্বয়ারী এবং বৈশাখী পূর্ণিমা, এই দিবসচতুষ্টয় তথায় পৰ্ব্বদিন বলিয়া পরিগণিত করা যায় ।

পারিশিষ্ট ।

পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্তের এক প্রকার সংক্ষেপে আভাস দেওয়া হইল। তাঁহার এক দিনের কাণ্ডকলাপ সুচারুরূপে লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলে, এই গ্রন্থ অপেক্ষা সুরহং একখানি গ্রন্থতেও সম্পূর্ণ ভাবে তাহা প্রকাশ করা যাইতে পারে কি না, সন্দেহের বিষয়। তাঁহার ইতিবৃত্ত অতিশয় কঠিন, পাঠকের অনেকেই তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। তিনি কোথায় পল্লীগ্রামে সামান্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণপরিবারে জন্মগ্রহণ করিলেন, লেখা পড়া (যাহা দ্বারা মনুষ্যদিগকে উন্নত এবং বহুদর্শী করিয়া থাকে) যে প্রকার শিক্ষা করিয়াছিলেন, সে প্রকার পাণ্ডিত্যে বাস্তবিক জ্ঞানী হওয়া যায় না এবং রাসমণির দেবালয়ে সাত টাকা বেতনের চাকরী করায় তাহার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু এই অবস্থাপন্ন হইয়াও তাঁহার ভিতরে ভিতরে যে ধর্মভাব ছিল, তাহার দ্বারা বাল্যকালে তিনি সমাদৃত এবং যুবা ও প্রৌঢ়াবস্থায় সাধারণের নিকট ভক্তিভাজন হইয়াছেন।

এক্ষণে কথা হইতেছে যে, বিবিধ বিজ্ঞানশাস্ত্রাদি শিক্ষা করিয়া জ্ঞানী হওয়াই যে ধর্মোপার্জন এবং জীবন গঠন করিবার একমাত্র উপায় এবং পারলৌকিক পুণ্যধামে যাইবার রাজপথবিশেষ, তাহা পরমহংসদেবের জীবনী পর্যালোচনা করিয়া বিষম সন্দেহের স্থল হইয়া দাঁড়াইতেছে। যত্বপি এ কথা বলা হয় যে, শুনিয়া শিক্ষা হইতে পারে এবং ইহাও প্রকাশ আছে যে, তিনি প্রত্যেক সাধন ভজন গুরুকরণ দ্বারা কৃতকার্য হইয়াছিলেন, তখন আশ্চর্যের বিষয় কি? গুরুকরণ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রত্যেক ভাব আপনা আপনি উপস্থিত হইত এবং তিনি আপনি সমাধা করিয়া লইতেন; গুরু কেবল নিমিত্তমাত্র থাকিতেন। ভাল, তাহা স্বীকার করিলেও, আর একটা অপত্তি আসিতেছে। যে সকল সাধন-ভজনে পৃথিবীর সৃষ্টিকাল হইতে অত্যাধিক একজন নিৰ্দিষ্ট কালের মধ্যে সিদ্ধ হইতে পারে নাই, তিনি কেমন করিয়া তাহাতে তিন দিনে কৃতকার্য হইয়াছিলেন? একটা দুইটা মনে, সংখ্যাতীত। উপযুক্ত সিদ্ধ গুরু পাইলে কার্যাবিশেষের সুবিধা হয় বটে, কিন্তু এ প্রকার দৃষ্টান্ত, আমরা যতদূর জানি, আর নাই। তাঁহার মস্তিষ্ক

সাধারণের জ্ঞান ছিল না; তাহা অসাধারণ বলিতে হইবে। তাঁহার সহিত চলিত কথা কহিতে পণ্ডিত, জ্ঞানী, কৰ্ম্মী, কেহই পারিতেন না। তাঁহার প্রত্যেক কথা গভীরতম ভাবে পরিপূর্ণ থাকিত। যখন যে প্রকার লোক তাঁহার নিকট যাইত, তিনি তাহারই মত কথা কহিতেন। আবার যখন বহু ভাবের ব্যক্তি একত্রে মিলিত হইত, তখন এক কথায় সকলের মনোসাধ পূর্ণ করিতেন।

* আমরা সৰ্ব্বদা দেখিতে পাই যে, কেহ কিঞ্চিৎ ভক্তিতত্ত্ব অথবা জ্ঞান-পন্থার কথাবিশেষ লাভ করিয়া আশ্চর্য্যের ইয়ত্তা রাখেন না। আজ এ স্থানে বক্তৃতা, কাল ওস্থানে শাস্ত্র ব্যাখ্যা, পরম শিষ্য বুদ্ধি, তৎপরদিন তাহাদিগকে নিজ চিত্তিত ভেক ধারণ করাইয়া নাম বাহির করিতে প্রাণপণে চেষ্টা পাইয়া থাকেন। কিসে সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা তাঁহার ছোটো স্মৃতি-কবিতা করিবেন, কিসে ছাপার কাগজে তাঁহার নাম উঠিবে, এই কামনায় সৰ্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকেন। পরমহংসদেবের সে ভাব একেবারেই ছিল না। তাঁহার সে ভাব থাকিলে অল্প এ প্রদেশে একটা হলস্থল পড়িয়া যাইত। পাছে লোকে তাঁহাকে জানিতে পারে, এই জ্ঞান তিনি অতি দীনভাবে দিন যাপন করিতেন। তাঁহার কার্য্যকলাপ দেখিয়া নিকটের ব্যক্তিরাই ভ্রমে পতিত হইত, অপরে বুঝিবে কি? লোকে কখন ভক্তির কার্য্য দেখিত, আবার কখন তাহার বিপরীত ভাব দেখিয়া মনের ভিতর নানা প্রকার সন্দেহ আনিয়া উপস্থিত করিত। পাছে তাঁহাকে কেহ চিনিতে পারে, তজ্জ্ঞান তিনি কোন প্রকার ভেকের লক্ষণ ধারণ করিতেন না। এমন সামান্য ভাবে থাকিতেন যে, লোকে তাঁহাকে একজন ভদ্রলোক বলিয়া ও বুঝিতে পারিতেন না। একদিন তিনি গঙ্গাতীরে বেড়াইতেছিলেন, একজন কালকাতার ডাক্তার দক্ষিণেশ্বরে রোগী দেখিতে গিয়া রাসমণির ঠাকুরঘাটা দর্শনাভিলাষে সেই সময়ে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি পরমহংসদেবকে বাগানের মালী মনে করিয়া জুঁই ফুল তুলিয়া দিতে হুকুম করিয়াছিলেন। পরমহংসদেব তৎক্ষণাৎ তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়াছিলেন। এই ডাক্তারটী তাঁহার ব্যাধির সময় দেখিতে যাইয়া আশ্চর্য্যায়িত হইয়া বলিয়াছিলেন, “কি সৰ্ব্বনাশ! আমি করিয়াছিলাম কি! এঁকেই ত ফুল তুলিয়া দিতে বলিয়াছিলাম!”

অভিমান নাশ করিবার নিমিত্ত যে সাধন করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি মিশ্র-সিদ্ধ হইয়াছিলেন। তাহা না হইলে ডাক্তারের আজ্ঞা পালন করিতে

পারিতেন না। তাঁহার জীবনে আরও এমন অনেক ঘটনা হইয়া গিয়াছে, যাহাতে পূর্ণ অভিমানশূন্য ভাব দেখা গিয়াছে। একদা তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, বোধ হয় কামাদি রিপুগণ গিয়াছে, আর ভয় নাই। তিনি তখন বকুলতলার ঘাটে স্নানিয়াছিলেন। এই কথা মনে হইবামাত্র তাঁহার মনের ভিতর পূর্ণভাবে কামরুত্তির উদ্দীপন হইয়া যাইল। তিনি বলিতেন যে, “সে সময়ে যতপি প্রোঢ়া কিস্বা বৃদ্ধা জীলোক সেই পথে গমন করিত, তাহা হইলে আমার ধৈর্য্যচ্যুতি হইত কি না, বলিতে পারি না।” তিনি তন্নির্মিত বলিতেন, “কোন বিষয়ে কাহারও অভিমান করিবার অধিকার নাই। অস্ত্র যাহা আছে, কল্যা তাহা না থাকিতে পারে। কখন কাহার মনে কি হয়, কে বলিতে পারে?”

জীবনশিক্ষা, লোকের হিতসাধন, এই সকল সম্বন্ধে তাঁহার নিতান্ত আপত্তি ছিল। ইচ্ছা করিয়া তিনি কখন কাহাকেও কোন কথা কহিতেন না। এক সময়ে ব্রাহ্মণী প্রচারকার্য্যে প্ররুত হইবার নিমিত্ত কত অমুরোধ করিতেন, বলিতেন, “ভাব নিয়ে ঘরে বসে থাক।” পরমহংসদেবকে বার বার এই কথা বলিলে তিনি বিরক্ত হইয়া উঠিতেন। “কালী যাহা করিবেন, তাহাই হইবে।” এই তাঁহার কথা ছিল।

তাঁহার অভিমান না থাকায়, তিনি ইচ্ছা করিয়া, কিস্বা মনে কোন বিষয় সঙ্কল্প করিয়া, কোন কার্য্য করিতে পারিতেন না। যখন যাহা করিতেন, তাহা ভাবে করাইয়া লইত। তিনি উপদেশে বলিতেন, “ঝড়ের এঁটো পাত হওয়া সকলের উচিত। বাতাসে তাহাকে যে দিকে লইয়া যাইবে, এঁটো পাতের এ প্রকার কোন অভিমান থাকিবে না যে, তাহার বিরুদ্ধে কিছু করিবে।” পরমহংসদেব বাস্তবিক এই ভাবেই থাকিতেন। তিনি কখন কাহাকেও কালীর ইচ্ছা ছাড়া কোন কথা আপনি বলিতেন না। অনেক সময়ে লোকে দেখিত যে, তিনি বলিতেছেন, কিন্তু বাস্তবিক তিনি বলিতেন না। একথা সাধারণ লোকেরা বুঝিতে পারিবেন না। তবে আভাসে একটু বুঝাইতে চেষ্টা করি। যেমন কাম ক্রোধাদি উদ্দীপ্ত হইলে মনুষ্যেরা যে সকল কার্য্য করিয়া থাকে, সহজাবস্থায় তাহা তাহারা কখন করিতে পারে না এবং অনেক রিপূর পরাক্রমে কোন প্রকার অবৈধাচরণ করিলে, পরে তাহার জ্ঞান সে আপনি অনুশোচনা করিয়া থাকে, এস্থানে যেমন তাহাকে ভাবে কার্য্য করাইয়া লয়, তেমনি, পরমহংসদেব সকল কার্য্যই ঈশ্বরের ভাবে করিতেন। পূর্বেই

বলিয়াছি, এ কথাটা বুঝা অতিশয় কঠিন । ঈশ্বরের ভাবে তাঁহার কার্য না হইলে অমাত্ম্য কার্য্য করিতে পারে কে ? কি বাল্যকালে, কি কিশোর সময়ে, কি যুবা বয়সে, কি প্রৌঢ়াবস্থায়, তাঁহার যে সকল কার্য্যকলাপ হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমান কালে নিতান্ত অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় ; কিন্তু ঐ সকল ঘটনা কল্পিত নহে, তাহা যথার্থ ই ঘটনাবিশেষ । অমাত্ম্য কার্য্য যে স্থানে হয়, সে স্থানে ঐশ্বরিক শক্তি না বলিয়া আর উপায়ান্তর নাই । এই ঐশ্বরিক শক্তির কার্য্য তাঁহার ভিতর দিয়া সম্পন্ন হইত বলিয়া, যাহা অভাবনীয় ও অচিন্তনীয় বিষয়, তাহাও তাঁহার দ্বারা সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে ।

কথিত হইয়াছে যে, পরমহংসদেব অধিক লেখা পড়া জানিতেন না । এ কথা বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে বলা হইল । সংস্কৃত জানিতেন না ; কিন্তু সকল প্রকার সংস্কৃত শ্লোক তিনি বুদ্ধিতে পারিতেন । কেবল বুঝা নহে, তাহার গূঢ় তাৎপর্য্য বাহির করিয়া দিতেন । ইংরাজী জানিতেন কিম্বা অন্য কোন ভাষা জানা ছিল, তাহার প্রমাণ কিছুই নাই । এই পাণ্ডিত্যে কি-দর্শন, কি জড়বিজ্ঞান, কি মনোবিজ্ঞান, কি ধর্ম্মতত্ত্ব, কি সমাজতত্ত্ব, তাঁহার নিকট কোন তদেরই অভাব ছিল না । যে ব্যক্তি মনোবিজ্ঞানে পণ্ডিত, তাকে অন্য কোন কথা কহিতেন না । যে জড়বিজ্ঞানে পণ্ডিত, তাহাকে তাহারই উপদেশ দিতেন । এই প্রকার পাত্র বিচার করিয়া উপদেশ দেওয়া মনুষ্য-শক্তির বহিভূত কথা । কেবল তাহা নহে । তিনি সময়ে সময়ে শাস্ত্রের মীমাংসাও করিয়া দিয়াছেন । একদা অধরলাল সেন কাশীপুরের মহিমাচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সহিত তত্ত্বের কোন শ্লোক লইয়া বাদানুবাদ করিয়াছিলেন । মহিম বাবু এবং তাঁহার বাটীস্থ জনৈক পণ্ডিত সেই শ্লোকের এক প্রকার অর্থ করিয়া ছিলেন । অধর বাবু তাহার স্বতন্ত্র অর্থ করেন । পরস্পর অমিল হওয়াতে সে ক্ষেত্রে কোন প্রকার মীমাংসা হইল না । অধর বাবু তথা হইতে পরমহংসদেবের নিকট গমন করিয়া সে কথা কিছুই উত্থাপন করিলেন না । কারণ, পরমহংসদেব শাস্ত্র পাঠ করেন নাই । তাহা তাঁহার অধিকার বহিভূত, এই বিশ্বাস ছিল । অধর বাবু বসিয়া আছেন, এমন সময় পরমহংসদেবের ভাবাবেশ হইল । তিনি অধর বাবুকে ডাকিয়া সেই শ্লোকগুলির সমুদয় অর্থ করিয়া দিয়াছিলেন । অধর বাবুর আর আশ্চর্য্যের সীমা রহিল না । নিতান্ত আবশ্যক না হইলে, পরমহংসদেবের কখন শক্তির পরিচয় প্রকাশ পাইত না । এই প্রকার শক্তির বিকাশ হইলে তিনি বলিতেন, “যেমন ছাদের জল নল দিয়া

পড়ে । কখন বাঘের মুখ কিম্বা হানাস্তরে কুকুর অথবা মানুষের মুখের ভিতর দিয়া বাহির হয় । নিয়ম হইতে ছাদের জল দেখা যায় না, কেবল যাহা দিয়া জল পড়ে, তাহাই দেখা যায় । লোকে মনে করে যে, বাঘের মুখের ভিতর দিয়া জল আসিতেছে । তেমনি হরি কথা যাহা বাহির হয়, তাহা হরিই বলেন । আধারটী বাঘ-মুখ-বিশেষ, নলমাত্র ।” পরমহংসদেবের পক্ষে, এ কথা সম্পূর্ণ প্রযোজ্য, তাহাতে তিলাংশ সন্দেহ নাই ।

পরমহংসদেব ঘোর সন্ন্যাসী, ঘোর গৃহী, ঘোর ভক্ত এবং ঘোর জ্ঞানী ছিলেন । তাঁহার কোন দ্রব্যোই প্রয়োজন ছিল না । স্ত্রী বল, পুত্র বল, কন্যা বল, মাতা বল, পিতা বল, ভাই বল, বন্ধ বল, অর্থ বল, কিছুতেই তাঁহার আবশ্যকতা দেখা যায় নাই । কাহারও সহিত কোন সম্বন্ধ রাখিতেন না । কিন্তু যে সকল ব্যক্তি এই প্রকার বিবিধ সম্বন্ধ স্থাপন পূর্বক সংসার করেন, তাহাদের অপেক্ষা তিনি সংসারী ছিলেন । স্ত্রীর কোন সম্বন্ধ রাখিতেন না, তথাপি তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন নাই । কালসাপিনী বলিয়া ঘৃণা করিতেন না । তিরোভাবের দিন পর্য্যন্ত যে কোন হেতুতেই হউক, সঙ্গে রাখিয়া ছিলেন । আমরা শত শত তাঁহার পুত্র রহিয়াছি । আমাদের কল্যাণের জন্ত তিনি যে পরিমাণে কাতর এবং ব্যস্তচিত্ত হইতেন, বাপ মা তেমন কাতর হন না । একদা আমাদের বাটীতে বিষ্টিকা রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়ায়, অল্প দিনের মধ্যে তিনটি সন্তান কালগ্রাসে পতিত হয় । আমরা এই নিমিত্ত একটা রবিবারে তাঁহার নিকটে গমন করিতে পারি নাই । তিনি তাহা জানিতে পারিয়া সুরেন্দ্র বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “এরা আজ আসে নাই কেন ? এদের বড় বিপদ, তুমি যাইয়া সংবাদ লইবে ।” আমরা যখন তাঁহার নিকটে গমন করিলাম, আমাদের জন্ত তাঁহার কাতরতা দেখিয়া মনে করিয়াছিলাম যে, আমাদের পিতা যতদূর দুঃখিত না হইয়াছেন, তাঁহা অপেক্ষা তিনি যে কত গুণে কাতর হইয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না । সন্ন্যাসী তিনি, তাঁহার এ সকল কেন ? মায়িক দুঃখ তাঁহার কেন ? ভাব বুঝিবে কে ? পরক্ষণে তিনিও যেমন হইলেন, আমাদেরও তেমনি পরিবর্তিত করিলেন । ভক্ত, কি অভক্ত, সকলের জন্ত তিনি কাঁদিতেন । একদা কালীবাটীতে একটা কাঙ্গালী তিন চারি দিবস প্রসাদ পাইতে আসিয়াছিল । দ্বারবান তাহাকে তিন দিনের অধিক আসিতে দেখিয়া ধাক্কা দিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিল । এই কথা পরমহংসদেব শ্রবণ করিয়া রোদন করিতে আরম্ভ

করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, “মা ! এ কি তোর বিচার ! আহা ! দুটি অন্নের জন্ত মার খাইল !” তাঁহার এই কথা শ্রবণ করিয়া আমাদের হৃদয় গির্চূর্ণ হইয়া গেল ! আমরাও তাঁহার সহিত কাদিয়াছিলাম। তাঁহার হৃদয় দয়ায় গঠিত ছিল, অথবা যে স্থানে দয়াময় নিজের বসিয়া রহিয়াছেন, সে স্থানের কার্য্য কেন কঠোর হইবে ? তিনি যাহার জন্ত কাতর, তিনি যাহার জন্ত চিন্তিত, যাহার জন্ত তাঁহার চক্ষে জল আসে, তাহার কতদূর সৌভাগ্য ! যাহার হৃদয়ের ব্যথায় তিনি ব্যথিত হন, তাহার দুঃখ কোথায় ? তখনই একটী লোক আসিয়া সংবাদ দিল যে, ত্রৈলোক্য বাবু সেই কাঞ্চালীকে একটি টাকা দিয়াছেন এবং দ্বার তাহাকে কেহ কিছু বলিবে না। পরমহংসদেবের আর হাসি ধরিল না। তিনি আমাদের সামাজিক উন্নতির জন্ত সর্বদা ভাবিতেন। উহার এত টাকায় হইতেছে না, উহার মাসে এত খরচ, উহার কিছু টাকা চাই, ইত্যাকার কতই ভাবিতেন। তিনি যাহা ভাবিতেন, তাহার কার্য্য হইতে কত বিলম্ব ? এ বিষয়ের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। তাঁহার কোন ভক্তের অতি অল্প আয় ছিল। তাহার বেতন বৃদ্ধির জন্ত যখন উপর আফিসে দরখাস্ত যাইল, পরমহংসদেব অপর ভক্তের মুখে সে কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “আহা ! উহার এত টাকার কমে চলে না, বেতন বৃদ্ধি কি হইবে ?” ভক্ত কহিলেন, “মহাশয় তাহার এত চিন্তিত, অবশ্যই হইবে। হইবে কি, হইয়া গিয়াছে।” আশ্চর্য্য ব্যাপার ! সে সময়ে সরকার বাহাদুরের তহবিলে বড়ই ঋণাক্তি। যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্ত সকল ব্যয় কমিয়া যাইতেছিল, কিন্তু তাহার যাহা বৃদ্ধি পাইবার আশা ছিল, তাহার দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। আশ্চর্য্য এই জন্ত বলি, যে যত টাকা প্রার্থনা করে, উপর-ওয়ালারা তাহা কমাইয়া দিতে পারিলে কোন মতে ছাড়ে না, কিন্তু প্রার্থনা অপেক্ষা বেশী দিতে কেহ কি কখন গুনিয়াছেন ? এ ক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছিল।

পিতা মাতা যেমন যে ছেলেটী যাহা ভালবাসে, তাহার জন্ত সেই জিনিষটী সংগ্রহ করিয়া রাখেন, যে জিনিষটি যাহার খাইতে ভাল লাগে, তাঁহার না খাইয়া তাহার জন্ত টাকা দিয়া রাখেন, পরমহংসদেব তাহাই করিতেন। কোন সেবক পরমার খাইতে বড় ভালবাসিত, তিনি তাহার জন্ত তাহা তুলিয়া রাখিয়া দিতেন। কোন কোন ভক্তের বাটীতে বেদানা, মিছরী, বড়বাজারের ক্ষীরের দ্রব্যাদি হয় আপনি খাইয়া দিয়া আসিতেন, না হয় অপরের দ্বারা

পাঠাইয়া দিতেন। এই জন্ত বলি তাঁহার পুত্র কণ্ঠা ছিল। এমনও দেখা গিয়াছে যে, কোন ভক্ত সন্তান লইয়া গিয়াছিল; তাঁহার স্ত্রীকে টাকা দিয়া ছেলেটী দেখিতে বলিয়াছিলেন। তিনি কাহাকে টাকা, কাহাকে জামা, কাহাকে বস্ত্র, যাহার যাহা প্রয়োজন বুঝিতেন, তিনি আপনি তাহা দিয়াছেন। একদিন তাঁহার কোন ভক্তকে কোন কথা না বলিয়া একখানি গরদের কাপড় দিলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি কহিলেন, “দিলাম, লইয়া যাও।” পরে শ্রবণ করা গেল যে, সেই দিন তাহার মাতার একখানি গরদের কাপড় সম্বন্ধে কোন গোলমাল হইয়াছিল। ঘটনাটী ঠিক মনে নাই, তিনি তাহা জানিতে পারিয়া সেই অভাব পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। অনেকে মনে করিতে পারেন যে, তিনি সামান্য দ্রব্য দিয়া ভক্তের কি ভাল করিয়াছেন? ইহার ভিতরে অর্থ আছে। তিনি কহিতেন যে, যাহার যাহা প্রয়োজন, তাহার অধিক হইলে গোলমাল হয়। সাঁকোর জল যেমন এক দিকের মাঠ হইতে অপর মাঠে যায়, ভিতরে কিছু থাকিতে পারে না; ভক্তদিগের পক্ষেও সেই-রূপ জানিবে। আহার বিহনে জীবন মরিবে না। আবার তাহা অধিক হইয়া নষ্টও হইবে না। ইহার দ্বারা রজঃ ও তমোগুণের আধিক্যতা বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

তিনি কাহারও নিকটে কিছু গ্রহণ করিতেন না এবং বলিতেন যে, “আমি কাহারও কিছু গ্রহণ করি নাই।” এ কথা লইয়া অনেক কথাই হইত। তিনি যদিও রাসমণির দেবালয়ে থাকিতেন, কিন্তু তাঁহার কথা প্রমাণ তিনি তথায় কিছু লইতেন না বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, অথচ মন্দিরের সকল দ্রব্যই লইতেন। এই কথায় যে সর্বসাধারণের পক্ষে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? এই নিমিত্ত অনেকে তাঁহাকে দোষারোপ করিত, এখনও করিয়া থাকে। কিন্তু স্থূলদর্শী ব্যক্তিরা মহাপুরুষের চরিত্র যদি সহজে অর্থকরী বিজ্ঞা বুদ্ধিতে ভেদ করিতে পারিত, তাহা হইলে ধর্ম কর্মের শ্রেষ্ঠতা আর থাকিত না। তাহা হইলে কি বর্তমান শতাব্দীর পাস করা বাবুরা নিরক্ষর ব্যক্তির চরণপ্রান্তে পড়িয়া গড়াগড়ি দিত? তাহা হইলে কি কেশব বাবু প্রভৃতি মহাবিদ্বান ব্যক্তিগণ তাঁহার চরণরেণুর প্রত্যাশায় কৃতজ্ঞ হইয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতেন? তাহা হইলে কি প্রতাপ বাবু চরণ যাজ্ঞা করিতেন? তাহা হইলে কি বিজয় বাবু “জয় রামকৃষ্ণের জয়!” ধ্বনি দিয়া রাজপথে নৃত্য করিতে পারিতেন? সে যাহা হউক, পরমহংসদেব

কি কারণে যে, “কাহারও কিছু গ্রহণ করি নাই” কথা ব্যবহার করিতেন, তাহা আমরা তাঁহার নিকট শ্রবণ করি নাই। এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস হয় নাই। আমরা যখন সর্বপ্রথমে তাঁহার নিকটে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করি, সেই সময়ে কয়দিন শনিবারের রজনী শেষ না হইতেই আমরা কলিকাতা হইতে হাঁটিয়া দক্ষিণে গমন করিতাম। মধ্যাহ্নে তথায় প্রসাদ পাইতাম। কয়েক মাস এইরূপে অতিবাহিত হইলে একদিন আমরা পরস্পর কলাবলি করিলাম যে, “বেশ মজা হইয়াছে। পরমহংসদেব কত আদর করিয়া আমাদের আহার করান।” সেইদিন অপরাহ্নে তিনি আমাদের ডাকিয়া কহিলেন, “তোমরা এখানে আহার কর কেন? এস্থান ত তোমাদের জন্ত হয় নাই। সন্ন্যাসী ফকিরের নিমিত্ত হইয়াছে। এ অন্ন খাইলে গৃহীদিগের অনিষ্ট হয়। একদা এক ব্যক্তি এই স্থানে এক ছিলিম তামাক খাইয়া যাইবার সময় একটা পয়সা দিয়াছিল।” আমাদের চক্ৰস্থির হইল, মনে মনে আপনা-দিগকে শত ধিকার দিলাম এবং তদবধি আমরা জলখাবার লইয়া যাইতাম। দোল-পূর্ণিমার পূর্বে রবিবারে আমরা যখন প্রণামপূর্বক বিদায় গ্রহণ করি, তিনি দোলের দিন তথায় ভোজন করিবার নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিবে কে? যে আজ্ঞা বলিয়া স্বীকার করিলাম। কিন্তু বাহিরে আসিয়া কতই বিচার করিলাম যে, যিনি একদিন যাহা করিতে নিষেধ করিলেন, তিনিই আবার আপনি তাহাই করিতে আজ্ঞা দিলেন। কেমন করিয়া এ কথার মীমাংসা হইবে? লোকে যে কথা লইয়া আপত্তি করিত, আমরা তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলাম; কিন্তু তখন কিছুই বুঝিতে পারি নাই। কিছু দিনের পর একদিন পরমহংসদেবের ঐ কথার দুইটা কারণ মনে হইল। প্রথমটী এই যে, ঐ দেবালয়ে রাসমণির কোন সন্ধান নাই। শিবালয় কয়টী তাঁহার নিজ নামে প্রতিষ্ঠিত। তাহাতে তাঁহার সম্বন্ধ আছে, কিন্তু পরমহংসদেবের কোন সংশ্রব ছিল না। কালী ও রাধাকৃষ্ণ গুরুর নামে হওয়ায় রাসমণির সম্বন্ধ ছেদন হইয়া গিয়াছিল। ভোগ রাগ যাহা হয়, তাহা ঠাকুরের জন্ত, সেই প্রসাদে কাহারও নিজ স্বার্থ থাকিতে পারে না। এ হিসাবে তিনি অজ্ঞায় বলিতেন না। কারণ কালীর নামে যে বিষয় আছে, তাহাতে রাসমণি নিজেই নিঃসন্দেহ হইয়া কালীকে প্রদান করিয়াছেন। দান গ্রহণের দোষ শুণ যদি কিছু হইয়া থাকে, তাহা রাসমণি এবং কালীতে হইয়াছে। পরমহংসদেব কেন, যে কেহ সেই বিষয়ের সন্ধান করিবে, তাহা কালীর বুঝিতে হইবে,

কালীর অকর্ণগ্যা সন্তানে এই বিষয় ভোগ করিবে; কিন্তু কৰ্ম্মী-সন্তানেরা তাহাতে ভাগ বসাইলে, অকর্ণগ্যেরা আবার যাইবে কোথায়? এই নিমিত্ত গৃহীদিগের তাহাতে অপরাধ হইবে বলিয়া কথিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, পরমহংসদেব তথায় কিছু দিন চাকরি করিয়াছিলেন। যখন কৰ্ম্ম করিতেন, তখন কার্য্যের বিনিময়ে বেতন এবং খোরাক পোষাক পাইতেন। যে পর্য্যন্ত তাঁহার শক্তি ছিল, সে পর্য্যন্ত পরস্পর বিনিময়ে কার্য্য চলিয়াছিল। যখন অশক্তি হইলেন, তখন তাঁহার পূর্ব্বের কার্য্যকরী শক্তি সমুদয় দেবীর সেবায় ব্যয়িত হইয়াছে জ্ঞান করিয়া, কালীর সেবায়েৎ তাঁহাকে তদবস্থায় যাবজ্জীবন রাখিবার নিমিত্ত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যদিও বাঙ্গালীর পেন্সন দিবার প্রণালী প্রচলিত নাই, কিন্তু একেবারে এরূপ দৃষ্টান্ত যে অপ্রতুল, তাহাও নহে। রামপ্রসাদের ইতিহাসে পেন্সনের কথা উল্লেখ আছে। অতএব পরমহংসদেবের, “কাহারও কিছু গ্রহণ করি নাই,” বলিবার বিলম্ব, অধিকার ছিল। পেন্সন পাওয়া বাস্তবিক দাতব্যের হিসাব নহে। এই নিমিত্ত বলি, পরমহংসদেব এক বিচিত্র প্রকার সন্ন্যাসী—সন্ন্যাসীও বটেন, আবার গৃহীও বটেন।

কথিত হইয়াছে যে, পরমহংসদেব সমুদায় ধৰ্ম্মপ্রণালী সাধন দ্বারা বিশ্লেষণ পূর্ব্বক দুই ভাগে পর্য্যবসিত করিয়াছিলেন। যথা, জ্ঞান বা আত্মতত্ত্ব এবং ভক্তি বা লীলাতত্ত্ব। তিনি জ্ঞানীর শিরোমণি অর্থাৎ জ্ঞান পথে যখন ভ্রমণ করিতেন, তখন সাকার ভাব প্রেম কিছুই স্থান পাইত না। তিনি নির্বিকল্প সমাধিতে নিমগ্ন থাকিতেন। তখন কোন মতে সে সমাধি ভঙ্গ করা যাইত না। এমন কি “ওঁ তৎ সৎ” এর ‘তৎ’ বাতীত ‘সৎ’ শব্দটীও প্রয়োগ করা যাইত না। তিনি তখন সকলই তন্নয়ন দেখিতেন বা বুঝিতেন। সৎ-শব্দের দ্বারা দ্বৈত ভাব আসিয়া থাকে; অর্থাৎ সৎ বলিলে অসৎ শব্দ অল্পমিত হয়। তাঁহার সাধনের মধ্যে সৎ অসৎ একাকার করা ছিল।

লীলা বা ভক্তি পক্ষে তাঁহার জ্ঞান দৃষ্টান্তের প্রভাবে আধুনিক নিরাকারবাদীরাও সাকার ভাব অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি যখন কালীর সহিত কথা কহিতেন, সে কথা শুনিলে কে বলিবে যে, তথায় তিনি নাই। একদা দোলের দিন তিনি কীর্ত্তন করিতে করিতে একটা ধূয়া ধরিলেন, “সব সখীগণ তোরা সাক্ষী থাক্, আজ ফাগু রণে তুমি হার কি আমি হারি!” তখনই নিজে যেন শ্রীমতি হইলেন এবং ক্লৃপকে লক্ষ্য করিয়া ঐ গান করিতে লাগিলেন।

মধ্যে মধ্যে দৌড়াইয়া দিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী অঙ্গুলি দ্বারা কক্ষের বক্ষ-
দেশ স্পর্শ করিয়া, “তুমি হার” এমন ভাবে বলিতে লাগিলেন, যেন সেই দৃশ্যটা
প্রকৃত রাধাকৃষ্ণের ফাওয়া খেলা হইতেছে বলিয়া জ্ঞান হইতে লাগিল।
সে ঘটনা দেখিলে আর মনে হয় না যে, জগতে রাধাকৃষ্ণপ্রেম বিহার হইতে
সর্বোৎকৃষ্ট ভাব আর কিছু আছে। আহা! সে দিনের ব্যাপার এখনও স্মরণ
হইলে আমরা হতবুদ্ধি হইয়া যাই। ভগবান! আমাদের বল দিন, আমাদের
একটু রূপাকণা বিতরণ করুন, যাহাতে এই অদ্ভুত রামকৃষ্ণরচিত কিয়ৎ
পরিমাণেও লিপিবদ্ধ করিতে সক্ষম হই। চক্ষের দেখা, প্রাণের জিনিষ, কিন্তু
শক্তি নাই, ভাব নাই, শব্দ নাই, যে তাহা আভাসেও প্রকাশ করিতে পারি।
একদা শিবপুরনিবাসী শ্রীমাচরণ পণ্ডিত মহাশয় পরমহংসদেবকে জিজ্ঞাসা
করিয়াছিলেন, “মহাশয়! ঈশ্বর দর্শন করিলে কিরূপ অনুভব করেন, আমার
সে কাহিনী শ্রবণ করিতে বড় সাধ হইতেছে।” পরমহংসদেব ঈষৎ হাসিয়া
কহিলেন, “দেখ, একদিন প্রাতঃকালে দুইটা সমবয়স্ক যুবতী পুকুরিণীতে আসিয়া
একজন অপরকে জিজ্ঞাসা করিল, ‘হাঁলা! তোর ভাতার এসেছিল না?’
সে কহিল, ‘হ্যাঁ,।’ সঙ্গিনী কহিল, ‘তুই কেমন সুখ পেলা?’ সে কহিল,
‘সে কথা কি মুখে বলা যায় লা? তোর ভাতার যখন আসবে, তখন তুই
বুঝতে পারবি।’ ঈশ্বরের রূপ কি, কেমন, সে কি বলিবার কথা?’ শ্রীমাচরণ
পণ্ডিত এই কথা শ্রবণ করিয়া রোদন করিয়া উঠিলেন। আমাদের সেই
কথার ভাব আজ স্মরণ হইতেছে! এখন বুঝিতে পারিতেছি, সে বাস্তবিক
সন্তোষের কথা, কথায় বলিবার উপায় নাই।

পরমহংসদেব এইরূপে একদিকে জ্ঞান ও অপর দিকে ভক্তি, উভয়বিধ
মতে কখন কি ভাবে থাকিতেন, তাহা কে অনুধাবন করিতে পারিবে? তিনি
সেইজন্ত কখন জ্ঞানী, কখন ভক্ত এবং কখন এতদুভয়ের সাম্যভাবে অবস্থিতি
করিতেন। এই নিমিত্ত তিনি কখন কখন বলিতেন যে, “বেদ, পুরাণ, তন্ত্রাদি
সমুদায় সত্য।” আবার কোন সময়ে এ সকল উড়াইয়া দিয়া অনন্ত সচ্চিদা-
নন্দে ডুবিয়া বসিয়া থাকিতেন।

তিনি কাহাকেও ঘৃণা করিতেন না। ধনী নির্দানীর প্রভেদ রাখিতেন
না। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ধনীদেব সহিত বড় মিশিতেন না, তাহার কারণ
স্বভাব ছিল। তিনি বলিতেন, “ধনীরা পূর্বের সঞ্চয় হেতু অর্থ পাইয়াছে।
তাহাদের কিছুকাল তাহা ভোগ না হইলে হরিকথা লইবে না। কারণ,

প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ সঙ্কল্পের দাস । যখন সঙ্কল্প ফুরাইয়া আসিবে, তখন তাহাদের ঈশ্বরের দিকে যাইতে চেষ্টা হইবে, তখন তাহাদের চমক ভাঙ্গিবে । ইচ্ছা করিয়া যাহা পাইয়াছে, তাহা ইচ্ছা করিয়াই পরিত্যাগ করিবে । যেমন, যে যুখে কাঁটা ফোটে, তাহাকে সেই মুখ দিয়া বাহির করিতে হয় । যেমন, কেহ সঙ্কল্প সাজিয়া আসরে আসিয়াই কি তাহা ত্যাগ করিতে পারে ? তাহা করিলে রসভঙ্গ হয় । কিয়ৎ কাল রঙতামাসা করিলে তাহার পর আপনি চলিয়া গিয়া রঙকালী তুলিয়া ফেলিবে ।”

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, তিনি ব্যক্তিবিশেষে উপদেশ দিতেন । কাহাকে তিনি সন্ন্যাসী হইতে বলিতেন, কাহাকে গৃহী ধর্মশিক্ষার স্থান বলিয়া উপদেশ দিতেন এবং কাহাকে দিন কতক আশ্রমের অশ্বল খাইয়া আসিতে বলিতেন । সন্ন্যাসীর ভাব তাহাদের শিক্ষা দিতেন, সংসারী একেবারে নিতান্ত অপদার্থ, হেয় বলিয়া তাহাদের বুঝাইতেন, সুতরাং তাহাদের সেই প্রকার সংসার বন্ধমূল হইয়াছে । তাহাদের গৃহে রাখিয়া সংসারকে কেবল সহিত তুলনা দিয়া গিয়াছেন, তাহারা সংসারের ভিতরেই পূর্ণ শান্তি লাভ করিয়া পরমানন্দে দিনযাপন করিতেছে । আর তাহারা দিন কতক আশ্রমের অশ্বল খাইয়া অর্থাৎ সংসার মুখ কি জানিয়াই সন্ন্যাসী হইয়াছে, তাহারা উভয় পক্ষেরই পক্ষপাতী হইয়া আছে । এই প্রকার গাঁহার ভাব, তিনি সন্ন্যাসীও বটেন, গৃহীও বটেন এবং গৃহী-সন্ন্যাসীও বটেন ।

পরমহংসদেব, সর্ব-ধর্ম-সম্বন্ধের ভাব সর্বধর্ম সাধন করিয়া লাভ করিয়াছিলেন । এইজন্য তাঁহার নিকটে অসম্প্রদায়িক ভাব ছিল । তাই সকল ভাবের ব্যক্তির আনন্দ লাভ করিতেন । সুতরাং, পরমহংসদেবের সম্প্রদায় হয় নাই এবং হইবেও না । কিন্তু এক হিসাবে তাঁহার সম্প্রদায় আছে এবং হইবে । অজ্ঞাত সম্প্রদায় যে প্রকার আগন মতকে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা ধাঁটি মনে করেন, পরমহংসদেব তাহা করিতেন না । তিনি চলিত সকল মতকেই সত্য বলিতেন । তাহার ভিত্তি এক ঈশ্বর, সেই ভাব অদ্বান্ত বলিয়া তাঁহার নিকট পরিগণিত হইত । এই ভাবে তাঁহার সম্প্রদায় কিরূপে হইবে ? কিন্তু তাঁহার শিষ্যেরা ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী হইয়াও যখন ঐ কথা কহিবেন, তখন পরোক্ষ সম্বন্ধে এক মতে এক ভাবে কাণ্ড হইবে, সুতরাং তাহাকে একটা সম্প্রদায় বলিলেও ভুল বলা হইবে না । এ প্রকার সম্প্রদায়কে সম্প্রদায় বলা যায় না । তাহাতে সম্প্রদায়ের গোড়ামী থাকিবে না, দ্বৈতবাদী থাকিবে-

না, পরস্পর টানাটানি থাকিবে না। বিবাদ হয় কেন? একজন বলিল, তোমার ধর্মভাব ভুল। বিশ্বাসীর বিশ্বাস সামান্য কথা নহে। সে অমনি লগুড়াহত নিদ্রিত কালভুজঙ্গের ত্রায় চক্র ধরিয়া তখনই তাহার আততায়ীর বক্ষে দংশন করে। পরিশেষে আঘাত ও দংশন জ্বালায় উভয়ে জ্বলিয়া মরে। উভয়ের অশান্তি-অগ্নিতে উভয়কে পুড়িয়া মারে। পরমহংসদেব যে অসাম্প্রদায়িকতা শিক্ষা দিয়া সম্প্রদায় গঠন করিবার পত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহা যখন সকলে প্রাণে প্রাণে অনুধাবন করিতে পারিবেন, তখন যে কি সুখ ও শান্তির রাজ্য স্থাপন হইবে, তাহা মনে করিলেও হৃদয় নৃত্য করিতে থাকে। ইহার ভিতরে কটিন কিছুই নাই। কেবল নিজ নিজ অভিমান কিঞ্চিৎ ধর্ম করিতে পারিলেই হয়। দুই পাতা গীতা উর্নাইয়া যত্নপূর্ণ গীতাই অবলম্বন করিতে আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা হইলে সে কথা নিতান্ত উপহাসজনক হইয়া দাঁড়াইবে। যত্নপূর্ণ ভাগবতের স্বল্পবিশেষ পাঠ করিতে শিখিয়া কেবল লীলাকথা ছড়াইয়া বেড়ান হয়, তাহা হইলে কিরূপে সকলে তাহার অনুবর্তা হইতে পারিবে। ঘোষপাড়ারা ত জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছেন। ফি কথায় টোকর—প্রত্যেক ধর্মের প্রতি বিদ্রোহাত্মক কথা। কেনরে বাপু! যাহা ভাল বুঝিয়াছ কর, অস্ত্রের বিশ্বাসে হস্তক্ষেপ কেন? ব্রাহ্মেরা দেশ ছাড়া করিতে উদ্বৃত্ত হইয়াছেন। তোমরা পরিত্রাণ পাইয়া থাক, ভালই। আমরা সকলে না হয় নিম্নগতি লাভ করিব—বিবাদ কেন? গালাগালি কেন? আর কি কার্য্য নাই? সাকার কি করিয়াছেন? সাধ্যমত চেষ্টা করিতে ক্রটি হইতেছে না; কিন্তু করিয়াছ কি? বৌদ্ধধর্ম এক সময়ে প্রবল হইয়াছিল; কিন্তু তাহা অস্ত্র কোথায়? তাহা চীন, বর্ম্মা প্রভৃতি দেশ আশ্রয় করিয়াছে। সাম্প্রদায়িকতা দ্বারা কোন পক্ষেরই লাভ নাই, সমূহ অমঙ্গল। উভয়ের উদ্দেশ্য ধর্ম, উভয়েই তাহা করিতেছে। উভয়ের উদ্দেশ্য শান্তি, তাহাও হইতেছে। যদি না হইত, যত্নপূর্ণ বিশ্বাসীর প্রাণে আরাম না থাকিত, যত্নপূর্ণ বিশ্বাসীর বিশ্বাসে প্রকৃত ঈশ্বর-ভাব না থাকিত, তাহা হইলে আজ কি প্রাচীন হিন্দুধর্ম হিন্দুস্থানে অপ্রতিহত প্রভাবে বিরাজ করিতে পারিত?

সত্য কখন নষ্ট হইবার নহে। যেমন, জড়জগতের জড় পদার্থ কখন বিনষ্ট হয় না। কোহিনুর অত্মপি ত্রিটিস্ মন্তকে দেদীপ্যমান রহিয়াছে; তাহার ধর্ম সমভাবে রহিয়াছে; কিন্তু হিন্দুস্থানে নাই—নাই বলিয়া কি কোহিনুরের

অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে ? হিন্দুর বিশ্বাস অবিকল সেই প্রকার। হিন্দু, বিজাতীয় অমুকরণ করিতে শিখিয়া আপন বাস, আপন রীতি, আপন নীতি, আপন ধর্ম ছাড়িল, সে ভাব অপর স্থানে যাইয়া প্রকাশ পাইবে। জড়জগতের রূঢ় পদার্থ যেমন স্বভাবসিদ্ধ, ভাব-রাজ্যের ভাবও তেমনি রূঢ়ধর্মাক্রান্ত। আমার ঘরের রূপা সোনা বিক্রয় করিলাম, আমি নিঃস্ব হইলাম, তাই বলিয়া রূপা সোনা অদৃশ্য হইয়া যাইবে ? না, কোথাও না কোথাও, কোন না কোন প্রকারে অবশ্যই থাকিবে ? এই নিমিত্ত বলা হইতেছে যে, কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান, কি বৌদ্ধ, কি অন্ত মতাবলম্বী, কেহ কাহার ভাবে নিন্দা কিম্বা আপন ভাবে কাহাকে আনিবার নিমিত্ত বন্ধপরিকর হইও না। যেমন সকলে এক জাতীয় পদার্থসম্মত হইয়া স্ফীলকার, ভিন্নভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, ধর্ম-ভাবও সেইরূপ সকলের স্বতন্ত্র জানিতে হইবে। মাতাল যেমন সকলকে মাতাল করিতে পারে না, ঝাঁহারা সুরা স্পর্শ না করেন, তাঁহারাও মাতালদের আপন ভাবে পরিবর্তন করিতে সক্ষম নহেন। সাধু চোরকে চুরি করা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারেন না, চোরও সাধুকে আপন মতাবলম্বী করিতে সমর্থ হয় না ; সেইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি স্বভাবগত ধর্ম জন্মকালেই প্রাপ্ত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে। ঈশ্বর সকলের পরিত্রাতা। তিনি তাহার ব্যবস্থা না করিয়া কি প্রেরণ করিয়াছেন ? অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বক্তৃতার হিল্লোলে অনেকেই আপন বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কার্য করিয়া পরিশেষে পরিতাপযুক্ত হইয়া নিজ পূর্বভাবে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজে এ প্রকার দৃষ্টান্তের অপ্রতুল নাই। এজন্য বলিতেছিলাম যে, পরমহংসদেবের ধর্মভাব সকলেরই কল্যাণকর। অনেকের মুখে শ্রবণ করা যায় যে, “একজনকে ডুবিয়া যাইতে দেখিলে আর একজন কি তাহাকে উত্তোলন করিলে না ? দেখিতেছি যে, সকলে ভ্রমাক্ত হইয়া কতকগুলি কুসংস্কারের কুহকে কিংকর্তব্যবিমূঢ়প্রায় বিবৃণ্ডিত হইয়া বেড়াইতেছে।” আমরা এ সকল বিষয়ে এক্ষণে প্রবৃত্ত হইব না, তাহা স্থানান্তরে আলোচনার বিষয়। একধার আলোচনা করিতে হইলে আর একখানি পুস্তক লিখিতে হয়, তাহা পরের কথা। ফলে, পরমহংসদেব যে কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা সুবোধ সুবুদ্ধি এবং পরিপক্ব-মস্তিষ্ক-সম্পন্ন ব্যক্তি-মাত্রেরই অতি আদরের সহিত হৃদয়ে যে ধারণা করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে আজ কাল অপরিপক্ব যুবকদিগের হাতে লেখনী পড়িয়া

বিভ্রাটের দ্বিতীয় পন্থা হইয়াছে । ঈহাদের অত্মাপি ধর্ম প্রয়োজন হয় নাই, ঈহারা ধর্মের লাভালাভ কি, তাহা তিলমাত্রও বুঝিতে পারেন নাই, তাঁহারা ধর্ম লইয়া নাড়াচাড়া ও মতামত প্রকাশ করিতে চাহেন । তাঁহাদের দ্বারা অনেক ব্যক্তির দিক্‌ভ্রম হইয়া থাকে ।

এক্ষণে কথা হইতেছে, পরমহংসদেব কোন্‌ শ্রেণীর ব্যক্তি ?

অনেকের বিশ্বাস এবং আমাদের সিদ্ধান্ত যে, পরমহংসদেব সাধারণ সাধু-কিছা সিদ্ধপুরুষ নহেন । চৈতন্য, মহম্মদ, ঈশা প্রভৃতি যে শ্রেণীর ব্যক্তি, রাম-কৃষ্ণও সেই শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া ধর্মরাজ্যের প্রত্যেক ব্যক্তির মত । হিন্দুধর্ম-সংক্রান্ত সাধু শাস্ত্রেরা একথা স্বীকার করিবেন ; তাহাতে কোন কথা না হইতে পারে, কিন্তু অল্প ধর্মসংক্রান্ত ব্যক্তির যখন সিদ্ধপুরুষ হইতে স্বতন্ত্র শ্রেণীর বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন, তখন সে কথা নিতান্ত উপেক্ষার বিষয় নহে । কেশব বাবুর মনোভাব ইতিপূর্বেই বলা হইয়াছে । সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর নিকটে আমরা একদিন পরমহংসদেবের ধর্মভাব বিষয়ে জিজ্ঞাসা হইয়া গমন করিয়াছিলাম । তাঁহার কথায় বলিতে কি, পরমহংসদেবের প্রতি আমাদের ভক্তি সহস্রগুণে বৃদ্ধি হইয়াছিল । তাঁহার সে দিনকার সেরূপ কথা না শুনিলে, হয় ত, পরমহংসদেবকে বিশ্বাস করিতে আমাদের আরও বিলম্ব হইত । তিনি বলিয়াছিলেন যে, “পরমহংসদেব যাহা উপদেশ দেন, সে সকল কথা কোন না কোন পুস্তকে লিখিত আছে । সেজ্ঞা তাঁহার মহত্ত্ব না থাকিতে পারে, তবে মহত্ত্ব কোথায় ? তিনি যে অমুরাগে গঙ্গাতীরে পতিত হইয়া মা ! মা ! বলিয়া কাঁদিতেন, সে অমুরাগ কাহার আছে ? এই প্রকার অমুরাগ চৈতন্যের ছিল । তিনি কৃষ্ণদর্শনের জ্ঞান কেশোৎপাটন এবং মুখঘর্ষণ করিতেন । এইরূপ অমুরাগ ঈশার ছিল । তিনি চল্লিশ দিন অনাহারে ছিলেন । এইরূপ অমুরাগ মহম্মদের ছিল । তিনি গুহাভ্যন্তরে বসিয়াছিলেন, তাঁহার স্ত্রী নিকটে যাওয়ায়, তাঁহাকে তরবারি দ্বারা কাটিতে আসিয়াছিলেন । ঈশ্বরের জ্ঞান আত্ম-সমর্পণ, ঈশ্বরের জ্ঞান জগৎ-সুখে জলাঞ্জলি দেওয়া, এমন অমুরাগ নিতান্ত বিরল । ঈশার উপাসকেরা ঈশাকে বলিয়াছিলেন, তুমি আমাদের লবণ স্বরূপ । কোন পদার্থ লবণ বিরহিত হইলে যেমন আত্মদাবিহীন হয়, তেমনি প্রকৃত সাধু সাধারণ জীবের বিষয়াত্মক মনে প্রেম শিক্ষা দিয়া-তাঁহাদের জীবনের বলাধান করিয়া থাকেন । পরমহংসদেবও তদ্রূপ । এমন ধর্মাত্মা চারিশত বৎসরান্তে যে প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন, সে দেশে ধর্মের অভাব হয় না।”

পরমহংসদেবের জনৈক ভক্ত গাজীপুরের পওহারীবাবা নামক প্রসিদ্ধ সিদ্ধযোগীর নিকটে গমন করিয়াছিলেন। তিনি পরমহংসদেবের নাম শ্রবণ করিয়া কহিয়াছিলেন, তিনি ত অবতার! এই সাধুর নিকটে পরমহংসদেবের একখানি ফটোগ্রাফ ছিল। পরমহংসদেব এই নিমিত্ত হিন্দু মতে অবতার-বিশেষ, সাধু কিম্বা ভক্ত নহেন এবং অল্প শ্রেণীর মতে, তিনি সাধারণ সাধু অপেক্ষা যে উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তির। মধ্যে মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া আচার্য্যবিশেষে কার্য্য করিয়া ধর্ম্মতাবের তরঙ্গ উঠাইয়া দিয়া থাকেন, রামকৃষ্ণ পরমহংস-দেব সেই শ্রেণীর ব্যক্তি ছিলেন। ফলে, উভয় শ্রেণীর মত এক প্রকারই দাঁড়াইতেছে। কেবল কথার অর্থের কিঞ্চিৎ তারতম্য আছে। সে যাহা হউক, আমরা সর্ব্ব প্রথমে অবতার কাহাকে বলে, তাহার আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

আমাদের শাস্ত্রের আঁতাসে দুই প্রকার অবতারের বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রথম, বিশেষ অবতার এবং দ্বিতীয়, ঋণাবতার। প্রথম শ্রেণীর মধ্যে দশ অবতারের উল্লেখ আছে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে অবতারের পরিমাণ করা হয় নাই, তাহা সংখ্যাভীত। এই নিমিত্ত প্রয়োজনানুসারে নূতন অবতার অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ কহিয়া গিয়াছেন যে, শিষ্টের পালন এবং দুষ্টির দমনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি। এই নিমিত্ত নূতন অবতার না হইবার কোন কারণ নাই। অবতার কাহাকে কহে? যেমন জড় জগতে সকল প্রকার পদার্থই প্রস্তুত হইয়া আছে, কিন্তু সাধারণ লোকে তাহা সম্পূর্ণরূপে অবগত নহে। যখন কোন অজ্ঞাত পদার্থ কোন ব্যক্তির দ্বারা প্রকাশিত হয়, সেই ব্যক্তিকে আবিষ্কারক কহা যায়। যাহারা তাঁহার উপদেশ মতে উহা শিক্ষা করিয়া থাকে, তাহাদিগকে সেই বিষয়ে পণ্ডিত কহে। চৈতন্য রাজ্যেও তদ্রূপ। অবতারের আবিষ্কারকদিগের ঞ্চায় এবং সিদ্ধপুরুষেরা পণ্ডিতদিগের সমতুল্য। যেমন আবিষ্কারকের সংখ্যার সীমা নাই এবং তাহা হইবার নহে। কারণ, কে কখন কোন পদার্থ আবিষ্কার করিবেন, তাহা কে বলিতে পারে? সেই প্রকার অবতারেরও সীমা হইতে পারে না। ভগবান্ বিশ্বপতি, তাঁহার বিশ্ব সংসারের অনন্ত দ্বাপারে ও অনন্ত কাণ্ডকারখানায় কোথায় কোন সময়ে কিরূপ প্রয়োজনানুযায়ী কার্য্য করেন বা করিবেন, তাহা মানুষ কখন ইয়ত্তা করিতে পারে না এবং তাহাতে প্ররাস পাইলেও মূর্খতার প্রকাশ পাইয়া থাকে। তবে

দূরদর্শী ব্যক্তির কার্যের পদ্ধতি দেখিয়া আশাসে কিছু বলিতে পারেন । তাহা সর্বদা সম্পূর্ণ হইতে পারে না এবং হইতেও দেখা যায় না ।

দেশ কাল পাত্র বিচার-পূর্বক অবতারের প্রয়োজন হইয়া থাকে । যখন অধর্মের প্রাবল্য ও ধর্মের সঙ্কুচিতাবস্থা উপস্থিত হয়, তখনই অবতারের প্রয়োজন হইয়া থাকে । যখন ধর্মের নামে অধর্মের কার্য হইতে আরম্ভ হয়, যখন লোকে পাপের সীমা অতিক্রম করিয়াও যাইতে উদ্বৃত্ত হয়, যখন প্রত্যেক ব্যক্তি ধর্মের বর্ণমালা না পড়িয়া ধর্মোপদেষ্টা হইয়া দাঁড়ায়, যখন লোকে শাস্ত্র-বাক্য বিকৃত করিয়া আপনার সুবিধামত অর্থ করিয়া অনর্থপাত ঘটাইতে আরম্ভ করে, তখনই ধর্ম-বিপ্লব কথা যায় এবং সেই বিপ্লবের তাড়নায় প্রকৃত ধার্মিকেরা নিতান্ত ক্রেশ পাইতে থাকেন । ধর্মরাজ্যের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে দেখা যায় যে, যখন কোন অবতার আবির্ভূত হইয়াছেন, তখনকার অবস্থা অবিকল ঐ প্রকার হইয়াছিল । যখন কংসের অধ্যক্ষ্যচারে পৃথিবী উত্যাক্তা ও উৎপীড়িতা হইয়াছিলেন, সে সময়ে ভূভারহারী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম-স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন । রাবণের উৎপাতে রামচন্দ্রের অবতরণ । যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদিগের অত্যাচারে পশু হণন নিবারণের নিমিত্ত বুদ্ধের জন্ম । অদ্বৈত জ্ঞান বিলুপ্তপ্রায় হইয়া পৌরাণিক তেত্রিশ কোটি দেব দেবার ভাব বিকৃত হওয়ায় শঙ্করের উদয় । তান্ত্রিক মতের বামাচারপদ্ধতির কদাকার শ্রোত প্রবাহিত হওয়ায় শ্রীগোরাঙ্গদেব হরিনাম বিতরণ করিয়া গোরাঙ্গীয় প্রণালী প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন । বর্তমান ভাব-সঙ্কর কালে প্রকৃত ধর্মভাব পুনঃ স্থাপন হওয়া প্রয়োজন, তাহার সন্দেহ নাই । এই নিমিত্ত এখন অবতারের প্রয়োজন । আমরা প্রথমে পরমহংসদেবকে সাধুর হিসাবে পর্যালোচনা করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিতেছি । সাধু যাহাদের বলে, তিনি তাহা ছিলেন না । তিনি যদিও পূর্বপ্রচলিত ধর্মপ্রণালী সাধন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কখন আবদ্ধ থাকিতেন না । শাক্ত হউন, শৈব হউন, বৈদান্তিক হউন, কিম্বা অগ্নি কোন মতাবলম্বী হউন, তাঁহারা কেহ কখন তাঁহাদের মত পরিত্যাগ করিতে পারেন না । কারণ, মনুষ্য খণ্ড এবং ভাব অনন্ত । এই নিমিত্ত আমাদের দেশে যিনি যখন যে মতে সাধু কিম্বা সিদ্ধ হইয়াছেন, তিনি সেই মতের শিষ্যই করিয়া গিয়াছেন । পরমহংসদেবের তাহা ছিল না । এই নিমিত্ত তাঁহাকে সিদ্ধ বলা যায় না । সিদ্ধ বলিলে যাহাকে বুঝায়, তিনি কিন্তু তাহা ছিলেন এবং সিদ্ধপুরুষেরা যাহা নহেন, তিনি তাহাও ছিলেন । অর্থাৎ সকল প্রকার মতে

তাঁহার অধিকার ছিল। যে মতে যে কেহ সাধন ভজন করিবার উপায় জিজ্ঞাসা করিয়াছে, তিনি তখনই তাহার বাসনা পূর্ণ করিয়াছেন এবং যে কেহ সাধন কার্যে অশক্ত হইয়াছে, তিনি নিজের তাহা সম্পন্ন করিয়া দিয়াছেন। এ প্রকার সিদ্ধপুরুষ কস্মিন্ কালে কেহ দেখেন নাই এবং শ্রবণও করেন নাই। এক ব্যক্তি মুসলমানকে মুসলমান ধর্ম্মে শিক্ষা দিতেছেন, সেই ব্যক্তি খৃষ্টানকে উপদেশ দিতেছেন, এবং সেই ব্যক্তিই আবার হিন্দু ধর্ম্মের কাণ্ড, শাখা এবং প্রশাখা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের গুরুরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। এ প্রকার সিদ্ধপুরুষ কোন্ জাতিতে এবং কোন্ সম্প্রদায়ে ছিলেন বা আছেন? স্মৃতরাং, তিনি সাধারণ সিদ্ধপুরুষ নহেন। কিন্তু তিনি যে সকল মতেই সিদ্ধ ছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। যে সকল সম্প্রদায়দিগের সহিত পরম্পর কস্মিন্ কালে মিল নাই এবং তাহা হইবার সম্ভাবনা নহে, যথা শাক্ত ও বৈষ্ণব, হিন্দু এবং মুসলমান, ইত্যাদি এ প্রকার বিভিন্ন মতের লোকেরাও তাঁহার নিকটে তৃপ্তিলাভ করিতেন। কেবল তৃপ্তি নহে, সাধন লব্ধ বস্তু লাভ করিয়াছেন। কেবল তাহাও নহে, তাঁহাকে সেই সেই ভাবের অদ্বিতীয় গুরুরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এ প্রকার সিদ্ধপুরুষের বিবরণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। এক্ষণে কথ্য হইতেছে, তবে তিনি কি? কোন্ শ্রেণীর ব্যক্তি? সাধারণ সিদ্ধপুরুষ নহেন। তিনি মনুষ্য হইয়া এত ভাব, এত মত, মনুষ্য যাহা কখনও সাধন করিতে সক্ষম হয় নাই, তাহা আয়ত্ত করিলেন কিরূপে? পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, তোতাপুরী ৪১ বৎসরে কুম্ভকাদি সাধন করিয়া সমাধি প্রাপ্ত হন। পরমহংসদেব তাহা তিন দিনে সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। এ সামান্য রহস্যের কথা নহে! একথা সাধু ব্যতীত কি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী অথবা তৎপল্লিষ্ট ব্যক্তির মস্তিষ্কে প্রবেশ করিবে? না আকাট সাম্প্রদায়িক গোড়া-দিগের বুদ্ধি-বৃত্তি ধারণা করিতে সক্ষম হইবে? হঠাৎ যোগের একটী আসনে সিদ্ধ হইতে হইলে ক্রেশের পরিসীমা থাকে না, তাহা যাহারা করেন, তাঁহারা ইজ্ঞানেন। প্রাণায়ামের বায়ু ধারণা করিতে কত লোকের কাশ রোগের উৎপত্তি হইয়া গিয়াছে। নেতি ধৌতি প্রক্রিয়ায় অন্তরোগে কত সাধকের জীবনান্ত হইয়া গিয়াছে। এই সকল ক্রিয়ায় সিদ্ধ হইলে, তবে মনঃসংযম হইতে পারে এবং সেই সংযত মন ক্রমে সমাধি প্রাপ্ত হয়। অতএব সমাধি কথাটা কথার কথা নহে। যত প্রকার সাধন আছে, তাহাদের প্রত্যেকটী নিতান্ত ক্রেশকর। সামান্য বর্ণপরিচয় শিক্ষা করিতে কত ক্রেশ, সামান্য অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা

করিতে কত যত্নগা পাইতে হয়, তখন ঈশ্বর-সাধনা কি মুখের কথা ? না কেবল বিচারের বিষয় ?

পরমহংসদেব প্রত্যেক সাধনপ্রণালীতে সিদ্ধ ছিলেন, তাহার আরও প্রশংসা আছে । যে ব্যক্তি যে বিষয়ের বিচক্ষণ, সে ব্যক্তি সেই বিষয়ের উপদেশ এমন সরল ভাবে প্রদান করিতে পারেন যে, তাহা পঞ্চম বর্ষীয় বালকেও বুঝিতে পারে এবং যে বিষয়ে যে নিজে অজ্ঞ, সে তাহা কাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেও, কিছুই বুঝাইতে পারে না । আমি কাণী চক্ষু দেখি নাই । আমার দ্বারা কাণীর বর্ণনা যেরূপ হওয়া সম্ভব, অনভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা উপদেশও তদ্রূপ । পরমহংসদেব গভীর ব্রহ্ম-তত্ত্ব, চলিত ভাবে চলিত রহস্য-চ্ছলে বুঝাইয়া দিয়াছেন, এই জন্ত তিনি সিদ্ধ ছিলেন । যে ব্যক্তি সৰ্ব্ব ধৰ্ম্মে সিদ্ধ, তিনি কে ? তাঁহাকে সাধারণ সাধু বলা যায় না । সিদ্ধপুরুষদিগের নিকটে সাধন ভজন আছে । তথায় কেহ শিষ্য হইলে তাহাকে নিয়মিত সাধন ভজন করিতে হয়, কিন্তু পরমহংসদেবের নিকট তাহা ছিল না । সকলকেই বিনা সাধনে ও ভজনে তত্ত্বজ্ঞানী করিতে চাহিতেন, কিং কালের বিচিত্র গতি, তাহা সকলের মনোমত হইত না । এমন কি, কত লোকের জপের থলি তিনি নিজে কাড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছেন, সহস্রবার বলিয়াছেন, “বিশ্বাস কর, কোন চিন্তা নাই, আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা কখন মিথ্যা হইবার নহে ।” তাহার কোন মতে সে কথা লইল না । পুনরায় সাধন ভজন আরম্ভ করিল । তিনি আক্ষেপ করিয়া কতবার বলিয়াছেন, “গুরু ক্লক, বৈষ্ণবের,তিনের দয়া হ’ল,একের দয়া না হ’তে জীব ছারে-খারে গেল ।” তথাপি তাঁহার কথা লইল না । সময়ে সময়ে বলিতেন, “এসে ঠেকেছি যে দায়, সে দায় কব কায়, যার দায় সেই জানে, পর কি জানে পরের দায় ।” লোকে বিশ্বাস করিয়াও করিতে পারিল না । যাহারা বিশ্বাস করিয়াছে, অজ্ঞ তাহার সুখ দুঃখ সুসমভাবে সহ করিয়া বাইতেছে । সম্পদে যেমন, বিপদেও তেমন । সম্পদে তাঁহাকে মঙ্গলময় বলিয়া যেমন আনন্দ করিতে পারে,বিপদেও তেমনি তাঁহাকে মঙ্গলময়রূপে দর্শন করে । এই বিশ্বাসী ভক্তদিগের সাধন নাই, ভজন নাই, তথাপি পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানী । তাঁহার প্রসাদে যাহা হইবার নহে, তাহাও স্বচ্ছন্দে হইয়া গিয়াছে । অতএব তিনি সাধারণ সাধু কিম্বা সিদ্ধ ছিলেন না । সিদ্ধ ব্যক্তিদিগের নিকট পবিত্রতা সৰ্ব্বতোভাবে প্রয়োজন । অপবিত্র কিম্বা দুষ্টব্রিত্ত পাষণ্ডদিগের তথায় গমন করিবার অধিকার নাই । তথায় কার্য্য এবং

অকার্য্য বলিয়া দুইটা তালিকা আছে। কতকগুলি কার্য্য করিলে পুণ্য হয় এবং কতকগুলি কার্য্য দ্বারা পাপ হয়। কতকগুলি কার্য্য নিষেধ এবং কতকগুলি কার্য্য প্রতিপালন করিতে হয়। সকল সম্প্রদায়ে কার্য্যের নিয়ম আছে। পরমহংসদেবের নিকটে তাহাও ছিল এবং তাহার বহির্ভূত ভাবেও কার্য্য হইত। সমাজ ছাড়া, ধর্ম্ম ছাড়া, জ্ঞান ছাড়া, কর্ম্ম ছাড়া পাষণ্ডিগের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্তের দ্বারা তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব এ প্রকার শক্তি সাধারণ সাধু বা সিদ্ধপুরুষদিগের হইতে পারে না। তাহার দৃষ্টান্তও এ পর্য্যন্ত কেহ প্রাপ্ত হন নাই। সিদ্ধ বা সাধু ব্যক্তিরা যে অন্তর্যামী হইয়া থাকেন, তাহার প্রমাণাভাব; কিন্তু তিনি অন্তর্যামী ছিলেন, তাহার পরিচয় অগ্রেই দিয়াছি। তিনি অঘটন সংঘটন করিতে পারিতেন, তাহা ভক্তের বিশ্বাসের জন্য কখন কখন দেখাইয়াছেন, কিন্তু এ প্রকার শক্তি দেখান তাঁহার নিতান্ত অনিচ্ছাক্রমেই হইত। ..

আমাদের শাস্ত্রে যদিও লিখিত আছে যে, সেকালের মুনি ঋষিরা যোগবলে ত্রিভুবন দেখিতে পাইতেন। স্মরণ্য, তাঁহারা প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরের সমাচার প্রাপ্ত হইতে পারিতেন। মুনি ঋষিরা মনুষ্য, অতএব অন্তর্যামী হইলে সিদ্ধ বা সাধু বলা যাইবে না, তাহার হেতু কি? মুনি ঋষিরা সাধন করিয়া সে শক্তি পাইতেন এবং যোগাবলম্বন ব্যতীত সে শক্তি থাকিত না, কিন্তু পরমহংসদেবের ভাব স্বতন্ত্র প্রকার ছিল। তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি সম্বন্ধে যে কয়েকটা দৃষ্টান্ত পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে যোগাবলম্বন কিম্বা কোন প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা যে অপরের মনোভাব জ্ঞাত হইতেন, এ প্রকার কোন ঘটনা প্রকাশ নাই। এই নিমিত্ত তাঁহাকে সাধারণ সিদ্ধ শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। যদিও কেহ কেহ বলেন যে, সিদ্ধপুরুষেরা মনের কথা বলিতে পারেন, তাহা স্বীকার করিলেও, সকল শক্তির সমষ্টি ধরিলে মিলিবে না। সিদ্ধ ব্যক্তিদিগের যে সকল শিষ্য থাকে, তাহারা স্থানান্তরে ইচ্ছা করিলে গুরুর সাক্ষাৎকার পাইতে পারে না। এ প্রকার প্রবাদ আছে যে, কোন কোন শিষ্য ভক্তির জোরে গুরুর দর্শন পাইয়াছেন। সে ক্ষেত্রে ভক্তের বাহ্য পূর্ণ হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার গুরু সে বিষয় কিছুই জানিতে পারেন নাই। ভগবান্ গুরুর কার্য্য সম্পন্ন করেন। পরমহংসদেবের তাহা ছিল না। তিনি কখন ঢাকায় যাইয়া বিজয় বাবুর সম্মুখে বসিয়াছেন, আবার কখন রানিগঞ্জের পাশাড়ে বিষ্ণুর নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন। কখন

বলিতেন যে, “আমি স্বপ্নে দেখি যে, কত সাধু ভক্ত আমার নিকটে আসে।” আবার সাধু ভক্তেরা কহিতেন যে, “পরমহংসদেব আমাদের নিকটে সর্বদাই আগমন করিয়া আমাদের কৃতার্থ করিয়া যান।” তাঁহার সেই চৌদ্দপোয়া দেহটা এক স্থানে রাখিয়া এক সময়ে চারিদিকে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন, ইহা সাধারণ সিদ্ধ ব্যক্তির শক্তিতে সম্বলান হয় না।

সিদ্ধব্যক্তির ঐশ্বর্যের ঐশ্বরিক শক্তি কিঞ্চিৎ লাভ করেন বলিয়া, তাঁহাদের মধ্যে সেই শক্তির বিকাশ কখন কখন দেখা যায়। কিন্তু তাঁহাদের ভিতর দিয়া যে শক্তির কার্য হয়, তাহা হইতে পরমহংসদেবের শক্তির কার্য স্বতন্ত্র প্রকার। সিদ্ধব্যক্তির নিকটে যে যাহা প্রার্থনা করে, তিনি প্রসন্ন হইলে নিজ ক্ষমতামুসারে তাহা সম্পূর্ণ করিতে পারেন। যেমন কেহ পুত্রার্থী হইলে পুত্র পায়, ধন চাহিলে ধন পায় এবং সাধন ভজন করিতে চাহিলে, তাহাও পাইয়া থাকে। কিন্তু এক সময়ে ঐশ্বর্য্য এবং সাধন, তাঁহার প্রদান করিতে পারেন না। পরমহংসদেবের সে শক্তি ছিল। এই মর্মে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। পূর্বে নেপালের রাজপ্রতিনিধি বিশ্বনাথের কথা উল্লেখকালীন বলা হইয়াছে যে, তিনি সর্বপ্রথমে বৃহদ্রথ শালকর্ত্তের কারখানায় গোমস্তাবিশেষ ছিলেন। পরমহংসদেবের নিকট যখন যাতায়াত করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহাকে তহবিল তছরূপ অপরাধে নেপাল দরবারে হাজির হইবার জ্ঞাপনা করা হইয়াছিল। উপাধ্যায়ের মন্তকে এই সংবাদ অশনিপতনপ্রায় বোধ হইল। তিনি স্পষ্ট বুঝিলেন যে, তাঁহার সর্বনাশ উপস্থিত। কি করিবেন, কোথায় যাইবেন, ইত্যন্তঃ চিন্তা করিয়া তিনি পরমহংসদেবের শরণাপন্ন হইলেন এবং চরণে পতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। পরমহংসদেবের দয়া হইল। তিনি বলিলেন, “কালীর ইচ্ছায় আবার তুমি আসিবে।” তিনি কখন নিজ শক্তি দেখাইতেন না। বিশ্বনাথ নেপালে যাইয়া এমন হিসাব নিকাশ দিয়াছিলেন যে, তিনি পুনরায় রাজপ্রতিনিধি হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। উপাধ্যায় ছিলেন রাশাল, হ’লেন রাজা। কিন্তু তিনি বিষয়ে লিপ্ত হইয়াও নিতান্ত ধর্মপরায়ণ ছিলেন। এই প্রকার দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি আছে, তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি করা নিম্নয়োজন। এ প্রকার শক্তি কি সাধারণ সিদ্ধপুরুষে সম্ভবে?

সিদ্ধপুরুষেরা মনে করিলেই লোকের মন পরিবর্তন করিয়া দিয়া তাহাকে একেবারে অন্য প্রকার ছাঁচে ঢালিয়া নূতন গঠন দিতে পারেন না, এ কথা

অস্বীকার করে কে ? সিদ্ধপুরুষেরা আপন ভাবে, বোধ হয়, চেষ্টা করিলে, আর একজনকে পরিবর্তিত করিতে পারেন, কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিকে নূতন নূতন ভাবে রঞ্জিত করা তাঁহাদের শক্তির বহির্ভূত কথা । পরমহংসদেবের সে শক্তি ছিল । সেইজন্য তাঁহাকে সাধারণ সিদ্ধপুরুষ বলিলে অযৌক্তিক কথা বলা হইবে । তর্কক্ষেত্রে সিদ্ধপুরুষদিগের এই সকল শক্তি স্বীকার করিলেও, সে কথা আমাদের হিসাবের বাহিরে যাইতেছে । কোন্ সিদ্ধপুরুষ দুঃখী, তাপী, পাণ্ডুর জন্ম চিন্তিত হইয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেছেন ? কোন্ সিদ্ধপুরুষ অজ্ঞান ভবঘোরাক্রান্ত নরনারীর জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়া দিবার জন্ম আপন ইচ্ছায়, অনুসন্ধান করিয়া, তাহার বাটীতে যাইয়া কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন ? কোন্ সাধুর প্রাণ, অনাথ-অনাথিনীর জন্ম কঁাদে ? পামর, দুঃচারিত্র ব্যক্তিদিগের তাড়না অঙ্গের ভূষণস্বরূপ জ্ঞান করিয়া—তাঁহারা বাটীতে যাইতে দিবে না, পবিত্রতা লইবে না—তথাপি জোর করিয়া, কোন্ সাধু যাইয়া কৃতার্থ করিয়া থাকেন ? যিনি সিদ্ধ তিনি সিদ্ধ, তাহাতে তোমার আমার কি ? যে ধনী, সে আপনার বাটীতে বড়, তাহাতে কি আমার উদর পূর্ণ হইবে ? কিন্তু যে ব্যক্তি মুক্তহস্ত হইয়া দীন দরিদ্রের দুঃখ মোচন করিবার জন্ম সর্বদাই প্রস্তুত থাকেন, তাঁহাকেই দাতা বলে । তিনিই লোকের উপকারী বন্ধু, তিনিই প্রকৃত ধনী ।

পরমহংসদেব নিজে যে সাধন-কষ্ট পাইয়াছেন, তিনি তাহার পুরস্কার কত পাইয়াছিলেন । লক্ষ্মীনারায়ণের দশ হাজার, মথুর বাবুর পঞ্চাশ হাজার, অন্ততঃ এ সকল টাকায় তিনি কত সুখ সন্তোষ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া অতি সামান্য ভাবে থাকিয়া সাধারণের হিতসাধনেই জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন । এ প্রকার সাধু বা সিদ্ধ কস্মিন্ কালে কেহ আসেন নাই । অতএব পরমহংসদেব কোন্ শ্রেণীর ব্যক্তি ? গৌরান্দ্র প্রভৃতি অবতারদিগের স্বরূপ স্বভাব ছিল, পরমহংসদেবের স্বভাব প্রায় সেই প্রকার ছিল । গৌরান্দ্রদেব যেমন জীবের দুঃখে সর্বদাই কাতর থাকিতেন, পরমহংসদেব সে সম্বন্ধে তাঁহা অপেক্ষা কোন মতে কম ছিলেন না । জগাই মাধাই কর্তৃক গৌরান্দ্রদেব যে প্রকার উৎপীড়িত হইয়াছিলেন, পরমহংসদেব সে বিষয়ে নিতান্ত অব্যাহতি পান নাই । গৌরান্দ্রদেব বিজ্ঞাবলে সার্কর্ভৌম প্রভৃতি পণ্ডিতদিগকে পরাস্ত করিয়া মহিমা বিস্তার করিয়াছিলেন, পরমহংসদেব নিরস্ত্র হইয়া কেশব সেন, বিজয়রুক্ষ গোস্বামী, প্রোফেসার মহেন্দ্রনাথ

শুশ্রূষা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিদারী যুবকদিগকে বিচারবলে পরাজয় করিয়া গিয়াছেন। গৌরানন্দদেব অলৌকিক কার্য দ্বারা অবিখ্যাসী বিশ্বাস স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। পরমহংসদেবের সে শক্তির ভূরি ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে। গৌরানন্দদেব ষড়ভুজাদি দেখাইয়াছিলেন, পরমহংসদেব মথুরা বাবুকে কালী-রূপে এবং অত্যাশ্চর্য ব্যক্তিকে অশুররূপে দেখা দিয়াছেন। এই সকল লক্ষণের সহিত উভয়ের সাদৃশ্য দেখিয়া সকলেই তাঁহাদের এক শ্রেণীতে আবদ্ধ করিতে চাহেন। মোট কথা, অবতারদিগের যে সকল লক্ষণ যথা ;—১ম জীবিত দয়া, ২য় সর্বভূতে সমজ্ঞান, ৩য় পতিত ব্যক্তির উদ্ধারকর্তা, ৪র্থ ধর্মের সামঞ্জস্য-ভাব, ৫ম পরম বৈরাগী, ৬ষ্ঠ জৈবধর্ম্যবিবর্জিত, ৭ম অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন, ৮ম আদিষ্ট ধর্মের নূতন ভাব, ৯ম অবতারদিগের নিকটে কর্ম থাকে না ; পরমহংসদেবের এ সকল লক্ষণই ছিল। এইজন্য তিনি অবতারশ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া দেখা যাইতেছে।

এক্কেণে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, আমাদের শাস্ত্রের দ্বারা এই অবতারের প্রমাণ করা যায় কি না।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া, কিরূপে মানবগণ সংসারে থাকিয়া যোগ, ভোগ এককালীন সাধন করিতে পারিবে, তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত আপনি দেখাইয়া গিয়াছেন। সংসারে থাকিতে হইলে ভাব আশ্রয় ব্যতীত কেহ বাচিতে পারে না। সেইজন্য তিনি বৃন্দাবনে শান্ত, দান্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরাদি পঞ্চবিধ ভাবের পূর্ণ ভোগ এবং তাহা হইতে এককালে বিরত হইয়া মথুরাদি স্থানে লীলাবিস্তারকালীন যোগ বা বৈরাগ্য ভাবের পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের ষাটতীয় কার্য এইরূপ যোগ ভোগের দৃষ্টান্ত-স্থল। আপনি যদ্বংশ বিস্তার করিয়া তাহা নিজ কৌশলে সংহার করিয়াছেন। কুরুপাণ্ডবদিগের যুদ্ধে উভয়কূল নির্মূল হইবে জানিয়াও অর্জুনকে তত্বোপদেশ প্রদান পূর্বক তাহাতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অবতারের পূর্বোক্ত ভাবের কার্য দেখিয়া লোকে তাঁহাকে পূর্ণাবতার বলিয়া থাকে। কেবল যোগ ভোগের নিমিত্ত যে তাঁহাকে পূর্ণাবতার কহা যায়, তাহা নহে। তাঁহাকে যে কেহ যে কোন ভাবে, যে কোন নামে ডাকিবে, সেই সাধকদিগের সেই ভাবে ও সেই নামে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। ইহাতেই পূর্ণ ভাবের আভাস পাওয়া যাইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ সংসারে থাকিয়া বৈরাগ্য শিক্ষা যে সুন্দররূপে দিয়া গিয়াছেন,

তাহা গীতায় প্রকাশ রহিয়াছে। শরীর সম্বন্ধে ভোগ অর্থাৎ পরস্পর সম্বন্ধ-বিশেষে কার্য্য করা দেহের ধর্ম্ম এবং ভগবানে যোগ, তাহা মনের কর্ম্ম। অর্থাৎ মনে ঈশ্বর, দেহে সংসার, ইহাকেই পরমহংসদেব নিলিঙ্গলাব কহিতেন। তাহার দৃষ্টান্ত যেমন, “বাটীর পরিচারিণী। গৃহস্থের সকল কাজ কর্ম্ম সে আপনায় স্থায় সমাধা করে, সন্তানাদিকে স্নেহ ও যত্ন করে, মরিয়া গেলে কাঁদে, কিন্তু মনে জানে যে, এরা তাহার কেহ নহে। তাহার দেশ, ঘর, বাড়ী, ছেলে-পুলে স্বতন্ত্র আছে।”

শ্রীকৃষ্ণ যোগ ভোগ শিক্ষা দিয়া সরাট এবং বিরাট রূপ দেখাইয়া পরে বলিয়াছিলেন, “যে আমার যেক্রমে উপাসনা করে, আমি তাহার মনোরথ সেইরূপে পূর্ণ করিয়া থাকি। হে অর্জুন ! পৃথিবীর লোকেরা যদিও নানা মতাবলম্বী, কিন্তু তাহারা আমারই উপাসনা করিতেছে।”

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিলেন, তাহা তিনি কার্য্য করিয়া দেখাইলেন না, কারণ তখন তাহার সময় উপস্থিত হয় নাই। বহু মত, বহু ভাব, বহু সম্প্রদায় না হইলে, ওকথা প্রয়োজন হইবে না। কিন্তু তাহার প্রয়োজন হইবে জানিয়া তিনি প্রস্তাবনা করিয়া গিয়াছিলেন। প্রস্তাবনা না করিলে তাহা এক্ষণে লোকের বুঝবার পক্ষে গোলযোগ হইত। সে সময়ে শ্রীকৃষ্ণ একথা না বলিলে আজ কি আমরা পরমহংসদেবের ভাব অনুধাবন করিতে পারিতাম ?

কৃষ্ণাবতারের পর গৌরাঙ্গ অবতার। কৃষ্ণাবতারে যাহা বিশেষ করিয়া জীবের শিক্ষা হেতু প্রদান করেন নাই, তাহা অভিনয় করাই তাঁহার অবতীর্ণ হইবার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমতঃ তিনি সাধক হইয়া কিরূপে নাম সাধন করিতে হয় এবং তাহার ফলই বা কিরূপ, তাহাই শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট জ্ঞাতিভেদ, মান অপমান, ধনী নিধনী সকলই সমান, তাহারও ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। অবতারের নিকট সাধন ভজন করিতে হয় না। একবার যে ভাগ্যবান্ তাঁহার সাক্ষাৎ পায়, তাহার সকল বিষয়ই সিদ্ধ হইয়া যায়। গৌরাঙ্গ-লীলায় তাহার সবিশেষ প্রমাণ প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে। তিনি অষ্টমত, চৈতন্য ও নিত্যানন্দ, এই তিন রূপে মানব-দিগের আধ্যাত্মিকত্বের শিক্ষা বিধান করিয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ সাধক-দিগের প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে যে যে অবস্থার প্রয়োজন, তাহা উপরোক্ত রূপত্রয় দ্বারা সাবাস্ত হইতেছে। জীব, একমেবাদ্বিতীয়ং, অর্থাৎ

দ্বৈতভাব বিরহিত হইলে, তাহার তখন সর্বত্র চৈতন্যোদয় হইয়া থাকে । সর্বচৈতন্যময় যাঁহার বোধ হয়, তিনিই তখন নিত্য বস্তু লাভ করেন, সুতরাং নিত্য আনন্দ তাঁহারই সঞ্চারিত হইয়া থাকে । শ্রীগোরাঙ্গদেব, নামের মহিমা, জ্ঞাতিভেদ চূর্ণ করিয়া সর্বজীবে সম দয়া দ্বারা প্রেমের অপূৰ্ণ ভাব, অপবিত্র, পতিত, পাপপরায়ণ এবং পূর্ণ পাপিষ্ঠদিগকে উদ্ধার করিয়া পতিতপাবন নাম এবং অদ্বৈত, চৈতন্য ও নিত্যানন্দ দ্বারা জীবের আধ্যাত্মিক-ভাব প্রচার করিয়া গিয়াছেন । যেমন বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ মূর্তি দ্বারা রক্ত এবং ফ্লাদিনী শক্তির কার্যের ভাব দেখাইয়াছেন, অর্থাৎ তথায় আনন্দ ব্যতীত আর কিছুই নাই, সখীদিগের কার্য দ্বারা মনোরতিদিগের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, সেইরূপ ঐ তিন রূপে জীবগণের তিনটি ভাবের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে । জীবের যে পর্য্যন্ত অদ্বৈত জ্ঞান লাভ না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহাদের চৈতন্যোদয় হইতে পারে না । অদ্বৈত জ্ঞান হইলে সে ব্যক্তির তখন সর্বত্র চৈতন্য স্ফূর্তি পায়, অর্থাৎ “যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ-স্ফূরে” । যাঁহার সর্বচৈতন্যজ্ঞান হয়, তাঁহার সুতরাং নিত্য আনন্দ সর্বদাই সন্ধ্যোগ হইয়া থাকে, নিত্যানন্দ দ্বারা জীবের এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে । কিন্তু এতদ্ব্যতীত আর যে সকল ভাব অবশিষ্ট ছিল, তাহা তিনি তৎকালে প্রকাশ করা কর্তব্য বোধ না করিয়া, পুনরায় দুই বার আসিবেন, এই প্রকার স্পষ্ট আভাস দিয়া গিয়াছিলেন । কিন্তু কিরূপে এবং কোন্ সময়ে, তাহার কোন বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না ।

পরমহংসদেব নূতন দুইটি ভাব সম্পূর্ণ করিয়াছেন । গীতার “যে যথা মাঃ প্রপদ্যন্তে” শ্লোকটির তাৎপর্য্য তিনি আপনি সাধন করিয়া এই বর্তমান ধর্ম-প্রলয় কালের শান্তিবিধান করিবার উপায় করিয়া গিয়াছেন । তিনি কহিয়াছেন, “যেমন কোন পুকুরিণীর চারিটী ঘাট আছে, এক ঘাটে হিন্দু, এক ঘাটে মুসলমান, অপর ঘাটে অপর ব্যক্তির জল পান করিতেছে । এক জলাশয়ের ৪টী ঘাট, এই নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন ঘাটে জল পান করিলেও কাহারও দোষ হইতেছে না, কিম্বা কাহারও পিপাসা নিবারণের ব্যতিক্রম হইতেছে না । অথবা গঙ্গায় কত বিভিন্ন জাতি স্নান করিতেছে, জল পান করিতেছে, তাহাদের ইচ্ছামত ঘাটও নির্মাণ করিতেছে । হিন্দুর ঘাট, মুসলমানের ঘাট, সাহেবদের ঘাট প্রভৃতি কত ঘাট রহিয়াছে, কিন্তু তাহাতে এক অদ্বিতীয় গঙ্গার কি পরি-বর্তন হয় ? হিন্দু দেখে পতিতপাবনী গঙ্গা, তাহাদের প্রাণ মন সেই ভাবে

বিভোর হইয়া যায়, অল্প জাতিতে দেখে সুন্দর নদী, তাঁহাদের সেই ভাবে আনন্দ হয়। অতএব এক পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভিন্ন প্রকার কার্য্য হয়।” যদিও ইতিপূর্বে কোন কোন শাস্ত্রে এবং আধুনিক রামপ্রসাদ, তুলসীদাস ও কমলাকান্ত প্রভৃতি সাধকগণ, সকলই একের কার্য্য বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু গীতার ভাব ঠিক তাহা নহে। গীতার প্রকৃত ভাব পরমহংসদেবের পূর্বে কোন ঋষি মুনিও তাহা জানিতেন কি না, সন্দেহের বিষয়। তাহা হইলে, তাহার কার্য্য হইতে দেখা যাইত। পরমহংসদেব, যেক্রমে গীতার পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের শিক্ষা দিয়াছেন, সে প্রকার কার্য্য হইলে কি আজ এ দেশে ঘরে ঘরে স্বতন্ত্র ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়া পরস্পর কলহ ও বিবাদ হইতে পারিত ? পরমহংসদেব-প্রদর্শিত ভাবটী কার্য্যে পরিণত হইতে যে কত দিন লাগিবে, তাহা এখন বলা যায় না, কারণ তাঁহারই শিষ্যবৃন্দের মধ্যে অত্যাধিক অনেকেই তাহার মর্ম্ম সম্যকরূপে আয়ত্ত্ব করিতে পারেন নাই। তাঁহারা এখন যে তাঁহার মতে সাধন করিতেছেন, তাহাতে সিদ্ধ হইলে, এই ভাবে রঞ্জিত হইবেন। এ কথা আমাদের নিজের দৃষ্টান্ত দ্বারা সিদ্ধান্ত করিলাম। কথিত রামপ্রসাদ প্রভৃতি সিদ্ধপুরুষেরা, সকল মূর্ত্তি ও ভাব একের স্বীকার করিয়া আপনাপন ভাবে পর্য্যবসিত করিয়া গিয়াছেন। সিদ্ধপুরুষদিগের নিকট ইহার অতীত কিছুই প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। রামপ্রসাদ কহিয়াছেন, “কালী হ’লি মা রাসবিহারী নটবর বেশে বন্দাবনে” ইত্যাদি। এ স্থানে কালীতে অর্থাৎ প্রসাদের নিজ ভাব দ্বারা ক্রককে দেখিতেছেন। যেমন আমার ঘাট যে পুষ্করিণীতে, সেই পুষ্করিণীতে জলপান করিতেছে ; কিন্তু গীতার ভাব তাহা নহে। কারণ ঘাট হইতে পুষ্করিণী হয় না, পুষ্করিণী হইতে অনন্ত ঘাটের উৎপত্তি হইতে পারে। কালী হইতে ক্রক নহেন, শিব নহেন, রাম নহেন। কারণ কালী বলিলে ভাববিশেষ বুঝায়। আদি শক্তি পুষ্করিণী-বিশেষ। অনন্ত রূপাদি বা ভাব, ঘাটের জায় বুঝিতে হইবে। অথবা যেমন সূর্য্য এক মধ্যবিন্দু। তাহার রশ্মিছটা ঐ বিন্দু হইতে পরিধি পর্য্যন্ত সরল-রেখাবিশেষ। এই পরিধি বিন্দু হইতে সরল-রেখা দ্বারা সূর্য্য দেখা যায় বটে, কিন্তু তাই বলিয়া পরিধির বিন্দু অপর বিন্দুর উৎপত্তির কারণ বলা যাইতে পারে না। সূর্য্য হইতে সকল বিন্দুর উৎপত্তি হয়। এই জ্ঞাত সকল বিন্দুই সত্য। যেমন, “গঙ্গার ঢেউ হয়, ঢেউয়ের গঙ্গা হয় না,” কিম্বা মাতা হইতে সন্তান জন্মে, সন্তান হইতে পিতামাতার উৎপত্তি হয় না, সেইরূপ এক আদি

স্থান হইতে সকল ভাব ও রূপাদি জন্মিয়া থাকে, ভাব বা রূপাদি হইতে অল্প ভাব বা রূপাদি হয় না। যেমন, মাটি হইতে বাসন প্রস্তুত করা হয়। মৃন্ময় পাত্রবিশেষ অলঙ্ঘ্য পাত্রের আদি কারণ নহে।

যে সকল দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল, ইহার দ্বারা পরমহংসদেব এই দেখাইয়াছেন যে, ভাবটী স্বতন্ত্র, কিন্তু যাহা হইতে ভাবের উৎপত্তি হয়, তাহা স্বতন্ত্র নহে। তেমনি, যিনি কালী, তিনি শিব, তিনিই রাম বটেন। কিন্তু কালী, শিব, রাম এক বলিলে ভাবের ভুল হয়। এই নিমিত্ত রামপ্রসাদের “কালী হ’লি মা রাসবিহারী” কথার ভাবে দোষ ঘটয়াছে। যেমন এক স্বর্ণ হইতে নানাবিধ অলঙ্কার প্রস্তুত হয়। যতগুলি যে ভাবের অলঙ্কার হউক না কেন, উপাদান কারণ স্বর্ণের তারতম্য হয় না। এস্থলে এক সোনা সকল অলঙ্কারের আদি কারণ, কিন্তু কর্ণাভরণ কণ্ঠাভরণের উৎপত্তির কারণ বলিলে ভাবের ভুল হয়। তেমনি তুলসীদাসের কথায়, দেখা যায়, “ওই রাম দশরথ কি বেটা, ওই রাম ষট্ ষটমে লেটা, ওই রাম জগৎপসেরা, ওই রাম সবসে নেহারা।” তুলসীদাস এস্থলে দশরথাস্বজ্ঞ রামকে সর্বত্র দেখিতেছেন। ফলে, কর্ণাভরণকে কণ্ঠাভরণ কহার জায় হইতেছে। যদিপি একথা বলা হয় যে, আদি কারণ ধরিয়া তাঁহার কহিয়াছেন, তাহা হইলে দশরথাস্বজ্ঞ শব্দ প্রয়োগ করায় ভাবের দোষ ঘটয়া গিয়াছে। দশরথাস্বজ্ঞ পরিধির বিন্দু-বিশেষ, তাহা মধ্যবিন্দু স্বর্যাস্বরূপ নহে। পরমহংসদেবের ভাব এই জ্ঞান বলিতে হইতেছে, গীতার ভাবের সহিত সম্পূর্ণ ঐক্য হইয়াছে। এই ভাবটী সেইজ্ঞান একটী নূতন, সূত্ররাং তিনি অবতার।

দ্বিতীয় নূতন ভাব এই যে, তিনি একাধারে অদ্বৈত, চৈতন্য এবং নিত্য-নন্দের ভাব দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি নিজে সর্বত্র এক দেখিতেন, এক জানিতেন এবং এক ভাবেই কার্য্য করিতেন। তাঁহার উপদেশ এই যে, “অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেধে যা ইচ্ছা তাই কর।” অর্থাৎ সাধনই কর আর ভজনই কর, যে পর্য্যন্ত অদ্বৈত জ্ঞান লাভ না হইবে, সে পর্য্যন্ত কোন কার্য্যই হইবে না, প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইবার পক্ষে বিঘ্ন ঘাটবে। ঈশ্বর এক এবং তিনিই বহু, এ জ্ঞান না থাকার নিমিত্ত, আমাদের দেশে এত দলা-দলি ও ঘেঁষাঘেঁষী জন্মিয়াছে। কিন্তু পরমহংসদেব কি বলিয়াছেন? যেমন ক’রে ইচ্ছা ধর্ম সাধন কর, যেমন ভাবে হউক, যেমন রূপেই হউক, এক ঈশ্বর জ্ঞান করিয়া যে উপাসনা করে, তাহার উপাসনাই প্রকৃত উপাসনা। তিনি

এই নিমিত্ত বলিতেন, “এক জ্ঞান অর্থাৎ এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই, এই জ্ঞানকে প্রকৃত জ্ঞান এবং যে স্থানে বহু জ্ঞান থাকিবে, সে স্থানে অজ্ঞান কহিতে হইবে। যেমন আলোক দেখিলে এক সূর্য্যেরই জ্ঞান হয়, তেমনি বহু জ্ঞান থাকিলেও এক জ্ঞানে তাহা পর্য্যবসিত করা উচিত। ঈশ্বরতত্ত্ব লাভ করিতে হইলে বাহ্যতে অদ্বৈত জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা করা সকলেরই কর্তব্য। যে পর্য্যন্ত “একমেবাদ্বিতীয়ং” জ্ঞান ধারণা না হয়, সে পর্য্যন্ত তত্ত্ববোধ হইতে পারে না। একের দৃষ্টান্তে, তিনি এই নিমিত্ত কহিতেন, মনুষ্যজাতি এক, জল সর্ব্বত্র এক, বায়ু সর্ব্বত্র এক, সোনা, রূপা, লৌহ, সর্ব্বত্র এক। একের বহু, যথা, মনুষ্যজাতি এক হইয়াও কেহ কাহারও সহিত সমান নহে। এক মাতৃগর্ভের দুইটা সহোদর এক প্রকার নহে। জল এক জাতি, কিন্তু বরফ বাষ্প এক প্রকার নহে। পাতকোয়া, খাত, নদী, সমুদ্র এক প্রকার নহে। সেইরূপ ধর্ম্মও এক, কিন্তু আধারবিশেষে রূপান্তর দেখায় মাত্র। অতএব যাহার অদ্বৈত জ্ঞান থাকিবে, সে কখন ধর্ম্মের ভাল মন্দ বিচার করিতে পারিবে না।

ধর্ম্ম যত্বপি এক হয়, তাহা হইলে যে যাহা করিবে, সে তাহার আপন অবস্থানুসারে পরিচালিত হইবে। সে অবস্থা পরিবর্তন করিবার কাহারও অধিকার কিম্বা সাধা নাই। তাহার দৃষ্টান্ত, আজ শতাব্দিক বৎসর: অতীত হইল, খৃষ্টানেরা এদেশে ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু হিসাব করিয়া দেখা যাউক, কয়জনকে খৃষ্টান করিতে পারিয়াছেন? যাহারা ধর্ম্মত্যাগ করিয়াছেন বা করিতেছেন, তাঁহাদের কিছুই ধর্ম্ম জ্ঞান ছিল না। এরূপ ভাবে প্রচার না করিয়া যত্বপি খৃষ্টানেরা ধর্ম্মের প্রকৃত অর্থ বুঝাইবার চেষ্টা পাইতেন, তাহা হইলে বাস্তবিক কার্য হইত। কিন্তু সে ভাব পাইবেন কোথায়? পরমহংসদেব যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, তাহার দ্বারা কাহার না প্রাণ উত্তেজিত হয়? কাহার মস্তক না তাঁহার চরণতলে ঝাইয়া আপনি পতিত হয়? এক ঈশ্বরের শক্তিবিশেষ জ্ঞান করিয়া যে যাহা করিবে, তাহাতেই তাহার পরিজ্ঞাণ হইবে। তিনি এপর্য্যন্ত বলিয়া দিয়াছেন যে, যদিই ভাবে কোন প্রকার দোষ থাকে, তাহা অকপট এবং সরলতায় পূর্ণ থাকিলে ভগবান্ নিজে তাহা সংশোধন করিয়া লইবেন। কারণ, তিনি সৎ অসৎ নহেন, তিনি অন্তর্দ্বারী, সূত্রাং মনের ভাব লইয়া তাঁহার কার্য। “ভাবের ঘরে চুরি” না থাকিলে ঈশ্বর প্রাপ্তির কোন ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে না।

তিনি সৰ্বত্র চৈতন্তময় দেখিতেন। তাহা তাঁহার সাধন বর্ণনাকালীন বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহাকে যে যখন যেমন অবস্থায় দেখিয়াছেন, আনন্দবিরহিত বলিয়া কখন দেখা যায় নাই। তবে সাধকাবস্থায় কিম্বা অল্প কোন সময়ে যদিও সাময়িক ভাবান্তর দেখাইয়াছেন, তাহা জীবশিক্ষার্থ লীলা-বিশেষ।

পরমহংসদেব পূর্বাবতারের অসম্পূর্ণ ভাব সকল সম্পূর্ণ করিয়া তাঁহার নিজের শক্তিও দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি কহিয়াছেন, “যে কেহ এখানে কিসে ঈশ্বরকে জানিব, কিসে তত্ত্বজ্ঞান হইবে, এই উদ্দেশ্যে আসিবে, তাহারই মনোরথ পূর্ণ হইবে।” এ কথা স্বয়ং পরিত্রাতা ভিন্ন অল্প কাহারও বলিবার অধিকার নাই। মহাসিদ্ধাবস্থায় উপনীত হইয়াও আপনাকে কেহ কখন আর একজনের জ্ঞান দায়ী করিতে পারেন না। পাপীর পাপ লইয়া এক ভগবান্ ভিন্ন জীবকে পরিত্রাণ করিতে কে পারেন? অবতারেরা এক জাতি। তাঁহারা যে দেশে যেক্রমে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদের কার্যধারা যেন সকলেরই এক প্রকার। যীশু যেমন পাপীদিগের পরিত্রাণের জ্ঞান আপনার শোণিত দান করিয়াছিলেন, পরমহংসদেবের ব্যাধি অবিকল তদনুরূপ। ইহা তাঁহার ত্রীমুখের কথা।

পরমহংসদেব যে সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সে সময়টিকে বাস্তবিক ধর্ম-বিপ্লব কাল কহা যায়। ধর্ম কোথায়? কোন্ সন্তোদয়ে পূর্ণ ধর্মভাব আছে? যে সন্তোদায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, তাহাদের অধিকাংশ ব্যক্তিকে প্রকৃত ব্যবসাদার ব্যতীত অল্প নামে উল্লেখ করা যায় না। তাঁহারা নিজে ধর্মের বর্ণমালা কণ্ঠস্থও করিতে পারেন নাই, তাঁহারা দেশের জ্ঞান ব্যতিব্যস্ত। আমরা নানা স্থানে দেখিয়াছি, তাঁহারা উপাসনা করেন ত্রাতা ভগিনীর জ্ঞান, দেশ বিদেশস্থ ছোট বড় নরনারীর জ্ঞান, কিন্তু আপনি পরস্পরেই ভিক্ষাপ্রাপ্তির নিমিত্ত হাত পাতিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন। এ সকল অধর্মের ভাব। নিজে অসিদ্ধ, নিজে মূর্থ, অপরকে সিদ্ধ করিবার জ্ঞান, অপরকে পণ্ডিত করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করা হইতেছে, ইহার অর্থ কি?

এইস্থানে আমাদের স্ব-সম্পর্কীয় সাধারণ হিন্দুদিগকে ‘হু’কথা বলিয়া এই গ্রন্থ পরিসমাপ্তি করিব। কারণ আপনারা নিজে দৃষ্টাণ্ডস্বরূপ না গঠিত হইতে পারিলে, অপরকে তাহা বলা বিড়ম্বনা মাত্র।

আমাদের ত কথাই নাই, পুরাতন বনিয়াদি পরিবার হৃদশাগ্রস্ত হইলে যেমন হয়, আমরা তদ্রূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছি অর্থাৎ বিষ নাই, কুলোপানা চক্র।

হিন্দুর আচারভ্রষ্ট, ব্যবহারভ্রষ্ট, ভাবভ্রষ্ট ও কার্যভ্রষ্ট হইয়া পুরাতন কথাগুলি লইয়া মন্তক নাড়িয়া আফালন করিয়া থাকি। অবসর, সুবিধা এবং স্বার্থ হিসাবে আপনাকে তদনুরূপ পরিচয় দেওয়া বর্তমান হিন্দুদিগের স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আপনাতে আর্যের এক পরমাণু লক্ষণ নাই, আর্য আর্য করিয়া মেদিনী বিকম্পিত করা হইতেছে। যাহা হইবার নহে, তাহা কার্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত গলাবাজী কিম্বা কলমবাজী করা যারপরনাই মুখতার কার্য, তাহাও হইতেছে। ধর্মের উদ্দেশ্য এ কালে আর নাই বলিলে প্রকৃত কথা বলা হয়। বাহ্যিক ধুমধামই হ'ল কাল ধর্ম। বক্তৃতা, ভোজন, বস্ত্রদান, পয়সা দিয়া বক্তা আনয়ন, ধর্মের চূড়ান্ত হইয়া গেল। হরিসভাগুলি এই মর্মে সংগঠিত হইয়াছে। বিলাসী ঢংএ ব্রাহ্মসমাজ গঠিত হয়, তাহার নকল হরিসভা। হিন্দুদিগের কোন্ শাস্ত্রে কোন্ কালে সভা ছিল? সভা থাকিবে কি? ধর্ম সাধন করা ত দেখাইবার নহে, তাহা প্রাণের কথা, সময়ের নিয়মাবলী নহে। গৌরানন্দদেব সভার আভাস দেন নাই। তিনি নামসঙ্কীর্ণন করিয়াছেন, তাহাই হউক। বক্তৃতা কেন? এ ইংরাজী ঢং হরিসভায় না প্রকাশ করাইলে কি চলিত না? আমরা দেখিয়াছি যে, বারো বৎসরের শিশু কোন হরিসভায় বক্তৃতা করিয়াছে। সে দুগ্ধপোষ্য বালক, আজও স্থলে পাঠ করিতেছে। ধর্মের মর্ম হয় ত তাহার পিতামহ আজও বুঝেন নাই, সে বালক বক্তৃতা দিল, হরিনামের মহিমা বিস্তার করিল, চতুর্দিকের করতালীতে তাহাকে মাতাইয়া তুলিল!

বিদ্যালয়ে গমন পূর্বক বিদ্যাভ্যাস না করিয়া কেহ কি কখন সভায় গমন করিতে পারেন? না তথায় কোন বিষয়ের মতামত প্রকাশ করিবার অধিকার হয়? ধর্মসভাদিও তজ্রপ। ধর্ম শিক্ষা কর, ধর্ম কি জান, তাহার পর বাহ্যিক আড়ম্বর করিতে যদি ভাল লাগে, ত করিও। বুধা সময় অতিবাহিত করা কর্তব্য নহে। দিন দিন গণা দিন কমিতেছে। যাইতে হইবে। কোন সময়ে, কখন, তাহার স্থিরতা নাই। জীবন-খাতা খানা একবার খুলিয়া দেখ, কোন খাতায় কত ধ্রুমা এবং ধরচের খাতায়ই বা কি লিখিত হইতেছে। বাল্যকাল খেলাধুলায়, কৈশোর অর্থকরীবিড়োপার্জনে, যৌবন রসক्रीড়ায়, প্রৌঢ়াবস্থা সম্মানসমুত্তির পরিণাম চিন্তায় এবং অর্থোপার্জনের গোলযোগে কাটিয়া গেল, পরে বার্দ্ধক্য—তখন সকল শক্তি ফুরাইয়া আসিল! ব্যাধি, দুশ্চিন্তা প্রভৃতি নানা উপদ্রব আসিয়া জুটিল! তখন উপায় কি

হইবে ভাবিয়া যে আর কুল কিনারা দেখা যায় না । কিন্তু আমাদের ধর্মের জ্ঞান চিন্তা কি ? আমরা ইচ্ছা করিয়া আপনারা ক্লেশ পাইব, ইচ্ছা করিয়া ভাব বিকৃত করিব, ইচ্ছা করিয়া বাহিরের লোকের নিকট উপদেশ লইব, তাহাতে কষ্ট না হইয়া আর কি হইবে ? প্রত্যেক পরিবারের কুল-গুরু আছেন, বিশ্বাস করিয়া তাঁহাদের নিকট দীক্ষিত হউন, একমনে আপন ইষ্ট চিন্তা করুন, দেখিবেন, কি সুখের পারাবার উপস্থিত হইবে ! ভাল, জিজ্ঞাসা করি, এত দিন ত খুঁটানেরা এ দেশে আসেন নাই, এত দিন ত ব্রাহ্মদল বাধে নাই, এতদিন ত ধর্মের রূপক অর্থ বাহির হয় নাই, আমাদের পূর্বপুরুষেরা কি সকলেই নিম্নগামী হইয়া গিয়াছেন ? যতপি তাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহাদের মানসিক শক্তির একটা দৃষ্টান্ত কেহ মনে করেন, তাহা হইলে দেখিবেন যে তাঁহারা কি ছিলেন এবং কি গুণে তাঁহারা নিরবচ্ছিন্ন সুখে দিন যাপন করিয়া গিয়াছেন । এ কথা কেন বলিলাম ? দেখতাবেন-কীহে । আমরা হিন্দুস্তান, হিন্দুস্থানে জন্ম, হিন্দুশোণিতে ও হিন্দুভাবে জন্ম, সুতরাং এ অবস্থায় ইংরাজী ধর্মভাব আমাদের সম্পূর্ণ বিদেশীয় । আমাদের শারীরিক কিস্তা মানসিক কোন্ ধর্মের সহিত ইউরোপীয়দিগের শারীরিক বা মানসিক ধর্মের তুলনা করা যাইতে পারে ? যদিও কতকগুলি রস্তু বা ধর্ম, এক মনুষ্যজাতি হিসাবে স্থূল ভাবে মিলিবে, কিন্তু হৃদয়াদিতে কখনই মিলিতে পারে না । এই নিমিত্ত হিন্দু হইয়া তাঁহারা ইউরোপীয় ভাব লইতে যান, তাঁহাদের কেবল অম্লকরণই হইয়া যায় । যে পর্য্যন্ত সেই হিন্দুশোণিত পরিবর্তিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত সে ভাব কখনই প্রস্ফুটিত হইতে পারিবে না । এইজন্য ভাব বিকৃত হইবার ভয়ে এ প্রকার কথা বলা হইল ।

আমরাও এখানকার লোক, তাহার পরিচয় দিয়াছি । আমরাও সভা ঘুরিয়াছি, বিজ্ঞান শাস্ত্র পড়িয়াছি, পরিসার্জিত-বুদ্ধি-প্রসূত ধর্মকথা শুনিয়াছি, কিন্তু সে সকল ভূণ অপেক্ষাও মূল্যবহীন বলিয়া ধারণা এবং প্রত্যক্ষ করিয়াছি ।

ঈশ্বর-জ্ঞান লাভ করিবার জন্ত বেণী বুদ্ধি, বেণী বিজ্ঞা, বেণী জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না । পরমহংসদেব তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন । এই শিক্ষা দিবার জন্ত তিনি জন্মিয়াছিলেন । যদিও তাঁহাকে আমরা অবতার বলিলাম, কিন্তু সে কথা অস্ত্রে এক্ষণে নাও বলিতে পারেন । তাঁহাকে একজন মনুষ্য বলিয়া, তাঁহার জীবনের স্বাভাবিক পরিবর্তন কি সুন্দরভাবে সংঘটিত হইয়াছিল, যতপি কেহ, তাহাই আদর্শ স্বরূপ রাখিয়া দেন, তাহা হইলেও কল্যাণের

ইয়ত্তা থাকিবে না। এতদ্বারা এ কথা তিনি স্পষ্ট বুঝিবেন যে, ঈশ্বরের হাতে পড়িয়া থাকিলে তিনি অতি সামান্য ব্যক্তিকেও অতি উচ্চ স্থান প্রদান করিতে পারেন। পরমহংসদেবকে কি গুণে আমরা ঈশ্বর-স্থানে বসাইয়াছি? অবশ্য তাহার কারণ আছে। কারণ না থাকিলে আমরা সর্বসাধারণের সমক্ষে হাশ্বাস্পদ হইব, এ কথা কি এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে জ্ঞান হয় নাই? এ কথা কি বুঝিতে অপারক যে, ইহা দ্বারা সামাজিক প্রতিপত্তির কিঞ্চিৎ ধ্বংস হইবে—বন্ধু-বান্ধবেরা মনুষ্য-পূজক বলিয়া গাল কাৎ করিয়া হাসিবে। কিন্তু এ সকল কথা আমাদের বিশ্বাসের নিকট অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়। মনে হয়, যাহাদের এই প্রকার ভাব, তাহারা নিতান্ত অজ্ঞান। তাহারা ঈশ্বর-বিশুদ্ধ ব্যক্তি বলিয়া তাহাদের জন্ত দুঃখিত হইয়া থাকি।

যতপি কাহারও গুরু না থাকেন, তিনি ঈশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকুন, একদিন অবশ্য গুরু মিলিবেই মিলিবে! আমরা জীবনে তাহা দেখিয়াছি! সাবধান! অবিখ্যাসীর উপায় নাই, তার্কিকের কল্যাণ নাই, গোঁড়াদিগের পরিণাম অতিশয় ভয়াবহ।

পরমহংসদেব সর্বদা যে গীতগুলি গান করিতেন, তাহার কয়েকটি এই স্থানে প্রদত্ত হইল।

শক্তি বিষয়ক গীত ।

শ্রামা মা কি কল ক'রেছে, কালী মা কি এক কল ক'রেছে ;

চৌদ্ধ পুয়া কলের ভিতর, কত রঙ্গ দেখাতেছে।

যে কলে চিনেছে তারে, কল হ'তে হবে না তারে,

কোন কলের ভক্তি-ডোরে, আপ'নি শ্রামা বাধা আছে।

যতক্ষণ কালী কলে রয়, কলের কল স্ববশে রয়,

কমল বলে কালী গেলে, কেউ না যায় সে কলের কাছে।

কখন কি রঙ্গে থাক মা, শ্রামা সূক্ষ্ম-তরঙ্গিনী ;

লক্ষ্মে 'বক্ষ্মে অপাঙ্গে অনঙ্গে ভঙ্গ দেও জননী।

লক্ষ্মে বক্ষ্মে কম্পে ধরা, অসিধরা করালিনী,

তুমি ত্রিগুণধরা, পরাংপরা ভয়ঙ্করা কালকামিনী ;

সাধকেরই বাঙ্কা পূর্ণ, কর নানারূপধারিণী,

কভু কমলের কমলে নাচ মা, পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনী।

শ্রামাপদ আকাশেতে মন ঘুড়ি-খানি উড়তেছিল ;
কলুষের কু-বাতাস পেয়ে, গোপ্তা খেয়ে প'ড়ে গেল ।
মায়া কান্নি হ'লো ভারি, আর আমি উঠাতে নারি :
দারা স্নাত কলের দড়ি, ফাঁস লেগে সে ফেঁসে গেল ।
জ্ঞান-মুণ্ড গ্যাছে ছিঁড়ে, উঠিয়ে দিলে অমনি পড়ে ;
মাথা নেই সে আর কি উড়ে, স্নেহের ছ'জন জয়ী হ'ল ।
ভক্তি ডোরে ছিল বাধা, খেঁত্রে এসে লাগলো ধাঁধা ;
নরেশজের হাসা কাঁদা, না আসা এক ছিল ভাল ।

ভাবিলে ভাবের উদয় হয়, ভাবিলে ভাবের উদয় হয় ;
যে জন কালীর ভক্ত, জীবমুক্ত, নিত্যানন্দময় ।
যেমন ভাব, তেমন লাভ, মূল সে প্রত্যয় ।
কালী পদ সূধা হ্রদে চিত্র * ডুবে রয়, যদি চিত্র ডুবে রয়,
তবে জপ যজ্ঞ পূজা বলি কিছুই কিছু নয় ।

যা অনায়াসে হয় তাই কর রে ?
কাজ কি আমার কোষাকুশি, আয় মন বিরলে বাস,
ভাব শ্রামা এলোকেশী, বারাগসী পাবি রে ।
ভয়মাথা ত্রিলোচন, শিবের কোন পুরুষে ছিল ধন,
শ্রামা নিধনের ধন, তাই সদা জপ রে ।

* পরমহংসদেব চিত্র শব্দ প্রয়োগ না করিয়া চিত্র শব্দ ব্যবহার করিতেন বলিয়া অনেকেই তাঁহার উচ্চারণ দোষ ধরিতেন ; কিন্তু স্থূল বুদ্ধি ব্যক্তির ভাবকের ভাব উপলব্ধি করিতে কোন কালেই সক্ষম নহেন । চিত্র শব্দে মন । কালী পাদপদ্মে মন মগ্ন হইলে যে, সকল কার্য্য স্থগিত হইয়া যায়, তাহা নহে । কারণ, মন বুদ্ধি এবং অহঙ্কার, এই তিন লইয়া মনুষ্যদিগের কার্য্য হয় । কোন বিষয়ে মন সংযোগ হইলে বুদ্ধি এবং অহঙ্কারের কার্য্য রহিত হইয়া যায়, তাহা নহে । অতএব কালীপদে মন মগ্ন হইলেই যে কার্য্য উঠিবে, তাহার হেতু নাই । চিত্র শব্দের দ্বারা প্রকৃত ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে । চিত্র অর্থে ছবি । মনুষ্যজগতের প্রতিকূপ জীবান্নায় পরমাত্মায় মিলনকে সমাধি কহে । তদবস্থায় আর বহির্জ্ঞান থাকে না, কার্য্য করিবে কে ?

আপনাতে আপনি থেকো. যেও না মন কার ধরে ।
 যা চাবি তাই ব'সে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে,
 পরমধন এই পরেশ মণি, যা চাবি তাই দিতে পারে.
 কত মণি প'ড়ে আছে, আমার চিন্তামণির নাচহুয়ারে ।

তার তারিণী ।

এবার ব্রিত করিয়ে, তপন-তনয়-ত্রাসে-ত্রাসিত প্রাণ যায় ।
 জগত অঙ্গে জন পালিনী, জন মোহিনী জগত জননী ;
 যশোদা জঠরে জনম লইয়ে, করিলে হরি লীলে ।
 বৃন্দাবনে রাধা বিনোদিনী, রজবল্লভ বিহার কারিণী ;
 রসরঙ্গিনী রসময়ী হ'য়ে, রাস করিলে লীলাপ্রকাশ ।
 গিরিজা, গোপজা; গোবিন্দ মোহিনী, তুমি মা গঙ্গে গতি দায়িনী ;
 গাঙ্কারিকে গৌরবরণী, গাঙয়ে গোলকে গুণ তোমার ।
 শিবে সনাতনী, সর্বাঙ্গী, ঈশানী. সদানন্দময়ী সর্বস্বরূপিণী ;
 সগুণা নিগুণা সদাশিবপ্রিয়া, কে জানে মহিমা তোমার ।

যশোদা নাচা'ত গো মা : বলে নিলমণি ; গো মা—

সে বেশ লুকালে কোথা করাল বদনী ।

একবার নাচ গো শ্রামা,—

হাসি বাসি মিশাইয়া ; যুগমালা ছেড়ে, বনমালা প'রে ;
 অসি ছেড়ে বাশি লয়ে ; আড়নয়নে চেয়ে চেয়ে ; গজমতি নাশায় হুলুক ;
 যশোদার সাজান বেশে ; অলকা আরত মুখে ; অষ্ট নায়িকা, অষ্ট সখী হোক ;
 যেমন ক'রে রাসমণ্ডলে নেচেছিলি ; হৃদিবৃন্দাবন মাঝে ; ললিত ত্রিভঙ্গ্যমে;
 চরণে চরণ দিয়ে ; গোপীর মনভুলান বেশে, তেমনি তেমনি তেমনি ক'রে ;
 (দেখে নয়ন সফল করি) বড় সাধ আছে মনে ;
 ভোর শিব বলরাম হোক, (হেরি নীলগিরি আর রজতগিরি)
 একবার বাজা গো মা ;—(সেই মোহন বেণু,
 যে বেণু রবে ধেমু ফিরাতিস্ ; সেই মোহন বেণু.
 যে বেণু রবে যোগীভূর মন লাতিস্ ; যে বেণু রবে যমুনায় উজ্জান ধরিত ;

বাজুক তোর বেণু বলায়ের শিঙ্গে ।

শ্রীদামের সঙ্গে নাচিতে ত্রিভঙ্গে গো মা :

তা থেইয়া তা থেইয়া, তা তা থেই থেই বাজত নৃপুর ধ্বনি ।

উন্তে পেয়ে, আস্তো ধৈয়ে, ব্রজের রমণি ॥ (গো মা)

গগণে বেলা বাড়িত, রানী বাকুল হইত :

বলে ধর ধর ধর, ধর রে গোপাল, স্মীর সর ননী ।

এলাইয়ে চাঁচর কেশ রানী বেঁধে দিত বেণী ॥ (গো মা)

এবার কালী তো'কে খাব ।

গণযোগে জনমিলে সে যে হয় মাথেকে ছেলে ;

এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা ! দুটোর একটা ক'রে খাব ।

ডাকিনী যোগিনী দুটো, তরকারী বানায়ে খাব ।

তোর মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে, অম্বলে সান্তার চড়াবো ।

(তোরে বনমালা পরাইব ।)

খাব খাব বলি গো মা ! উদরস্ত না করিব,

অদি পদ্যে বসাইয়ে মন মানসে পূজিব ।

হাতে কালী মুখে কালী মা ! সন্ধ্যায়ে কালী মাখিব ;

যখন আসবে শমন ধ'ন্তে কেশে, সেই কালী তার মুখে দিব ।

এবার আমি ভাল ভেবেছি ;

ভাল ভাবীর কাছে ভাব পেয়েছি ।

যে দেশে রজনী নাই, সেই দেশের এক শ্লোক পেয়েছি ;

আমি কিবা রাত্র কিবা দিবা সন্ধ্যারে বন্ধা ক'রেছি ।

সোহাগা গন্ধক দিয়ে খাসা রং চড়ায়েছি ;

এবার ভাল ক'রে মেজে ল'ব অক্ষ দুটী ক'রে কুঁচি ।

শিব সঙ্গে সদা রঙ্গে, আনন্দে মগনা ;

সুধা পানে ঢল ঢল কিন্তু চ'লে পড়ে না মা !

বিপরীত রতাতুরা, পদভরে কাঁপে ধরা,

উভয়ে পাগল পারা, লজ্জা ভয় ত মানে না মা !

আয় মন বেড়াতে যাবি। (যদি না বেড়ালে তুই রইতে নারিস্)

কালীকল্পতরুযুগে রে মন চারি ফল কুড়ায়ে পাবি ॥

ধর্মাধর্ম দুটো অজ্ঞা ভক্তি খোঁটায় বেঁধে খুবি ;

জ্ঞান খড়্গে বলি দিয়ে উভয়ে কৈবল্যে দিবি ।

গুচি অশুচিরে লয়ে, দিব্য ঘরে কবে গুবি ;

তুই সতীনে পিরীত হ'লে, তবে শ্রামা মাকে পাবি ।

রামপ্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি উভয়কে মাথায় রেখেছি ;

এবার কালীর নাম ব্রহ্ম জেনে কর্মাকর্ম সব ছেড়েছি ।

সুরাপান করিনে আমি, সুধা খাই জয় কালী ব'লে ;

মন মাতালে মাতাল করে, সব মদ-মাতালে মাতাল বলে ।

গুরুদত্ত গুড় লয়ে, প্ররুত্তি তায় মসলা দিয়ে মা !

জ্ঞান গুঁড়ীতে চুয়ায় ভাঁটি, পান করে মোর মন মাতালে ।

মূলমন্ত্র যন্ত্র ভরা, আমি শোধন করি বলে তারা মা,

রামপ্রসাদ বলে এমন সুরা খেলে চতুর্দর্শ মেলে ।

মা ! হং হি তারা । (আমার)

তুমি ত্রিগুণধরা পরাংপরা ।

তুমি জলে, তুমি স্থলে, তুমি আদি মূলে গো মা,—

থাক সর্ব্ব ঘটে, অক্ষপুঠে, সাকার আকার নিরাকার।

তুমি সন্ধ্যা তুমি গায়ত্রী, তুমি জগদ্ধাত্রী গো মা,—

তুমি সর্ব্বজীবের ত্রাণকর্ত্রী, সদা শিবের মনোহরা ।

মজ্জলো আমার মন ভ্রমরা শ্রামাপদ নীল কমলে ।

বিষয় মধু তুচ্ছ হ'লো, কামাদি রিপু সকলে ॥

চরণ কালো ভ্রমর কালো, কালোর কাল মিশে গেল ;

পঞ্চ তত্ত্ব প্রধান বস্তু, রস দেখে ভঙ্গ দিলে ।

কল্লাকান্তের মনে, আশা পূর্ণ এত দিনে,

দুঃখহৃৎ সমান হ'ল, আনন্দ সলিল স্থলে ॥

(মা তোদের) ক্ষেপার হাট বাজার, গুণের কথা ক'ব কার।।
 তোরা দুই সতীনে, কেউ বুকে কেউ মাথায় চ'ড়ে তাঁর ।
 কর্তা যিনি ক্ষেপা তিনি, ক্ষেপার মূল্যধার ; (মা তারা)
 চাকলা ছাড়া চালা দুটো সঙ্গে অনিবার ।
 *গজ বিনে গো আরোহণে, ফিরিস্ কদাচার, (মা তারা)
 মণি মুক্তা ছেড়ে পরিস্ গলে, নর-শির হার ।
 শ্মশানে মশানে ফিরিস্, কার বা ধারিস্ ধার, (মা তারা)
 রামপ্রসাদকে ভব-ঘোরে ক'র্তে হবে পার ।

গয়া গঙ্গা প্রভাস আদি, কাশী কাকী কেবা চায় ।
 কালী কালী কালী ব'লে, অজপা যদি সুরায় ॥
 ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সেনি চায় ।
 সন্ধ্যা যার সন্ধানে ফিরি, কভু সন্ধি নাহি পায় ॥
 কালী নামে কত গুণ, কেবা জাস্তে পারে তায় ।
 দেবাদিদেব মহাদেব মার পঞ্চ মুখে গুণ গায় ॥
 জপ যজ্ঞ পূজা বলি, আর কিছু না মনে লয় ।
 মদনের জপ যজ্ঞ, ব্রহ্মময়ীর রাঙ্গা পায় ॥

যখন যেক্রপে কালী রাধিবে আমারে ।
 সেই সে মঙ্গল যদি না ভুলি তোমারে ॥
 বিভূতি বিভূষণ, রতন মণি কাঞ্চন ।
 রক্তমূলে বাস, কি রতন সিংহাসনোপরে ॥

নামেরই ভরসা কেবল কালী গো তোমার ।
 কাজ কি আমার কোষাকুশি, দেতোর হাসি লোকাচার ॥
 নামেতে কাল পাশ কাটে, জোটে তা দিয়েছে র'টে ;
 আমি তো সেই জোটে'র মুটে, হ'য়েছি আর হ'ব কার ।
 নামেতে যা হবার হবে, মিছে কেন মরি ভেবে ;
 নিতান্ত ক'রেছি শিবে, শিবের বচন সার ॥

দুর্গা দুর্গা ব'লে, মা যদি মরি ।

আখেরে এ দীনে, না তার কেমনে, জানা যাবে গো শঙ্করী ।
আমি নাশি, গো ব্রাহ্মণ ; হত্যা করি ভ্রূণ, সুরা পান আদি বিনাশি, নারী,—
এ সব পাতক, না ভাবি তিলেক, ব্রহ্মপদ তুচ্ছ করি ॥

গো আনন্দময়ী হ'য়ে মা ! আমায় নিরানন্দ ক'রো না ।
তপন-তনয়, আমায় মন্দ কয়, কি বলিবি তাকে বল না ।
ভবানী বলিয়ে, তবে যাব চ'লে, মনে ছিল এই বাসনা ;
অকুল পাথারে ডুবাবি আমারে, স্বপনেও তাতো জানি না ।
আমি অহর্নিশি, দুর্গা নামে ভাসি, দুঃখরাশি তবু গেল না ;
আমি যদি মরি, ও হরসুন্দরী, দুর্গা নাম কেউ লবে না ॥

বল রে শ্রীদুর্গা নাম ।

দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে, পথে চ'লে যায়, শূল হস্তে মহাদেব রক্ষা করেন তায় ।
শঙ্করী হইয়ে মাগো গগনে উড়িবে, মীন হ'য়ে রব জলে নখে তুলে লবে ।
নখাঘাতে ব্রহ্মময়ী যাবে এ পরাণী, সে সময়ে দিও রাক্ষা চরণ হ'খানি ।
যখন বসিবে মাগো শিব সরিধানে, বাজ্জন নুপুর হ'য়ে বাজিব চরণে ।

তুমি সন্ধ্যা তুমি গায়ত্রী, তুমি মা সকল,

তোমা হ'তে ব্রহ্মা বিষ্ণু, দ্বাদশ গোপাল ।

কে ! মা এলি গো, গিরে দাদার বেটী ।

দোনো ছোকরা বি সাধ্, দোনো ছুকরী বি সাধ্

আর এক ব্যাটা জুপি কাটা কামড়ে নিল টুটী ॥

যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্রামা মাকে ।

(মাকে) তুমি দেখে মুন আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাই দেখে ॥

কামাদিরে দিয়ে কাঁকি, আয় মন বিরলে দেখি,

রসনারে সজে রাখি, সে যেন মা ব'লে ডাকে ॥ (মাঝে মাঝে)

কুরুচি কুমদ্বী যত, নিকট হ'তে দিও নাকো ।

জানেনে প্রহরী রেখো, সে যেন সাবধানে থাকে ॥ (খুব)

রাধাকৃষ্ণ ও অগ্ন্যাণ্ড বিষয়ক গীত ।

প্রেম নগরে রাই মহাজন, তত্ৰ খাতক শ্রীহরি ।
কস্ত কৰ্জ পত্র লিখে, দিয়েছেন বংশধারী ॥
খং দেখালে হবে বা কি ? ওয়াশীল শূন্য বাকীর বাকী ;
সস্তাবন তার আছে বা কি, কেবল বাশের বাশরী ।
পরিশোধের কথা আছে, দিবে ধড়া চুড়া বেচে ;
তত্ৰ খতে লেখা আছে, ইসাদী অষ্টমঞ্জরী ॥

আমি মুক্তি দিতে কাতর নই ।

গুহু ভক্তি দিতে কাতর হই ॥

আমার ভক্তি যেবা পায়, তারে কেবা পায়, সে যে হয় রে ত্রৈলোক্য জয়ী ।
ভক্তির কথা গুন বলি চন্দ্রাবলী, ভক্তি মিলে কভু ভক্তি মিলে কই ;
ভক্তির কারণে পাতাল ভুবনে, বলির দ্বারে আমি দ্বারী হ'য়ে রই ।
গুহু ভক্তি এক আছে বন্দাবনে, গোপ গোপী বিনে অগ্রে নাহি জানে ;
ভক্তির কারণে নন্দের ভবনে, পিতা জানে নন্দের বাধা মাধায় বই ॥

কে জানে তোমার মায়া, ওহে শ্রীহরি ।

পুরুষ প্রকৃতি হও কভু ত্রিপুরারী ॥

কভু ব্যাঘ্র চন্দ্র পর, কভু বা মুরলী ধর ;

কভু হও নর-হর, রণস্থলে দিগধরী ॥

তব মায়ায় বদ্ধ বলি, ত্রিপাদ ভূমি দিবে বলি,

ছলনা করিয়ে ছলি, পাঠাইলে নাগপুরী ।

জয় বলে রামারাম, জ্ঞানকার ভেদ, ভেদ নাম,

যেই শ্রামা সেই শ্রাম, ভাব মন ত্রৈক্য করি ॥

এসে ঠেকেছি যে দায়, সে দায় কব কায়ন ।

যার দায় সেই জানে, পর কি জানে পরের দায় ॥

হ'য়ে বিদেশিনী নারী, লাজে মুখ দেখাতে নারি ;

ভয়ে মরি লাজে মরি, নারী হওয়া একি দায় ।

আমার কি ফলের অভাব, তোরা এলি বিকল ফল যে লয়ে ;
 পেয়েছি যে ফল, জনম সফল, রাম কল্লতরু রোপেছি হৃদয়ে ।
 শ্রীরাম-কল্লতরু-বৃক্ষ-মূলে রই, যে ফল বাঁজা করি, সে ফল প্রাপ্ত হই,
 ফলের কথা কই, ও ফল গ্রাহক নই, যাব তোদের প্রতিফল যে দিয়ে ।

ভাব শ্রীকান্ত নর-কান্ত কারীরে ।

নিতাস্ত কৃতাস্ত ভয়াস্ত হবি ॥

ভাবিলে ভব ভাবনা যায় রে - তারে অপাঙ্গে দ্রুতঙ্গে ত্রিভঙ্গে যেবা ভাবে ।

এলি কি তব্বে, এ মৰ্ত্ত্যে, কুচিত্ত কুরন্ত করিলে কি হবে রে,—

উচিত তো নয় দাশরথিরে ডুবাবি রে ;

কর এ চিন্ত, প্রাচিন্ত, সে নিত্য পদ ভেবে ।

‘কীর্তন ।

দে দে দে, মাধব দে ।

আমার মাধব, আমায় দে, দিয়ে বিনা মূলে কিনে নে—

মীনের জীবন, জীবন ঘেমন, আমার জীবন মাধব তেমন ।

তুই লুকাইয়ে রেখেছিস্ (ও মাধবী)—

আমি বাচি না, বাচি না.

(মাধবী ও মাধবী মাধব বিনে, মাধব অদর্শনে)

গ্রামের গাংগাল পেলুম না লো সই

আমি কি সুখে আর ঘরে রই ॥

গ্রাম যদি মোর হ’তো মাথার চুল ।

যতন ক’রে বাধতুম্ বোনী সই, দিয়ে বকুল ফুল ।

(কেশব-কেশ যতনে বাধতুম্ সই,

কেউ নকুতে পারত না সই,—গ্রাম কাল আর কেশ কাল)—

কেউ নকুতে পারত না—

কালোয় কাল মিশে যেতো গো—কেউ নকুতে ;—

গ্রাম যদি মোর ব্যাসর হইত, নাসা মাঝে সতত রহিত,—

অধর চাঁদ অধরে র’ত, সই ।

যা হবার নয়, মনে হয় গো—

শ্রাম কেন ব্যাসর হবে সই ?

শ্রাম যদি মোর কঙ্কণ হ'তো, বাহুমাঝে সতত রহিত—

কঙ্কন নাড়া দিয়ে চ'লে যেতুম সই, (বাহু নাড়া দিয়ে)

শ্রাম কঙ্কন হাতে দিয়ে, চলে যেতুম সই, (রাজপথে)—

ঘরে যাবই না গো ।

যে ঘরে কৃষ্ণ নামটা করা দায় ;—

যেতে হয় তোরাই যা, গিয়ে ব'লবি,

যার রাধা তার সঙ্গে গেল ।

তোদের হ'ল বিকি কিনি, আমার হ'ল নালকান্তমণি ।

যদি কারুর বাড়ী যাই, বলে এল কলঙ্কিনী রাই ।

যদি চাই মেঘপানে, বলে কৃষ্ণকে পড়েছে মনে ।

যদি পরি নীল বসন, বলে ঐ ক্রমের উদ্দোপন ।

যখন থাকি রক্তনশালে, কৃষ্ণ রূপ মনে হ'লে, আমি কাঁদি সখি ধূঁয়ার ছলে ।

দে দে দে, বাঁশী দে ।

বাঁশী তো মথুরার নয়,—

রাধা নামের সাধা বাঁশী, বাঁশী তো মথুরার নয়—

তুই থাক্ না কেন শ্রাম, বাঁশী দে—

বাঁশী দে, চুড়া দে, তোর মা ব'লেছে, পীত ধড়া দে,—

(যে ধড়ায় ননী বেধে দিতো রে,)

তোর মা নন্দরাণী, এখন তো বিনে পঙ্খের কাঙ্গালিনী ; তোর মা ব'লেছে,—

দে দে রায়ের গাঁথা চিকণ মালা দে, তোর পিরীতি ফিরায়ে নে ।

একটা নবীন রাখাল ।

তোমার শ্রীদাম হবে কি সুবল হবে ॥

সে যে কাঁদছে যমুনার ঘাটে, একটা নূতন বৎস কোলে লয়ে ।

কানাই কানাই বলুতে চায়, তার “কা” বই কানাই বেরায় না

ব'ল্লে ডরাই, না ব'ল্লেও ডরাই ;
 জ্ঞান হয় তোমায় হারাই হা রাই ।
 আমরা জানি যে মন্তোর, দিলাম তোকে সেই মোস্তর-
 এখন মন তোর, আমরা যে মন্তে বিপদে তরি তরাই ।

কে কানাই নাম ঘূচালে তোর ।
 ওরে ব্রজের মাধম চোর ॥
 কোথায় রে তোর পীত ধড়া, কে নিল তোর মোহন চুড়া,
 নদে এসে ঝাড়া যুড়া, প'রেছ কোপীন ডোর ।
 অশ্রু কম্প স্বর ভঙ্গ, পুলকে পূর্ণিত অঙ্গ, সঙ্গে লয়ে সাধোপাঙ্গ,
 হরি নামে হ'য়ে ভোর ।

তোমরা হ'ভাই পরম দয়াল হে প্রভু গৌর নিতাই ।
 (অধম তারণ হে প্রভু গৌর নিতাই ।)
 আমি গিয়েছিলাম কানীপুরে, আমায় ক'য়ে দিলে বিবেচনর,
 সেই নন্দের নন্দন শচীর ধরে । (আমি জেনেছি হে)
 আমি গিয়েছিলাম অনেক ঠাঁই, কিন্তু এমন দয়াল দেখি নাই ।
 (তোমাদের মত)
 তোমরা ব্রজে ছিলে কানাই বলাই, এখন নদে এসে হ'লে গৌর নিতাই ।
 (সে রূপ লুকায়ে)
 তোদের ব্রজের খেলা ছিল দৌড়াদৌড়ি, এখন নন্দের খেলা ধূলায় গড়াগড়ি ।
 (হরি বোল বলে ।)
 তোমার ব্রজে ছিল উচ্চ রোল, : এখন নদে এসে কেবল হরিবোল ।
 (ওহে গৌর নিতাই)
 তোমার সকল অঙ্গ গেছে ঢাকা, কেবল চেনা আছে হুটী নয়ন বাঁকা ।
 (ওহে দয়াল গৌর)
 তোমার পতিতপাবন মাম গুনে, বড় ভরসা ক'রেছি মনে
 (ওহে পতিত পাবন)
 বড় আশা ক'রে এলুম ধৈয়ে, আমায় রাখ চরণ ছায়া দিয়ে ।
 (ওহে দয়াল গৌর)

জগাই মাধাই ত'রে গেছে, প্রভু সেই ভরসা আমার আছে ।

তোমরা আচণ্ডালে দাও কোল, কোল দিয়ে বল হরিবোল ।

(ওহে কান্দালের ঠাকুর)

আমার গৌর নাচে ।

নাচে সঙ্কীৰ্তনে, শ্রীবাস অঙ্গনে, ভক্তগণ সঙ্গে ॥

হরিবোল বলে বদনে গৌরা, চায় গদাধর পানে ;

গোরার অরুণ নয়নে, (আমার গোরার) বহিছে সঘনে, প্রেমধারা হেম অঙ্গে ।

নাচেরে ।

শ্রীগোরাধ আমার, রাধা প্রেমে ব'লে হরি হরি ॥

উথলিল প্রেম সিন্ধু বজলীলা মনে করি ;

গোরা ক্ষণে বৃন্দাবন, করয়ে স্মরণ, ক্ষণে ক্ষণে বলে কোথায় প্রাণেশ্বরী ।

বা'দের হরি ব'ল্তে নয়ন ঝরে, তারা হু'ভাই এসেছে রে ।

তারা—তারা হু'ভাই এসেছে রে ।

বা'রা জীবের দুঃখ সৈতে নারে ।

বা'রা বজ্রের মাখন চোর, বা'রা জাতি বিচার নাহি করে,

বা'রা আপামরে কোল দেয়, বা'রা আপনি মেতে জগৎ মাতায়,

বা'রা হরি হ'য়ে হরি বলে, বা'রা জগাই মাধাই উদ্ধারিল,

বা'রা মার খেয়ে প্রেম বিলায়, বা'রা আপন পর নাহি বাচে,

জীব-তরাতে তারা হু'ভাই এসেছে রে । (নিতাই গৌর)

মধুর হরি নাম নিসেরে । জীব যদি সুখে থাকিব ।

সুখে থাকিব বৈকুণ্ঠে যাবি, ওরে মোক্ষ ফল সদা পাবি । (হরিনামের শুণে রে) .

যে নাম শিব জপে, জপে দিবা নিশি, আজ সেই হরি মাম দিব তোকে ।

দয়াল নিতাই ডাকে রে—

নারদ ঋষি—ঋষি দিবানিশি, যে নাম বিনা বস্ত্রে গান করে ।

ও জীব আয় রে ও জীব আয় রে, কে পারে বাবি আয় রে ;

হরি নামের তরি বাটে বাধা রে ; অ'মার প্রেমদাতা নিতাই ডাকে ।

রাধে গোবিন্দ বল ।

রাধে গোবিন্দ বল, শ্রীরাধে গোবিন্দ বল ।

রাধে রাধে রাধে বল, নাম ব'লতে ব'লতে প্রাণ গেলেও ভাল, থাকলেও ভাল !

রাধা নামে বাধ ভেলা, এড়াবি শমনের জ্বালা ।

রাধা নাম সুধানিধি, পান কর নিরবধি ।

রাধা রাধা বল মুখে, জনম যাইবে সুখে ।

রাধা নাম বল সদা, যাবে তোর ভবের ক্ষুধা ।

তারে কৈ পেলাম সৈ আমি যার জন্তে পাগল ।

ব্রহ্মা পাগল বিষ্ণু পাগল আর পাগল শিব ।

তিন পাগলে যুক্তি ক'রে ভাঙ্গল নবদ্বীপ ॥

আর এক পাগল দেখে এলাম বৃন্দাবন মাঝে ।

রাইকে রাজা সাজাইয়ে আপনি কোটাল সাজে ।

আর এক পাগল দেখে এলাম নবদ্বীপের পথে ।

রাধা প্রেম সুধাবে ব'লে করোয়া কিস্তি হাতে ।

সুরধনৌ তীরে হরি বলে কে রে ।

প্রেমদাতা নিতাই এসেছে । (বুঝি)

তা নৈলে প্রাণ জুড়াবে কিসে । (নিতাই নৈলে) (দয়াল নৈলে)

প্রেমধন বিলায় গৌর রায় ।

দয়াল নিতাই ডাকে আর আয় ।

শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায় ।

আপনি পড়িয়ে নিতাই বলে সামাল রে ভাই । (প্রেমের বচা এলরে)

বাউল সঙ্গীত ।

আয় গো আয় গোষ্ঠে গোচারণে যাই ।

শুনুচি নিধুবনে, রাখাল রাজা হবেন রাই, হায় শুনতে পাই ।

পীত ধড়া মোহন চুড়া, রাইকে পরাবে, হাতে বাশরি দিবে—

রাইকে রাজা সাজাইয়ে, কোটাল হবে প্রাণ কানাই ।

হরি সে লাগি রহ রে ভাই

তেরা বনত বনত বনিয়াই ।

অঙ্ক তারে বঙ্ক তারে, তারে সৃজন কশাই

সুগাপড়ায়কে গনিয়া তারে তারে মীরাবাই ।

দৌলত হুনিয়া মাল খাজনা বেনিয়া বয়েল চরাই ;

এক বাত্‌সে ঠাণ্ডা পড়েগা খোঁজ্‌ খবর না পাই ।

আয়্‌সি ভক্তি কর ষট্‌ ভিতর ছোড় কপট চতুরাই ;

সেবা বন্দি আওর অধীনতা সহজে মিলি রঘুরাই ।

পরমহংসদেবের তিরোভাব উপলক্ষে বাংসরিক নগর সঙ্কীৰ্ত্তন ।

আমি সাধে কাঁদি ।

হৃদয় রঞ্জনে, না হেরে নয়নে, কেমনে প্রাণ বাধি ॥

বিদায় দিছি পাষণ প্রাণে, চাব কার মুখ পানে ;

ফুল ফুলহারে, সাজাইব কারে, পোড়া বিধি হ'লো বাদী ॥

ভাবে ভোরা মাতোয়ারা, ছনয়নে বহে ধারা ;

চলে চলে চলে, নাচ কুতূহলে,—এস গুণনিধি সাধি ॥

চ'লে গেলে আর এলে না, জীব ত হরিনাম পেলেনা ;

পার পাবেনা ঋণে, যদি দীন হীনে, কর পদে অপরাধী ॥

আজ ধিরে জাগিছে স্মরণ ।

হ'য়েছি রতন হারা, বিহনে যতন ॥

সেই রবি শশি তারা, সেই ধরা-ফুল হারা ;

বহিছে সময় ধারা, বহিত যেমন ।

সেই পঙ্কী কুল-কল, অনিলে দোলে কমল,

কেবল না হেরি নাথ তোমার বদন ॥

রসিক প্রেমিকবর, জন মন ফুলকর,

ধ'রেছিলে কলেবর, আমার কারণ ।

তব প্রেম নাহি মনে, ভুলে আছি তোমাধনে—

' শত ধিক্‌ এ জীবনে, ধিক্‌ তোরে, মন ॥

কাতরে

ডাকি হে—এস, আঁখিবারি ঢালি রাঙ্গা পদে !

ভুলে আছি কমল চরণ, মত্ত মহামোহ মদে ।

বিষয়-সাধনা, বিষয়-কামনা, হারায়েছি হায় !

পরম সম্পদে !

রাখ, নাথ, রাখ দাসে, রাখ রাখ এ বিপদে—

ফিরি লক্ষ্য হীন, বুরি দিন দিন—তুণ পাকে পাকে,

যেন মহাহুদে ।

বিষাদে বাকুল কভু, কভু মাতি ছার আমোদে ;

হৃদয় সমল, কুঙ্কিত, কমল—বিকাশি বসে হে

হৃদি-কোকনদে ।

ত্রিতাপ দিবানিশি দহিছে শ্রীপদে দেহ আশ্রয় ।

নামে ভব ত্রাস, হয় হে হয় বিনাশ ;

হর ভয় হে সদয় হৃদয় ॥

কলুষ মোহিত, কলুষ জড়িত ;

বিহিত নাহিক পাই—

বিষয় পিয়াসা, ভোগে বাড়ে আশা,

(আমার কবে বা যাবে হে) (পিয়াস গেল না গেল না)

(আর কত দিন রবে হে)

জলে মরি তবু চাই ।

নিয়ত তাড়না, সহেনা যাতনা,

করুণা করহে দীনে—

নিবিড় তিমিরে, মন সঁদা ফিরে,

(একবার দেখা দাও হে) (চরণে শরণ নিলাম)

(আর গতি নাই হে)

চরণ অরুণ বিনে ॥

শঙ্কা চিতে, বৃষ্টি পদাশ্রিতে,

ভুলে আছ হে দয়াময় ॥

বিষম বিষয় তৃষা গেলনা হ'লনা দীনের উপায় ।

পেয়ে শ্রীচরণ, করি নাই হে যতন,

পরম রতন হারালেম হেলায় ॥

বিবেক রহিত, বাসনা তাড়িত, ভ্রমে মত্ত চিত্ত হায় ।

আশায় নিরাশ, হতাশে হতাশ —

(আশা কবে বা যাবে হে, আশা গেলনা গেলনা,)

দীর্ঘশ্বাসে দীন যায় ॥

ব্যাপিত অবনী, রোদনের ধ্বনি, শুনিয়া শিহরে প্রাণ ।

ঘুমে অচেতন না ম্যাঁলে নয়ন—

(চেতনা হ'লনা হ'লনা, আরে রে পামর মন, গোনা দিন ফুরায়ে গেল,)

মোহ নহে অবসান ॥

ভবে ভীম দুরশন, অধিরত কুস্বপন,

মায়ার নেশায় মন, জাগিতে না পারে ।

পাথারে তরঙ্গ রোলে, পৈশাচিক গুণ্ণগোলে,

(প্রাণ শিহরে উঠে হে তরঙ্গের রঙ্গ দেখে,

প্রাণ আকুল যে হ'লো হে—অকূলে না কূল পেয়ে,

আমি কোথা বা যাব হে, চরণে শরণ নিলাম)

সুখ হুঃখ মাঝে দোলে, নিবিড় আঁধারে ॥

অকূলে না কূল পায়, দারুণ শৃঙ্খল পায় ।

নিরানন্দ নিরুপায়, পলাইতে নারে—

হও হে উদয় আসি, বিকাশি প্রেমের হাঁসি ।

(আমি অলে যে মলাম হে—ত্রিতাপ দাবানলে,

আর কেবা আছে হে—অনাগ্নি ব'লে দয়া করে ;

আমার হৃদয় কমলোপরে, দীন হীন কান্দালে ডাকে,

কমল কুঞ্চিত আছে হে—চরণ অরুণ অদর্শনে)

ঘোর তম রাশি নাশি নিস্তার দুস্তারে ॥

তোমা ধনে, প্রভু নাহি মনে ; রাখ রাখা পায় হে করুণাময় ॥

হৃদয় শূন্য করি লুকাল কোথায় হৃদয় রতন,
দহি অল্পক্ষণ দেহ নাথ দরশন, জীবন বিহনে শুকাল জীবন ॥
পর্যণ-রুতনে না হেরে নয়নে, (কোথায় গেলে দেখা পাব)

শূন্যময় হেরি হায়--

চিন্তা মন হরি, র'য়েছ পাশরি (হরি কোথায় লুকালে হে)

কিঙ্করে ঠেলিয়া পায় ।

দেহ-কারাগার, নিবিড় আঁধার, (তোমার চরণ অরুণ বিরহে)

উঠে সদা হাহাকার ;

তাপিত ভূষিত, প্রাণ বিচলিত, (প্রেম সূদা বিহনে)

সহিতে না পারি আর ॥

বরষি নয়ন-বারি, জ্বালা নিবারিতে নারি,

হৃদয়সন্তাপহারী হও হে উদয় :-

তব অদর্শনে হায়, দেখা আছি কি দশায়,
(একবার দেখে যাও হে, কি দশায় আছি মোরা,
সবে শবাকার প্রায়, কোথায় আছ রামকৃষ্ণ,
তোমার সাধের প্রেমের হাট)

কোথা হরি করুণাময়, রাখ প্রেমময় ॥

পদে প্রাণ সমর্পিয়ে, কেন হে দহিছে তিয়ে,

প্রাণ সখা দেখা দিয়ে জুড়াও হৃদয় ॥

ভাসায়ে অকূল জলে, কোথায় লুকালে ছলে,

(আমি ভুবে মরি হে, অকূল পাথারে.

এই কি বিধি হ'ল হে, দীন হীন কাক্সালের প্রতি ;

কার কাছে যাব হে, তুমি বিধির বিধি,

আর কেবা আছে হে, মরমব্যথাবার ব্যথী,

দীনের মরম ব্যথা বুকে. একবার দেখা দাও হে.

অভয় মুরতি ধরি, দেখা দাও, প্রাণ জুড়াও ;

চারি দিক শূন্য হেরি, অকূল জলধি-মাঝে)

• কেন হে নিদয় হ'লে দীনে দয়াময় ।

হৃদি মাঝে, এস মোহন সাজে, প্রেম-সুধা কর, বিতরণ ॥

আমার নয়ন-মণি বিহনে নয়নে হেরি আঁধার ।

হৃদি শৃঙ্গাগার, কাঁদে প্রাণ অনিবার,

দহিছে জীবন কত স'ব আর ॥

হৃদয়-বিহারী, পাশরিতে নারি,

(কোথায় গেলে দেখা পাব)

ভুলিবার সেত নয় ।

আঁখি মেলি চাই, দেখিতে না পাই,

(এই ছিল কোথায় গেল)

হেরি সব শূন্যময় ॥

এ ভবে কি পাব, আর কি জুড়াব,

(সে দিন আমার কবে হবে,

সে দিন কবে বা হবে হে,

আমার কুদিন গিয়ে সুদিন হবে)

হেরি হৃদি-প্রতিমায় ।

ভাসায়ে অকূলে, কোথা আছ ভূলে,

(এই কি হে ছিল মনে)

গুণমণি রাখ পায় ॥

হৃথ ধামে ফিরি একা, কোথা সখা দেহ দেখা,

করুণা-নয়নে দীনে, হের প্রেমাধার ।

যতন জানিনি বলে, অভিমানে গেছ চলে,

(যতন জানিনা জানিনা প্রেমহীন স্বার্থযুত)

রোদনে কি হবে শোধ মমতার ধার ॥

আসিছে যামিনী ঘোরা, কোথা আছ মন-চোরা,

সকাতরে ডাকি নাথ, হও হে সদয়—

বিপদে ক্রীপদে স্থান, কিস্করে করহে দান,

• • কেনহে নিরুর হ'লে নহত নিদয় ॥

আঁধার পুরি, এস আলো করি,

তাপিতে হে দেহ সুধাধার ॥

আমার হৃদয়-চাঁদে, এনে দে, বিষাদে রাখ জীবন ।

তাপিত অন্তর, দহিছে নিরন্তর, কর সুধাকর কর বরিষণ ॥

হৃদি-কুমুদিনী, হের বিষাদিনী, (কুমুদ কুঞ্চিত ফেল গো, রাখ আসি
আসি শশা) না হেরি বিনোদ ঠাম ।

নিবিড় আঁধার, সদা হাহাকার, (হায় একি হ'ল রে, বিধির একি
বিধি রে, কেন সাধে বাদ সাধিল) নিরানন্দ ধরাধাম ॥

পরায়-পুতলী, হৃদয় উজলি, (এই ছিল কোথায় গেল, হৃদয়-আকাশ
আলো ক'রে, এসে উদয় হও হে, হৃদয়-আকাশ শূণ্য আছে, প্রাণ বাচেনা
বাচেনা, তব বিরহ অনলে) হও হে উদয় আসি ।

ভুবনমোহন, কর বিতরণ, (শুধুই মোহন নয় রে, সে যে— অনেক
দিন দেখি নাই, কোথায় আছ দেখা দাও) প্রেমালোক সুধারশি ॥

বিকাশি করুণা-রাশি, ব'লেছিলে ভালবাসি, সাধের সাগরে ভাসি,
সঁপেছি হৃদয় ।

এ ভবে ভুলায়ে ছলে, একা রেখে গেলে চ'লে, (এই কি মনে ছিল হে,
একা রেখে চ'লে যাবে)

কি দোষে হে প্রেমময়, হ'য়েছ নিদয় ॥ (দোষী কবে বা নই হে)

মরু মাঝে তরু প্রায়, তাপে তনু জলে যায়, দহিতে সহিতে শুধু র'য়েছে
জীবন ;—(তবু গেল না রে, নিলাজ প্রাণ, বধুর পাছে পাছে প্রাণ)

মনাওণে মরি মরি, আশায় পরায় ধরি, (আমি ম'লাম ম'লাম হে,
মরি তাতে ক্ষতি নাই, পাছে কলঙ্ক হয় হে, অকলঙ্ক রামকৃষ্ণ নামে)

এ সন্তাপে রাখ নাথ দেহ দরশন ॥ (একবার দেখা দাও হে, ভুবনমোহন
রূপে, পুরুষের ভাবে, প্রেমমাখা হাসিমুখে, কোথায় আছ রামকৃষ্ণ,
পতিতপাবন অধমতারণ, কোথায় হে কান্দালের ঠাকুর, তোমায় দীন হীন
কান্দালে ডাকে, আমাদের আর কেউ নাই)

হৃদয়-সখা, আসি দেহ দেখা, বঞ্চনা ক'রনা প্রাণধন ॥

হৃদয়রতন কোথা লুকা'ল ফুরা'ল সুখ-স্বপন ।

পাষণ্ড হৃদয়, তাইতে হে এত সয়, হারিয়ে তোমায় র'য়েছে জীবন ॥

শূণ্য ধরা পুরী, নাহি সে মাধুরী, শোকাচ্ছন্ন সমুদয় ।

শুক শাখী পাখী, করে ফুল আঁখি, তোমা বিনে প্রেমময় ॥

হের তোমা হারা, রবি শশী তারা, নিরানন্দে সবে ফিরে ।

হৃদয়ের চাঁদ, হেরিতে বিষাদ, আর কি আসিবে ফিরে ॥

আরেরে দারুণ বিধি, পাষণে গড়েছ হৃদি,

কোথা আছে হৃদি-নিধি রয়েছে কোথায় ।

শোকের সাগরে ভাসি, প্রেমময় দেখ আসি,

গুণমণি তোমা বিনে আছি কি দশায় ॥

শূন্য ধরা সুখহীনা, নাহি হাহাকার বিনা,

তাপিত অন্তর তনু, সন্তাপ আগার ।

দেখ হে দেখ অনলে, ধিকি ধিকি হৃদি জলে,

দারুণ বিরহ জ্বালা নাহি সহে আর ॥

হৃদয় শশী, হৃদয় মাঝে বসি, প্রেম-সুখা কর বরিষণ ॥

নিদয় হ'য়ে কেন ত্যজিলে ভাসালে দুঃখপাথারে ।

যার্তনা না সয়, নেহার হে প্রেমময়, আছি যে দশায়, হারায় তোমারে ।

কার তরে আর, এজীবন ভার, বহনে নিষ্ঠুর প্রাণ ।

দিয়ে হৃদি-নিধি, হ'রে নিল বিধি, (বিধি তোর মনে কি এতই ছিল)

সুখ আশা সমাধান ॥

কত ছিল সাধ, সে সাধে বিষাদ,

(মনের সাধ মনেই র'ল, সাধ মিটল না মিটল না)

কি পাপে ঘটিল নাথ ।

ভাবিনি কখন, হবে যে এমন, বিনা মেঘে বজ্রাঘাত ॥ (হায় এ'কি হলো রে

শূন্য হৃদি-সিংহাসন, এস এস প্রাণধন,

করিনি যতন তাই গেছ অভিমানে ।

(যতন কিবা জানি হে, দীনহীন কান্দাল মোরা)

তুমি যে পরম ধন কি তব জানি যতন

ছুড়াও তাপিত প্রাণ প্রেম বারি দানে ॥

(প্রাণ জলে যে যায় হে, তোমার বিরহানলে)

মোহন রূপের ছাঁদে— বাধা, প্রাণ সদা কাঁদে,

(একবার দেখা দাও হে, অনেক দিন দেখি নাই, কোথা আছ রামকৃষ্ণ)

সাধ হেরি সেরূপ মাদুরী একবার ।

যুচাও মন বিষাদ, পুরাও দীনের সাধ,
 হৃদয়ের চাঁদ হর হৃদয়-আঁধার ॥
 (একবার উদয় হও হে, তমোরাশি দূরে যা'ক)
 বিনয় করি, চরণ তব ধরি, এস ব'স হৃদয় মাঝারে ॥

সদয় শমন কবে হবে হে জুড়াবে মনোবেদন ।
 নাথের বিরহ, দহিছে হে অহরহ, সে যদি নিদয় কি কাজ জীবন ॥
 আর কি তোমার, পাব দরশন, কোথা আছ নাথ ভুলে ।
 নয়নের বারি, মুছায়ে যতনে, লবে কিহে কোলে তুলে ॥
 করিনি যতন, তাই প্রাণধন, অভিমানে গেছ চলে ।
 এ স্মৃতি অনল, দহিছে প্রবল, নেভেনা নয়নজলে ॥
 তোমা বিনে আর কে আছে আমার, না দেখি আপন জন ।
 ওহে তাপহারী, ঢাল কৃপা করি, কর তাপ বিমোচন ॥
 এস এস গুণধাম, পূর্ণ কর মনস্কাম,
 ব'স যদি সিংহাসনে হৃদয়রতন ।
 অন্তরের তমো নাশি, দেখাও সে রূপরশি,
 জুড়াও তাপিত চিত তৃষিত নয়ন ॥
 কত ভালবেসেছিলে, একেবারে ভুলে গেলে,
 অভাগা কপালদোষে বিধির লিখন ।
 দেখ নাথ মরি মরি, কেমনে জীবন ধরি,
 নিবিড় আঁধারময় নেহারি ভুবন ॥
 হৃদয়শলী, উদয় হও আসি, কর দুখ-তমো নিবারণ ॥

আমার জীবন-ধন বিহনে আঁধার হেরি এ ভুবন ।
 প্রাণের সখা, আর কি দিবে দেখা, বিরহ বিষাদে দহি অন্তঃকণ ॥
 হৃদি-চন্দ্র বিনে, মরি মরি প্রাণে, দেখা দিয়ে কোথা হ'ল অদর্শন ।
 জান যদি যাও, দাও এনে দাও, হেরিয়ে রতন জুড়াব জীবন ॥
 আশা-পথ চেয়ে, গেল দিন বয়ে, সহে না সহেনা আর ।
 কবে দেখা পাব, চরণে লুটিব, মরমের ব্যথা জানাব আবার ॥

এস এস গুণনিধি, সাধি তোমা নিরবধি,
 বিরহ-জলধি আজি কর নাথ পার ।
 তুষিত তাপিত প্রাণ, চাহে সদা সুখদান,
 প্রেমময় প্রেমহীনে হের একবার ॥
 দেখ হ'য়ে তোমাহারা, ত্রিমি ভবে দিশেহারা,
 মুছাতে নয়ন-ধারা না হেরি আপন ।
 যাব নাথ কার কাছে, কেবা বল আর আছে,
 দীন ব'লে কোলে তুলে, করিবে যতন ॥
 চাহি মুখ পানে. রাখ হে চরণে, বঞ্চনা ক'রনা হৃদয় রতন ॥

কাতর প্রাণে ডাক দেখি রে আজ ।
 রামকৃষ্ণ বলে, বাছ তুলে, পরিহরি লোক লাজ ॥ (ওরে)
 (সেতো) নিষ্ঠুর নয় আমার, (অকূল) প্রেমেরি পাথার,
 দয়ার শব্দী, প্রেম বিলাসী প্রেমের অবতার ;
 ডাক প্রেম সোহাগে, অমুরাগে ; আসবেন ফিরে রসরাজ ।
 ভাসি নয়নজলে, দুখ যাবে না ম'লে ; যতন বিনে, অভিমানে, সে গেছে চলে ;
 হাতে পেয়ে রতন, চিন্তি না মন,
 ও তুই হেলায় হারালি কাজ ॥
 নাথ ! আমরা অসার, যতন জানি কি তোমার,
 তাই ব'লে কি ক'র্ত্তে হয় নাথ এমনি ব্যবহার,
 তুমি পরের মত চলে গেলে, হৃদয়ে হানিয়ে বাজ ॥
 তোমায় জানি আপনার, দোষ লয়ো না আমার ;
 ভক্তসঙ্গে রসরঙ্গে এসে একবার ;
 আমার তাপিত জীবন শীতল ক'রে,
 হৃদয়ে কর বিরাজ ॥ (আমার)

সম্পূর্ণ ।



